জুন, ১৯৮৮

রহস্য পত্রিকা

সম্পাদক
কাজী আনোয়ার হোসেন

সহকারী সম্পাদক
শেখ আবদুল হাকিম
রকিব হাসান
নিয়াজ মোরশেদ

শিল্প নির্দেশনা
জোসী চৌধুরী

প্রোডাকশন ম্যানেজার
এম. এ. কুদ্দুস

সেলস ম্যানেজার
ইসরাইল হোসেন

প্রকাশনা ও মুদ্রণ :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী ও
সেগুনবাগান প্রেস থেকে
২৪/৪ সেগুন বাগিচা
ঢাকা ১০০০

যোগাযোগ :
রহস্যপত্রিকা
২৪/৪ সেগুন বাগিচা
ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০
টেলিফোন : ৪০৫৩৩২

মূল্য : চোদ্দ টাকা মাত্র

৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা, জুন ১৯৮৮

এ সংখ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ : জোসী চৌধুরী

নিয়মাবলী

গ্রাহক হতে হলে

চাঁদার হার :

ষান্মাসিক : সডাক ৯৬·০০ টাকা

বাৎসরিক : সডাক ১৯১·০০ টাকা

* গ্রাহকদেরকে বিশেষ সংখ্যার জন্যে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

লেখা :

(১) রহস্যপত্রিকায় সবাই লিখতে পারেন, (২) লেখার কপি রেখে পাঠাবেন, (৩) স্পষ্ট হস্তাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন, (৪) লেখার সঙ্গে পূর্ণ নাম, ঠিকানা লিখে দেবেন, (৫) খামের ওপর পত্রিকার কোন্ বিভাগের জন্যে লিখেছেন, তা উল্লেখ করবেন, (৬) অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	: ২,০০০·০০ টাকা
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	: ১,২০০·০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা-চাররঙা	: ৩,৫০০·০০ টাকা
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ-একরঙা	: ২,৫০০·০০ টাকা
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ-চাররঙা	: ৪,৫০০·০০ টাকা
শেষ প্রচ্ছদ চাররঙা	: ৬,০০০.০০ টাকা
সচিত্র ফিচার বিজ্ঞাপন	: আলোচনা সাপেক্ষ
চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপন	: আলোচনা সাপেক্ষ

কোন পরিচয়ে ?

আমি একজন বীরঙ্গনার ছেলে। আমার মা একজন বীরঙ্গনা। 'বীরঙ্গনা' শব্দটার মানে হয়তো আপনারা সকলেই জানেন। '৭১ সালে আমার মা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ (সম্মান) এর একজন ছাত্রী ছিলেন তখন সেই ২৫ শে মার্চের কালোরাত্রিতে রোকেয়া হলের অন্যান্য ছাত্রীদের সাথে আমার মা মণিকেও হানাদাররা ধরে নিয়ে যায়। আর সবার মতো আমার মামণির ইজ্জতও ওরা লুটে নেয়। অসহায় মা-মণি আমার ২রা এপ্রিল আমার নানার বাসায় ফিরে আসেন। দীর্ঘ দশমাস পরে ২৩ শে জানুয়ারী ১৯৭২ সালে জন্ম হয় আমার। আমার জন্মের প্রায় তিন মাস পর আমার মাকে বিয়ে করে জনৈক ভদ্রলোক (যিনি পূর্বে আমার মাকে ভালোবাসতেন)। এরপর অনেক বছর পার হয়েছে, আমি এ বছর এস. এস. সি পরীক্ষা দিলাম। কিন্তু একজন দয়ালু সহৃদয় পিতা পাওয়া সত্ত্বেও আমার জীবন আজ দুর্বিষহ। স্কুলেক্লাসের ছেলেরা আমার পরিচয়, জাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ২৬ শে মার্চ ১৬ই ডিসেম্বর স্কুলের কোনো কর্মসূচীতে আমাকে অংশ নিতে দেয়া হয় না। আমার বাবা সমাজের এক জন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যে কোনো সামাজিক উৎসবে আমি যেতে পারি না। শুধু তাই নয়, আমার যে ছোটো বোনটি আছে তার বান্ধবীরাও লুকিয়ে আমাকে বিহারীর বাচ্চা বলে।

জাতির কাছে আমার প্রশ্ন যে আপনারা আমাকে কোন্ পরিচয়ে গ্রহণ করেছেন ? একজন বীরাঙ্গনার ছেলে হিসাবে, নাকি বর্বর হানাদারদের ঔরসজাত পুত্র হিসেবে।

—জনৈক

'আশ্চর্য ক্যালেণ্ডার'—আরো কিছু তথ্য

ঈদ সংখ্যা রহস্যপত্রিকায় প্রকাশিত '১৯৮৮র আশ্চর্য ক্যালেণ্ডার' 'রহস্যপত্রিকা' পাঠকদের নিশ্চই আনন্দ দিয়েছে। কারণ এতে ১৯৮৮ সনের কোন মাসের কতো তারিখ কি বার পড়ে তা সহজেই বের করার এক সুন্দর উপায় সংগ্রাহক আহসান খান (দর্পন) সাহেব লিখেছেন। সেজন্য সংগ্রাহক সাহেবকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ।

তবে আপনি যদি আরো একটু চেষ্টা করেন তাহলে শুধু ১৯৮৮ সনের নয় বরং অতীত এবং ভবিষ্যতের যে কোনো বৎসরের যে কোনো মাসের যে কোনো তারিখ কি বার পড়ে তাও সহজে বের করতে পারবেন। কিভাবে তা সম্ভব বলছি।

ধরুন ১৯৮৮র ফেব্রুয়ারী মাসের মান দেয়া হয়েছে ২, তা কিভাবে বের করবেন। প্রথমে লক্ষ্য করুন ১৯৯৮র প্রথম শুক্রবার কতো তারিখ। পাঁচ তারিখ, তাই না ? আমরা জানি সাত দিনে একসপ্তাহ। মাসের প্রথম শুক্রবার যে তারিখ হয় তার সাথে বাকি সংখ্যা যোগ করে আমরা সাত দিন পূর্ণ করতে চেষ্টা করবো। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম শুক্রবার পাঁচ তারিখ। সাত দিন পূর্ণ হতে আর দুই দিনের দরকার। সুতরাং এই দুই হচ্ছে ফেব্রুয়ারী মাসের মান।

আবার ১৯৮৮র জুন মাসের প্রথম শুক্রবার তিন তারিখ। সাত দিন পূর্ণ হতে আরো চারদিনের

দরকার। সুতরাং জুন মাসের মান চার।

এভাবে আপনি যে কোনো বৎসরের যে কোনো মাসের মান বের করতে পারেন। নিচে দু'টি উদাহরণ দেয়া হলো।

১৯৮৬র মে মাসের প্রথম শুক্রবার হচ্ছে ২ তারিখ। সাত দিন পূর্ণ হতে আরো পাঁচ দিনের দরকার। সুতরাং ১৯৮৬ র মে মাসের মান পাঁচ।

আবার ১৯৮৯ এর জানুয়ারী মাসের প্রথম শুক্রবার ছয় তারিখ। সাত দিন পূর্ণ হতে ১ এর প্রয়োজন। সুতরাং ১৯৮৯ এর জানুয়ারীর মান এক।

এভাবে আপনি যে কোনো বৎসরের যে কোনো মাসের মান বের করে ১৯৮৮ র আশ্চর্য ক্যালেণ্ডার এর নিয়মানুযায়ী যে কোনো বছরের যে কোনো মাসের কোন তারিখ কি বার পড়ে তা সহজেই বের করতে পারবেন। বাংলা সনের বেলায় একই নিয়ম প্রযোজ্য। আপনিও চেষ্টা করে দেখুন।

মঞ্জুর আহসান মিন্টু

প্রসংগঃ রহস্যপত্রিকা

আমি রহস্যপত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক। তবে গ্রাহক হয়েছি বেশিদিন হয়নি। ১৯৮৭ সালের জুলাই মাস থেকে আমি রহস্যপত্রিকা নিয়মিত পড়তে শুরু করি। যখন রহস্যপত্রিকা পড়তাম না, তখন এই পত্রিকা সম্পর্কে নানান জনের নানান মত শুনতাম। কেউ বলে এটা বাজে পত্রিকা, আবার কেউ বলে এটা ভালো পত্রিকা। বলতে দ্বিধা নেই, আমিও তখন প্রথম মতামতটির পক্ষে ছিলাম। কিন্তু যখন নিয়মিত এই পত্রিকা পড়তে শুরু করি, তখন আমরা ধারণাগুলো সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। এবং আমি হয়ে পড়ি রহস্য পত্রিকার একজন নিয়মিত গ্রাহক। রহস্যপত্রিকার প্রত্যেকটা পাতা আমি খুব মন দিয়ে পড়ি। বিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ক ফিচারগুলো আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। প্রত্যেক মাসের দুই তারিখে আমি রহস্যপত্রিকা কিনি। যদি কোনক্রমে কিনতে না পারি তাহলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি আমার মা এবং বাবাকেও এই পত্রিকার পাঠক বানিয়ে ফেলেছি। তারাও নিয়মিত এই পত্রিকা পড়ে। কেউ যদি রহস্যপত্রিকা সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে তাহলে আমার খুব খারাপ লাগে। এবার আসল ঘটনাটা খুলে বলি। প্রিয় পাঠক, এটা পড়লে বুঝতে পারবেন রহস্যপত্রিকা কেমন একটি পত্রিকা। এপ্রিল মাসের রহস্যপত্রিকা কিনে পড়ে ফেললাম। পড়ে ভালো লাগলো। তারপর একদিন এক বন্ধুকে দিলাম পত্রিকাটি পড়ার জন্যে। বন্ধুটি পত্রিকা পড়ে একদিন স্কুলে নিয়ে আসলো আমাকে দেবার জন্যে। কিছুক্ষণ পর ক্লাস শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় ঘণ্টা চলাকালীন সময় আমার আরেক বন্ধু পত্রিকাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ঠিক তখনই স্যার ঘটনাটা দেখে ফেলেন এবং পত্রিকাটি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেন। স্যারটি আবার ভীষণ রাগী। তার ওপর সেবা প্রকাশনীর বই কিংবা রহস্য পত্রিকা পড়া তিনি একদম পছন্দ করেন না। তাই তিনি আমাদের ধরে কিছু উত্তম-মধ্যম দিলেন। এবং ক্লাস শেষে পত্রিকাটি নিয়ে চলে গেলেন। তিন দিন পর ঐ স্যার আবার আমাদের ক্লাসে আসলেন। তাঁর হাতে দেখি আমার রহস্যপত্রিকা। তারপর তিনি হাসিমুখে পত্রিকাটি আমাকে দিয়ে বললেন, 'এই পত্রিকাটা খুবই ভালো, আমি খুব মনযোগ দিয়ে পড়েছি।' আমরা তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বলেন কি, স্যার! যে লোক রহস্যপত্রিকার নাম শুনতে পারতেন না, আর তিনিই কিনা রহস্য পত্রিকার প্রশংসা করছেন!

মোঃ সাইফুল ইসলাম
পূর্ব উকিল পাড়া,
ফেনী।

তোমরা ঘরে বইস্যা থাকলে দ্যাশটা তো হুইয়া থাকবার পারে না, তারে চইলতে অইবো, ল্যাংড়াইয়া অউক—খোঁড়াইয়া অউক চইলতে অইবো।

বটমূলের আড্ডাকাহিনী

চারুবাক

আমাদের ডাক্তার আজ মহাখুশি। মুখে যেন হাসি আর ধরে না। সবার শেষে আমি পৌঁছতেই 'আসেন আসেন, এতো দেরি ক্যান' বলে জায়গা ছেড়ে দিলেন তাঁর পাশে বসার জন্যে। বসে আর সকলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কি ব্যাপার, ডাক্তারকে আজ যেন বড় খুশি দেখাচ্ছে?'

জবাব দিলো লুড় খান, 'ডাক্তারের খুশির কারণ হলো এই যে আমাদের রাষ্ট্রে মুছলমানি হছে।'

'এইটা কি কন, লুডু ভাই, রাষ্ট্র কি মানুষ যেহের মুছলমানি অইবো? আমাগো রাষ্ট্রের ধর্ম আছিলো না, অখন ধর্ম অইতাছে।'

'ধর্ম ছিলো না—এ আবার কেমন কথা হলো? এদেশের মানুষ তো চিরকাল ধর্মপ্রিয়। চার-চারটা ধর্ম—ইসলাম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ আর খ্রীষ্টানধর্ম যুগ যুগ ধরে বেশ দাপটের সঙ্গেই আছে এখানে। অন্য দেশের তুলনায় নিজ নিজ ধর্মের প্রতি এখানকার লোকদের অনুরাগ বেশি ছাড়া কম নয়। তাহলে ডাক্তার সাহেব কি করে বলছেন যে আমাদের রাষ্ট্রের ধর্ম ছিলো না?' প্রশ্ন করলেন কালাভাই।

'মানষের ধর্ম আছিল না—হেই কতা আমি কই নাইক্কা। মানষের ধর্ম থাকলে, মানষে ধর্ম মানলে কি কাম অইবো? রাষ্ট্রেরও ধর্ম থাকন লাগে। অ্যাতদিন হেইডা না থাকলে আমাগর পাকিস্তানী পাক ভাইরা,

আরবী শ্যাক ভাইরা জানতো না আমাগো রাষ্ট্রটা মুসলমান, ইন্দু, বৌদ্ধ, না খিরিস্টান। এইবার আমরা এ্যাকজন ন্যাতা পাইছি। ত্যানার মাথায় গোলটুপি, পরনে পাইজামা-পাঞ্জাবী, মুখে খালি ইসলাম আর ইসলাম। ত্যানারে আমি ষোল আনা গাজী আর খাঁটি মর্দে-মুমিন কইবার চাই। গায়েবী নির্দেশে এবং অয়তো বা নয় রাশি-দশ রাশি ছাড়াছিনা-ধরছিনার হুজুর ক্যাবলাদের বাহা-বাহায় ত্যানার দিলে জেহাদী জোস পয়দা অওনের দরুন আমাগো রাষ্ট্র আইজ মুসলমানি পাইলো। এর থিক্যা খুশির কতা আর কি অইতে পারে?'

টিপু বললো, 'ডাক্তার সাহেব, আপনার কথার জালে আপনি নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছেন। বললেন, রাষ্ট্র মানুষ নয়, তাই তার মুসলমানি অইতে পারে না। ভালো কথা। কিন্তু যে বস্তু মানুষ নয় তার ধর্ম হয় কেমন করে? অথচ শেষে আপনি বললেন আমাদের রাষ্ট্র মুসলমানি পেয়েছে। এটা কি স্ববিরোধী কথা নয়?'

'দেখেন মিঞা, লেখাপড়ি জানেন বইল্যা আফনেরা প্যাচাল পাড়বার ওস্তাদ। তয়, আমিও এট্টু পাচাল পাড়ি। আফনেরা গণতন্ত্র গণতন্ত্র কইরা বহুত চিল্লাহাল্লা করেন। অ্যাই দ্যাশের কমছে কম শতকরা ৯০ জনের ধর্ম ইসলাম। হের লাইগ্যা গণতন্ত্রের নিয়মেই রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম অইছে,' লড়াক্কু ভঙ্গিতে জবাব দিলেন ডাক্তার।

ডাক্তারকে উৎসাহ দিয়ে বললেন বুদ্ধিজীবী, 'বাহ্‌বা ডাক্তার, বাহ্‌বা! এই তো যুক্তির মাথা খুলছে! এবার দেখা যাক টিপুর তুণে কি আছে।'

টিপু বললো, 'ডাক্তারের গণতন্ত্রপ্রীতি গেরস্থের মুরগীপ্রীতির মতো। সময়ে আণ্ডাটা, সময়ে গোস্তটা খাওয়ার প্রীতি। নইলে গণতন্ত্রের দোহাই পাড়ার আগে যে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রের মুসলমানি কর্মটা সম্পন্ন করলো সেটাকে নির্বাচিত করতে ঐ শতকরা ৯০ জনের তিনজনও যে ভোট দেয়নি, দিতে পারেনি বা দিতে যায়নি সেটা ডাক্তারের নজর এড়াতো না। এই পার্লামেণ্টকে যে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত এবং এর সিদ্ধান্তকে যে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বলা যায় না সে কথা ডাক্তারকে বোঝাবার সাধ্য কার? তাঁর দিল নামক ডোবাটি যে এখন জেহাদী জোসের রসে টইটম্বুর।'

'হাঁ, যুক্তি আছে বটে, তবে ঝাঁজটা যেন একটু বেশি মনে হচ্ছে টিপু সাহেব?' টিপ্পনী কাটলেন বুদ্ধিজীবী।

'ঝাঁজ থাকবো না? অরা তো দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় নাচে। অগো কতায় ঝাঁজ না থাকলে কার কতায় থাকবো? বলে, পার্লামেণ্ট নাকি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অয় নাইক্কা, শতকরা তিন-চার জন ভোটারও নাকি ভোট দেয় নাইক্কা। এই রকম কার দোষে অইলো? ভোটারগো ভোট দিবার কে মানা করছিল? ইশ্‌! ত্যানারা ভোটাভুটিতে আইবেন না, আসমানের চানটারে আইন্যা দেও, সুরুজটারে নামাইয়া ফেলো, না অইলে হেছা করেঙ্গা তেছা করেঙ্গা—এই রকম বায়নাক্কা ধইর‍্যা আরামে ঘরে বইসা থাকবেন, নুর হোসেনগো হুদাহুদি রাস্তায় নামাইয়া কলিজা ফুটা করাইবেন, আর দ্যাশটা পার্লামেণ্ট ছাড়া থাকবো! এক্কেবারে মামার বাড়ির আবদার আর কি।'

'বাহ্‌বা, ডাক্তারের আজ জবান মগজ দুটোই খুলে গেছে,' মন্তব্য করলেন রাজনীতিগন্ধী।

'অইছে, আর খোঁচা দেওন লাগবো না। তোমরা ঘরে বইস্যা থাকলে দ্যাশটা তো হুইয়া থাকবার পারে না, তারে চইলতে অইবো, ল্যাংড়াইয়া অউক—খোঁড়াইয়া অউক চইলতে অইবো। দ্যাশ চইলতাছেও। তোমরা পসন্দ করো আর না করো। মামার বাড়িত চাচার বাড়িত

যাইয়া তো বহুত ছুটাছুটি নালিশ-উশিল অইলো, কিন্তুক কাম কিছু অইছে ? অয় নাইক্কা। মামা-চাচারা বেজায় শেয়ানা। হেরা জানে কোন্ বিড়ালটা শিকারী, ইন্দুর ধইরা অগো গুদামের মাল রক্ষা কইরতে পারবো ? মামা-চাচার কাছ থিক্যা খালি আতে আওনের পর অখন ত্যানারা করে কি ? খালি গজরায় আর গুমরায়, নিজেরা নিজেরা টিল মারা-মারি করে, আর মাজেমইদ্দে ছুই একখান বক্তৃতা বিরবিতি ছারে। একজনে কয়, রাষ্ট্রের আবার ধর্ম অয় ক্যামনে ? এ্যাইটা তো মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিরুদ্ধ কতা। আমি কই, ক্যান ? আফনের মরহুম আব্বাজানই তো দশ কুটি মোছলমানের দোহাই দিয়া লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে ছুইট্যা গেছিলেন। হেই কতা মনে নাইক্কা ? আরেকজনে কয়, ইসলাম রাষ্ট্রের ধর্ম অওনের দরকার নাই। আরে আফনের মরহুম সোয়ামীই তো শাসনতন্তরে বিছমিল্লাহ্‌র টুপি পরাইয়া গেছেন !

'একদিকে লাগাতার ওয়ালারা ভাগাতার অইয়া এইসব কইতাছেন, অন্যদিকে আরেকজন হেইদিন কইয়া দিলেন—দশ কুটি মোছলমানের রাষ্ট্রের গলায় ইসলামের সাইনবোর্ড ঝুলাই দেওন আর মসজিদের গায়ে "আল্লাহ্‌র ঘর" লেইখ্যা দেওন এক কথা। ছুইটারই দরকার নাই। উকিলী প্যাঁচ, বুইঝলেন কিনা ? ভীমরতি-ধরা অ্যাই সাহেব গুজারাতর কিনারে আই-স্যাও ওজারতির সখ হারান নাইক্কা। আন্দোলনের ময়দান থিক্যা একদিন কোলা ব্যাঙের মতোন লাফ মাইরা পরধান উজীরের গদীতে সওয়ার অই-ছিলেন। তখন নাকি উনি মাংস খাইতে পাইরতেন না, খালি হিঁদু হিঁদু গন্ধ লাগ-তো। গদী থিক্যা চিৎ অইয়া ছিট্‌কাই পরনের পর মনে লয় মাংস তাইনের ভালাই হজম অইতাছে।'

'সাবাশ ডাক্তার, সাবাশ,' হাততালি দিয়ে বললেন রাজনীতিগন্ধী। 'এইবার বলেন খলিফার বিষয়টার কি ফয়সালা করবেন। ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত, তখন তো দেরি করা ঠিক হবে না।'

এতক্ষণে ডাক্তারের চোখে মুখে যেন একটা হতবুদ্ধির ভাব ফুটে উঠলো। বিভ্রান্তের মতো বললেন, 'খলিফার বিষয় ! হেইডা আবার কি ? খলিফা তো জানি ছুই রকম। নোয়াখালী অঞ্চলে নাকি পোলাপানের মোছলমানি কামটা যাগোরে দিয়া করান অয় তাগোরে খলিফা কয়। আমাগো এই দিগে খলিফা কয় দর্জিরে। তয়, অ্যাইখানে খলিফার কতা আহে ক্যামনে ?'

'আসে, ভাই, আসে। তবে আপনি যে ছুই ধরনের খলিফার উল্লেখ করলেন তাদের নয়, অন্য ধরনের খলিফার কথা।'

'অন্য ধরনের খলিফা কি রকম ? ছোড বেলায় আলিফ লায়লার কিচ্ছা হুনছিলাম। তার মইদ্দে হারুন রশীদ নামে এক খলিফার কতা আছিলো। হেই রকম নাকি ?'

'হাঁ, এবার ঠিক ধরেছেন। ঐ রকম খলিফা। আমীরুল মুমেনিন। এখন তো আমাদের সব আছে। দেশ আছে, রাষ্ট্র আছে, রেকর্ড সংখ্যক ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট প্রধানমন্ত্রী আছে, গণতন্ত্র সম্মতভাবে তৈরি পার্লামেণ্ট আছে, রাষ্ট্রীয় ধর্ম পর্যন্ত আছে। পাইক, বরকন্দাজ, লোক-লস্কর, ফৌজ-সালার সবই আছে। শান আছে, শওকত আছে। ধন (যে অর্থেই বোঝেন) আছে, দওলত আছে। জোস আছে, জিগিরও আছে। নর্তন আছে, কুর্দন আছে। অফিসে-দফতরে রাস্তাঘাটে হাঙ্গ-রের মতো ক্ষুধা নিয়ে ঘুষখোর আছে। গণ্যমান্য চোরাচালানী, মুনাফাখোর আছে। সংঘবদ্ধ লুটেরা-মাস্তান, হাই-

জ্যাকার, চাঁদা-আদায়কারী আছে। অগুণতি ভণ্ড বকধার্মিক আছে। ঈমানদার, সৎ, ধার্মিক আছে। তার চাইতে অনেক বেশি আছে লম্পট তস্কর ধোঁকাবাজ মিথ্যুক বেঈমান আল্‌বদর রাজাকার। কষ্ট-কবি নষ্ট-কবি স্বভাবকবি জাতকবি আছে। ঘোমটার নিচে খ্যামটা নাচ আছে। পাগলাপানির নহর আছে মৌ-পিয়াসীর ভিড় আছে। নাই কেবল একটি জিনিস—খলিফা…'

রাজনীতিগন্ধীর বক্তব্য শেষ হবার আগেই ফোঁড়ন দিলো টিপু, 'অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে আমাদের পনেরো কলা পূর্ণ হয়েছে, আরেকটি কলা বাকি। ওটা হলেই আমাদের পাড়ার গাঞ্জু মিঞার ভাষায় "সিক্সটিন ব্যানানাস ফুলফিল্ড"। তা ঐ কলাটা বাকি থাকে কেন? ওটা অর্থাৎ, খেলাফত দাবি করে যেসব দেশে মুসলমানের বাস সেখানে নোটিশ পাঠালেই তো হয়। দেখবেন জিয়াউল হক তো নয়ই খোমিনি পর্যন্ত আপত্তি করবেন না। কি বলেন, ডাক্তার সাহেব?'

মাথা চুলকে লাজুক হাসি হেসে ডাক্তার জবাব দিলেন, 'অ্যাই দ্যাখেন! আফনেরা আবার প্যাঁচাল শুরু কইরা দিলেন। একজন কইলেন খলিফার কতা, আরেকজন কন কেলার কতা। কিসের মইদ্দে কি, ফান্তা ভাতে ঘি।'

'কি মুশকিল আপনাকে নিয়ে। টিপু যে কলার কথা বলছে ওটা আপনার সেই সাগর কলা বিচিকলা নয়—অন্য কলা।' ডাক্তারকে বোঝাতে গেল লুডু খান।

ডাক্তারের সন্দেহ হলো যে তাঁকে নিয়ে তামাশা করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই রেগে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ কেলা?'

'শশীকলা।'

'শশীর বাগানের কেলা?'

'আরে না-না, চন্দ্রকলা।'

'চান্দের কেলা? ইয়ার্কি মারতাছেন আমার লগে, না? ঠিক আছে, আমি যাইগা। আর আইমু না এইহানে,' বলে হন হন করে চলে গেলেন ডাক্তার। □
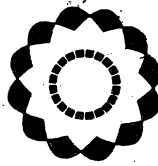
দৃষ্টি আকর্ষণী

লেখক-লেখিকাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে রহস্যপত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি লেখার জন্যেই সম্মানী দেয়া হয়। গত অনেকগুলো সংখ্যায় যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে তাঁরা অনেকেই তাঁদের প্রাপ্য সম্মানী সংগ্রহ করেননি। অনুরোধ করা যাচ্ছে অফিস চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্টরা যোগাযোগ করবেন।

গায়ের ওপর চেপে বসেছে বিশাল ভালুক। বোঁটকা দুর্গন্ধ। মাথার পাশে তার যন্ত্রণা, রলিন বুঝলো, ভালুকটা তার কান চিবাচ্ছে

দুঃস্বপ্নের শিকার

আশরাফ আলম

ডিনারের সময় হয়ে গেছে। ঝোপ জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে পথ। ড্যারেল রোজিন আর রলিন ব্র্যাডেন এর ভিতর দিয়েই কেবিনের দিকে রওনা হলো।

'কি হে, খুব তো বলেছিলে ভালুক দু'চারটে চোখে পড়বেই এদিকে। গত দুসপ্তাহে মুজ দেখলাম অনেকগুলো। কিন্তু ভালুক-ফালুক কিছু তো দেখছি না।' বন্ধুকে খোঁচা দিলো ড্যারেল।

কথাটা ঠিক। এই এলাকায় ভালুকেরই রাজত্ব। কিন্তু একটাকেও তখনো দেখতে পায়নি ওরা। দক্ষিণ আলাস্কার ঘন ঝোপ আর তুন্দ্রা জলাভূমি ভরা অঞ্চল এটা।

এঙ্কোরেজ থেকে ১২৫ মাইল দক্ষিণে, সোলডটনা থেকেও দূরত্ব একই। এখানেই ওরা থাকছে এখন। শীতের সময়ে গর্তে ঢুকে যায় বাদামী ভালুকগুলো। তার আগেই সমস্ত এলাকাটা চষে ফেলে ওরা।

এই বাদামী দানবগুলো খুব হিংস্র প্রকৃতির। রলিন কোনোভাবেই এগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে রাজি নয়।

ড্যারেল তার ভাগের মুজ হরিনগুলো এরিমধ্যে শিকার করেছে। কিন্তু রলিনের ভাগ্য খারাপ। তার ভাগ এখনো জোটেনি। অথচ শিকারের মরশুম শেষ হয়ে আসছে।

রলিনের বাবা এবং ভাইও শিকারে এসেছে। আধ মাইল দূরে এই ট্রেইলের ওপরই তাদের কেবিন। হঠাৎ একটা শব্দ কানে এলো। কিছু একটা আসছে। কান খাড়া করলো রলিন।

স্প্রুসের লম্বা ডগার ওপর খেলে যাচ্ছে বাতাস। অস্পষ্ট খসখসে শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। ১০০ ফুট পিছনে
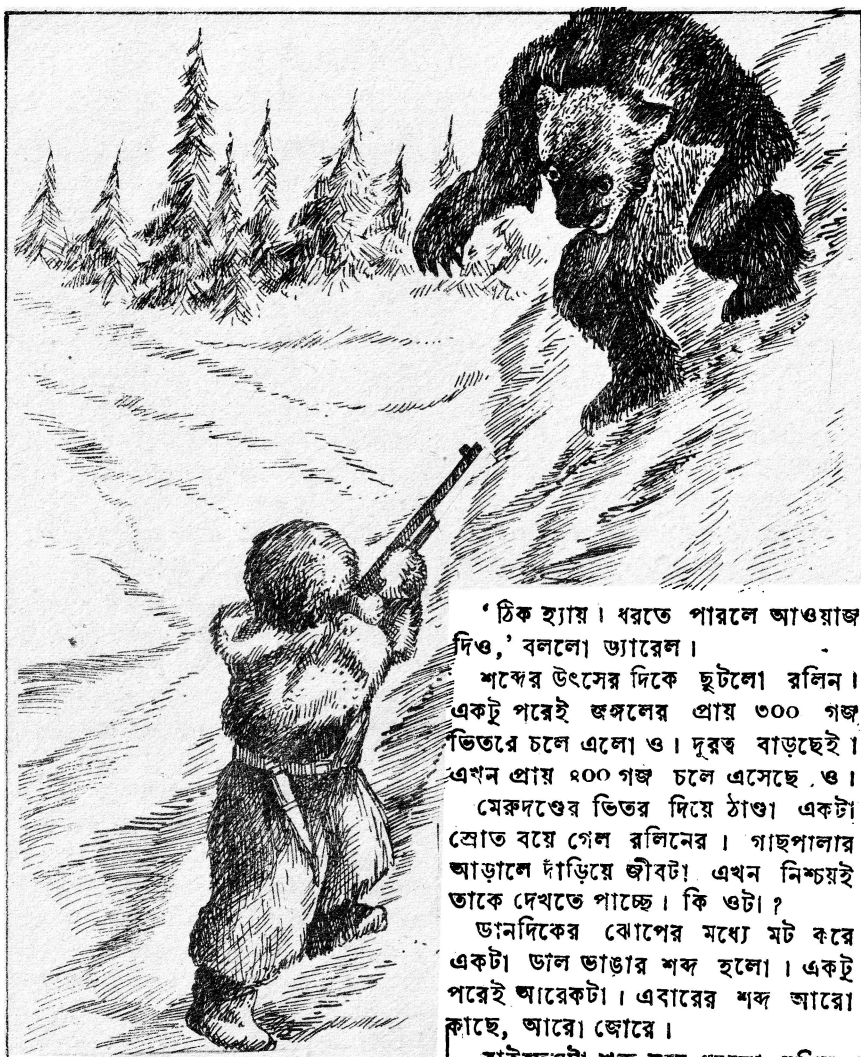
'ঠিক হ্যায়। ধরতে পারলে আওয়াজ দিও,' বললো ড্যারেল।

শব্দের উৎসের দিকে ছুটলো রলিন। একটু পরেই জঙ্গলের প্রায় ৩০০ গজ ভিতরে চলে এলো ও। দূরত্ব বাড়ছেই। এখন প্রায় ৫০০ গজ চলে এসেছে ও।

মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল রলিনের। গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে জীবটা এখন নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পাচ্ছে। কি ওটা?

ডানদিকের ঝোপের মধ্যে মট করে একটা ডাল ভাঙার শব্দ হলো। একটু পরেই আরেকটা। এবারের শব্দ আরো কাছে, আরো জোরে।

রাইফেলটা শক্ত করে ধরলো রলিন। ঠিক তখনই ঘটলো ঘটনাটা। চল্লিশ ফুট দূরে থেকে বিশাল দুটো আলাস্কান বাদামী ভালুক বিদ্যুৎবেগে ছুটে এলো ওর দিকে। কালো মুখ দুটো রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। লম্বায় সাত ফুটের মতো হবে ভালুক দুটো। ওজন চার'শ পাউণ্ডের কম নয়।

পাতার উপর মরমর করে সামান্য শব্দ হলো।

'ঐ যে, তোমার ভাগের মুজ আসছে,' ফিস ফিস করে বললো, ড্যারেল, 'হ্যাঁ। সময় এসে গেছে। ব্যাটাকে ধরার জন্যে পিছন দিকে যাচ্ছি আমি।'

'ইয়া-ও-ও,' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। দু'হাত নেড়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলো ভালুক দুটিকে।

বিশাল চোয়াল মেলে হাঁ করলো জন্তু দুটো। লম্বা, তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। কোমরের কাছ থেকেই রাইফেলের ট্রিগার টিপলো রলিন। কিন্তু পিং করে একটা গাছে গিয়ে বিঁধলো বুলেট।

ক্রোধে বাতাসে থাবা মারলো কয়েকবার ভালুক দু'টো। সময় শেষ। গুলি ভরার বা দৌড়ে পালাবার আর কোনো সুযোগ নেই।

রাইফেলটা মাটিতে ফেলে দিলো রলিন। সহজাত প্রবৃত্তির বশে দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকলো।

দুটো প্রচণ্ড আঘাতে মাটিতে পড়ে গেল সে। পিঠের ওপরে চেপে বসেছে বিশাল দানবীয় ওজন। আঘাত ঠেকাবার জন্যে নিজের অজান্তেই হাত পা ছুঁড়তে লাগলে রলিন।

শরীরের ওপর চেপে বসা ভালুকের গরগর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিশ্বাসের সাথে বোটকা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে জীবটা। মাথার একপাশে প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে গেল রলিন। 'ইয়া খোদা, না।' 'আমার কান। ভালুকটা আমার কান চিবুচ্ছে।'

হঠাৎ মনে পড়লো ভালুক আক্রমণ করলে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো মরার ভান করে পড়ে থাকা। তাতে কোনো রকম চ্যালেঞ্জের সম্ভাবনা না থাকায় অনেক সময় ভালুক উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সুতরাং এখন চুপচাপ শুয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু কিভাবে?

পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে একটা ভালুক দাঁত দিয়ে টেনে টেনে তার মাথার একপাশ থেকে মাংস ছিঁড়ছে। অসহ্য ব্যথায় বুড়ো আঙুল দুটো মাটিতে গেড়ে ফেললো রলিন। হায় খোদা। চিৎকার যেন না করতে হয়।

নিতম্বের কাছে ব্যথার সুঁচ ফুটছে অনবরত, মেরুদণ্ড বেয়ে বয়ে যাচ্ছে ব্যথার তীব্র স্রোত। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। কিছুতেই নড়বে না রলিন। যাই হোক না কেন।

সোলডটনায় বাচ্চা দু'টা রয়ে গেছে। 'ওদের কথা মনে পড়লো' রলিনের। খোদা! ম্যাক্স আর মেলিণ্ডাকে যেন আবার দেখতে পাই। সাত বছরের ম্যাক্সের সবুজ আমুদে চোখজোড়া আর তিন বছরের মেলিণ্ডার মিষ্টি মুখ মনে পড়ছে খুব। মাত্র দুমাস আগে ওদের নিয়ে এসেছিল এখানে। জাম কুড়ানোর জন্য।

খিঁচ দেয়া ব্যথার চোটে বাস্তবে ফিরে এলো রলিন। ভালুক দুটো ওর গলাটা ভালো করে কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে। ভেজা, ঠাণ্ডা মাটিতে দাঁত বসিয়ে দিলো সে যন্ত্রণায়।

একটা ভালুক নখ দিয়ে ওর পিঠটা আঁচড়াচ্ছে। অন্যটা ওর মাথার খুলিতে বসিয়ে দিয়েছে ধারালো দাঁত। কিছুক্ষণ আর সাড়াশব্দ নেই।

আশেপাশেই ঘুরছে জানোয়ারদুটো। শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। সেরেছে। জায়গা বদলেছে মাত্র ওরা। এখন আর ব্যথা লাগছে না। মৃত্যু তাহলে এ-রকম! তাড়াতাড়ি করো খোদা।

হঠাৎ করে গুঁতোনো আর চিবুনো বন্ধ হয়ে গেল। রলিন শুনতে পেলো কাছে দাঁড়িয়ে পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে জন্তুদুটো। মাথা, পিঠ আর পায়ের কাছে সামান্য কাঁপছে ওর। গলা আর মুখের ভিতরে চাপ চাপ রক্ত, ঘাস আর শেওলা। দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। এখন যদি ওঠার চেষ্টা করে তাহলে আবার তেড়ে আসতে পারে ভালুক দুটো। অনেক কষ্টে দম নিলো রলিন।

মরার মতো নিঃসাড় পড়ে রইলো সে।

কেটে যাচ্ছে সময়। মনে মনে ভাবছে রলিন। ভালুকেরা অনেক সময় মুক্ত শিকার করে সাথে সাথেই খেতে শুরু করে। তবে সাধারণত তারা ডালপালা পাতা দিয়ে শিকার ঢেকে রাখে। পরে এসে খায়। এ ক্ষেত্রে যদি তাই করে একমাত্র তাহলেই সে বাঁচার আশা করতে পারে।

ভালুকের ক্লান্ত নিশ্বাসের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। চলে গেছে নাকি? খুব ধীরে ধীরে মাথাটা ঘুরালো ও। তেরছা চোখে চাইলো সামনে। বিষণ্ণ গোধূলির আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভালুকদুটিকে। ছয়গজ দূরে শুকরের মতো কুঁতকুঁতে ছোট চোখে তাকিয়ে ওকে দেখছে। ওদের চোয়াল থেকে ঝরছে রক্তের ফোঁটা।

ওকে নড়তে দেখেই গর্জে উঠলো ভালুক দুটো। তীর বেগে ছুটে এসে ওর মাথার পিছনে খুলির চামড়া-মাংস কামড়ে ধরলো। 'না না। আর না।'

উত্তপ্ত প্রাণঘাতী ব্যথায় বেহুঁশ হবার দশা রলিনের। 'চুপচাপ মরার মতো পড়ে থাকো। মরার মতো,' মনে মনে বলতে লাগলো ও।

ভালুক দুটো এখন ওর পাকস্থলীর ওপরে পেটের নরম মাংস খাবলে ছিঁড়ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারলো রলিন। আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না সে।

নিশব্দ নিরবতা রলিনের মগ্ন চৈতন্যে প্রবেশ করলো। আর শোনা যাচ্ছে না সেই কামড়ানোর শব্দ। সুনসান নীরবতায় ছেয়ে গেছে চারপাশ। ওর রক্তাক্ত শরীর মনে হচ্ছে আঠার মতো সেঁটে গেছে মাটির সাথে। সাহস করে আস্তে আস্তে মাথা তুললো ও।

চলে গেছে ভালুক দুটো।

সত্যিই গেছে? নাকি কাছেই কোথাও ওত পেতে আবার হামলা করার জন্য? আরেকবার টানা হেঁচড়া সহ্য করা সম্ভব নয় তার পক্ষে!

ওরা আবার আসার আগেই উঠে পড়তে হবে ওকে। যেভাবেই হোক। কোনমতে পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলো মনে মনে। পা দুটো এখনও কাজ করছে।

একটা হাত মাথার কাছে তুললো। ওর আঙুল মাথার খুলি আর চামড়ার মাঝখান দিয়ে হড়হড় করে ঢুকে গেল। ভেজা, কুসুম গরম। যেন হ্যাট পরেছে মাথায়। এক হাত দিয়ে চামড়াটা ঠেসে ধরে অন্য হাতে উলের সার্টটা টেনে খুলে ফেললো ও। তারপর সার্টটা দিয়ে কষে বাঁধলো মাথাটা, যাতে আলগা চামড়া সরে না যায়।

কেবিনটা মাত্র আধ মাইল দূরে। জানে সে। কিন্তু কোন্ দিকে? 'বাঁচাও,' দুর্বল গলায় চেঁচালো রলিন। না এভাবে হবে না। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে প্রাণ-পণে চেঁচালো আবার, 'বাঁচাও ড্যারেল।'

প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর একটু জোরে হাঁটতে শুরু করলো ও, কিছুক্ষণ আগে ড্যারেলকে যেখানে রেখে এসেছিল সেদিকে। কিছু একটা শব্দ কানে গেল ওর। ভালুক?

আতঙ্কে জমে গেল ও। চিৎকার করার সাহস হারিয়ে ফেললো। এই সময় একটা কণ্ঠ শুনতে পেলো, 'আসছি আমি।'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো ড্যারেল। রলিনকে দেখে মুখের সব রক্ত সরে গেল ওর। 'আরেকটু কষ্ট করো।' বলেই বন্ধুকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলো ও।

দাঁতে দাঁত চেপে অনেক কষ্টে হাঁটতে লাগলো রলিন। যখন কেবিনে পৌঁছলো ওরা, তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে গেছে পৃথিবী।

দক্ষ হাতে রলিনের মাথার চারপাশ ঘিরে একটা টাওয়েল বেঁধে দিলো ড্যারেল। কপাল বেয়ে রক্তের ফোঁটা

(৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মন কি?

মাহমুদা আকন্দ

মনের সাথে মন মেলাতে বিফল হয়ে প্রাণ দিয়েছে কতো ক্ষুব্ধ প্রেমিক। রচিত হয়েছে কতো না ইতিহাস! কিন্তু মন আসলে কি?

মন ভালো না থাকলে কোনো-কিছুই আমাদের ভালো লাগে না। দৈহিক অসুস্থতা যেমন মনের বল স্তিমিত করে দেয় তেমনি মনের অসুস্থ-তাও দেহকে দুর্বল করে। কেউ কেউ বলেন, মনের অসুখ বড় অসুখ, যা সহজে সারানো যায় না। মন যে কখন কি চায় তার হদিস মেলা ভার। কাব্য বলে,

কখনও কখনও অশান্ত নদী হয়ে যায় মন। ঝড়ো হাওয়ার দাপটে অস্থিরতা ঘিরে রাখে সারাক্ষণ। আর তাই মনের সাথে মন মেলাতে বিফল হয়ে প্রাণ দিয়েছে কতো ক্ষুব্ধ প্রেমিক। রচিত হয়েছে কতো না ইতিহাস। কিন্তু আসলে মন কি?

মন কোনো ধরাছোঁয়ার বস্তু নয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনোটির সাহায্যেই আমরা মনকে স্পর্শ করতে পারি না। আমরা মনকে জানি তার কাজের প্রকাশে। মনের কাজ তিনটি—চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা।

অনেকে মনে করেন, চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি মনের প্রতীয়মান রূপ, এছাড়াও মনের একটা পৃথক সত্তা আছে। সুতরাং মন কি এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, মন হলো যা চিন্তা করে, যার অনুভূতি আছে এবং যা ইচ্ছা করে।

মন আছে কি নেই এটাও একটা বিতর্কমূলক প্রশ্ন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও মনোবিদগণ বিবিধ মত ব্যক্ত করেন।

গ্রীক দার্শনিকরা মন বা আত্মাকেই জীবের মূল সত্তা বলে জানতেন। আত্মা ছাড়া জীবদেহ জড় পদার্থে পরিণত হয় এই ছিলো তাদের মনোভাব। মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণও মানুষের মধ্যে দেহ ও মন বলে দুইটি পৃথক ও স্বাধীন সত্তার কল্পনা করেন। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ট-এর মতে, মন ও আত্মা সমব্যাপক। তাঁর মতে, মানুষের দেহ জড় পদার্থ ও অচেতন এবং মন বা আত্মা সচেতন। মনের কাজ হলো সংবেদন গ্রহণ করা, চিন্তা করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি। ডেকার্ট মনে করতেন, মানুষের মধ্যে মন ও দেহ এই দু'টির সম্মেলন হয়েছে। মানুষের মন অতিন্দ্রিয় আর দেহ প্রাকৃতিক। মাইণ্ড ইজ দ্য নোয়ার অর্থাৎ মন হলো জ্ঞাতা। তিনি বলেন, মানুষের মনের কতোগুলো ভাব জন্মগত এবং ঈশ্বর প্রদত্ত আর কতোগুলো ভাব সংবেদন থেকে আগত। কিন্তু লক্ বলেন, মানুষের কোনো ভাব বা ধারণা জন্মগত নয়, সমস্ত ধারণাই সংবেদন থেকে আসে। তিনি মনের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করতে পারেননি।

মনোবিজ্ঞানী উণ্ড বিশ্বাস করতেন যে, সংবেদনই একমাত্র মানসিক ক্রিয়া, মনের বিভিন্ন সচেতন অবস্থা এবং ধারণা সৃষ্টি করার মৌলিক উপাদান হলো সংবেদন। কিন্তু উণ্ড মানসিক কার্যকলাপকে দৈহিক ক্রিয়া থেকে পৃথক করে দেখতেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত বিজ্ঞানী শেচেনভ্ তাঁর বিখ্যাত রিফ্লেক্সস অভ দ্য ব্রেইননামক গ্রন্থে সমস্ত মানসিক কাজকে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করেন। বিখ্যাত বাস্তববাদী দার্শনিক কার্ল মার্কস—তাঁর মতে, চেতনা হলো মস্তিষ্কের সামগ্রিক ক্রিয়া এবং সংবেদন; চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়া হলো মানুষের চেতনায় বাস্তব জগতের এক একটি প্রতিফলন।

মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসনের মতে, মানুষের মন ধরাছোঁয়ার বাইরে এবং এর কোনো সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। মানুষ যা কিছু করে সবই হলো তার আচরণ। আচরণ হলো বিশেষ কোনো উদ্দীপকের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া।

আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক ক্রিয়াকে প্রাণীর আচরণ বা প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করেন। আধুনিক সোভিয়েত মনোবিজ্ঞানীরা চেতনাকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বলে স্বীকার করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উভয় দেশের মনোবিজ্ঞানীরাই অতিন্দ্রিয় মন বা আত্মাকে, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। □
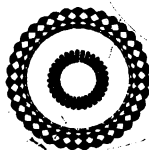
'নামে কি-বা আসে যায়!' কথাটা অনেকেই বলেন, ঠিক কি বেঠিক সে বিতর্কে যাবো না। কারণ দু'পক্ষেই ম্যালা সমর্থক, তাদের যুক্তিও প্রচুর। তারচেয়ে বরং কতকগুলো নাম শোনাই, আমার স্থির বিশ্বাস, আমার মতো আপনাদেরও শ্রবণ ও মন সার্থক হবে।

একজন শিশু জন্মগ্রহণের পরই তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে নাম রাখবার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সবারই ইচ্ছে, তার নামটাই রাখা হোক। শেষে হয়তো দেখা যায়, যাদের নামগুলো বাদ পড়েছে তাদের মুখ ভার। অনেকে আবার বেশ ক'টি নামে শিশুকে ডাকে। এমন একজনকে জানি, ছ'/সাত বছর পর তাদের এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান হয়েছে। সেই দম্পতি প্রায় প্রতিটি ঘনিষ্ঠজনদের রাখা নামে ডাকেন। শিশুটির মা ওর নাম রেখেছে তাসন্নুবা, অর্থাৎ 'এক টুকরো সোনা', ওর বাবা কিন্তু সে নামে ডাকেন না। তিনি রেখেছেন 'শাহরীন'। আন্টি-আংকলদের কাছেও তার ভিন্ন ভিন্ন নাম। কেউ ডাকে এপা, কেউ এষা, কেউ বা ডাকে আহানা। আমার এক বান্ধবী ছিলো; ওর নাকি নানুবাসায় এক নাম চালু ছিলো, দাদু বাড়ি আরেক নাম। নানুবাড়ির লাইলী, দাদু বাড়িতে চম্পা। এ বাড়ির লোকেরা লাইলী নাম জানলেও ছোটদের কিংবা

বাসার কাজের মানুষদের অনেকেই নাকি জানতো না। ও বাড়ির অবস্থাও অনুরূপ উল্টোটা। তো একদিন হয়েছে কি, ওর নানুবাড়ির এক লোক নাকি নোয়াখালী থেকে কুমিল্লা গেছে। ওখানে যেয়ে, বার মহলে খেলছিল ছোটো একটা বাচ্চা, তাকে জিজ্ঞেস করেছে,'এই বাবু, এটা কি লাইলীদের বাসা ? ওরা ঢাকায় থাকে ।' তখন ছেলেটির চটপট জবাব, 'না এটা লাইলীদের বাসা না…।' শুনে ভদ্রলোক তো হতভম্ব। 'বলে কি! বাড়ির লোকেশন মিলে যাচ্ছে। অন্যান্য সব মিলে যাচ্ছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একজন মুরুব্বির সহায়তায় তিনি অন্তরমহলে ঢুকতে পেরেছিলেন।

নাম—সে তো প্রতিটি জিনিসেরই আছে। পৃথক পৃথক। নামেই না কি চেনা যায়। কি জানি, কথাটা কতটুকু সত্যি! কারো কারো নাম শুনি ফুলের নামে—বেলী, হাস্নাহেনা, চামেলী, জবা, বকুল, অপরাজিতা, রঙ্গন ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ রাখেন ফলের নামে নাম। আম-জাম কলা-নারিকেল না রাখলেও আতা, আঙ্গুর, পেয়ারা, ডালিম, বেদানা এসব নাম আদরের সাথেই রাখেন। পদ্মা, মেঘনা, সুরমা, যমুনা—বাংলাদেশের এই চারটি প্রধান নদীর নামও অনেকের কন্যা সন্তানের নাম। জানি না করোতোয়া, কপোতাক্ষ, আড়িয়াল খাঁ এ-সব নামেও কেউ আছেন নাকি। তবে, তিতাস নাম বউ শুনেছি।

প্রতিটি মানুষের কাছেই তার নিজ নামটি খু-উ-ব প্রিয়—এ আমি জানি। মা-বাবার কাছেও তার সন্তানের নামটি প্রিয়। তাই বোধহয় অনেকে তাদের সোনামনিদের নাম রেখেছেন—মাখন, ছানা, মধু, সুইট, সুইটি, মিষ্টি, চিনি, হানি, টফি, আরো কতো কি!

কোল্ড ড্রিংকস-এর নামে নাম আপনাদের কারো আছে কি না আমার জানা নেই। '৮৭'র কোরবানী ঈদে এদের নাম শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ছোটো দু'টি ভাই-বোন—পেপসি আর মিরিণ্ডা। শেষের জন ভাই। ওদের মাকে কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ওদের আরো একজন ভাই-বোন হলে কি নাম রাখবেন ?' ভদ্রমহিলা শুধু হেসেছিলেন, কোনো উত্তর দেননি। কোকো-কোলা, ফানটা, স্প্রাইট কিংবা নতুন নামের কিছু বোধহয়।

এবার আসি লগ্ন নিয়ে। শিশু সকাল-দুপুর-রাত—যে কোনো সময় পৃথিবীর আলো দেখতে পারে। এই চারটা নাম না রাখলেও অনেকে উষা, রাত্রি, সন্ধ্যা রাখেন। 'সাতদিনে এক সপ্তাহ—' এটা তো স্কুলে ভর্তি হবার আগেই শিখেছি। বারের নামে মানুষের নাম কখনো শুনেছেন ? শোনেননি! তবে বলছি শুনে রাখুন, ভবিষ্যতে আপনাদের কাজে দিতে পারে। শনি, রবি, মঙ্গল, বুধাই, জুম্মা। হয়তো তারা এই এই বারে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমাদের স্কুলের ইংরেজী স্যারের নাতনী শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। নাতনীর নাম তো আর শুক্র বা শুক্রা রাখা যায় না। তাই তারা বৈঠকে বসে আলোচনা-সমালোচনা করে ওর নাম রেখেছে'জুম্মী। ইংরেজী মাসের নামে আমি মাত্র একটা নাম শুনেছি। এজন্যে আমার আফসোসের অন্ত নেই। ন-দশ বছরের এক ছেলে, ওর নাম 'জুন'। ওর মা জাপানী, বাবা বাঙালী। আর বাংলা মাসের নামে তো গ্রাম বাংলায় অনেক নাম চালু আছে। এখন খোদ ঢাকা শহরেও সে সব নাম শুনতে পাই। অবশ্য, হুবহু নয়, একটু কৌশলে রাখা হয়েছে, এই আর কি! বাংলাদেশ টি.ভি.র দু'জন অভিনেত্রীর নাম ফাল্গুনী হামিদ ও ফাল্গুনী আহমেদ! শেষের জন কয়েকটি পণ্যের মডেল হয়েছেন। ইদানিং সিনেমাও করছেন। টি.ভি.র আরো একজন মডেল কন্যা

শ্রাবণী চৌধুরী। এছাড়াও আছে—শাওন, চৈতী, আশ্বিনীকুমার—সবই বাংলামাসের নামের সাথে মেলানো নাম। শুনতে কিন্তু মন্দ লাগে না, কি বলেন?

সৌন্দর্যের জন্য অনেকেই আংটি পড়েন। কেও কেও ভাগ্যে বিশ্বাসী হয়ে জ্যোতিষীদের উপদেশ মেনে বিভিন্ন পাথরের আংটিও পড়েন। কিন্তু কোনো ছেলের নাম যদি আংটি হয় তবে কেমন লাগে বলুন তো? আচ্ছা, আপনারা কখনো শুনেছেন—মানুষের নাম ঘড়ি? নিশ্চয়ই শোনেননি। ঘড়ি নামে এক ভদ্রলোককে আমি চিনি। আর আমার যতোদূর মনে হয় এ নামে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি। অবশ্য 'ঘড়ি মিঞা' তার ডাক নাম। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি। এ ছাড়াও অনেক সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত। ঢাকার মোঃপুরে ওনার বাসা।

দেশের নামের সাথে মিল রেখে নাম—সে তো কতো শুনি। টাউন হল বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে থাকে ওরা চার বোন। বড় দু'জনের নাম লিবিয়া, রুমানিয়া। সাত মসজিদ রোডে থাকতো দু'বোন, ওদের নাম ইরানী, জাপানী। এদেরই পাড়ায় রাস্তার অপর পাশের বিল্ডিংএ থাকতো দু'জন, বিজ্ঞানীর নামে নাম, নিউটন আর এডিসন। এরা এখনও ঢাকায় থাকে। ফার্মগেটে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান বাস করেন তা কি জানেন? না, না। ভুল বুঝবেন না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন। তিনি এই দরিদ্র দেশের রিগ্যান মাত্র। তবে, তার বাবা-মা আদর করে 'বাবা রিগ্যান,' 'প্রেসিডেন্ট রিগ্যান' বলে ডাকেন। তিন বছরের ছেলেটিও দিব্যি উত্তর দেয়। সম্প্রতি ওর আরেকটি ভাই হয়েছে। এখনও জানি না তার কি নাম রাখা হয়েছে। ওর নাম গরবাচেভ রাখলেও অবাক হবো না।

নওগাঁতে আমার পরিচিত এক পরিবারের দুটি ছেলের নাম, মর্টার ও মাইন। ঢাকার নূরজাহান রোডে আছে পিটি, মিটি, নিটি, শেষের জনের নাম সম্ভবতঃ সিটি। পিটি করতে করতে সিটির মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া। চমৎকার, তাই না? বগুড়ার জ্বলেশ্বরীতলায় আছে বিমান, পাইলট। রকেটও আছে। তবে ও ওদের ভাই নয়। আমার বাড়িওয়ালার নাম ঠাণ্ডা। ওনার মুখেই শুনেছি ছোটো বেলায় উনি খুব শান্তশিষ্ট ছিলেন তাই ওনার দাদু আদর করে 'ঠাণ্ডা' নামে ডাকতেন। এখনও ওটা মিজান সাহেবের ঘরোয়া নামের মর্যাদা পাচ্ছে। '৮৩'র দিকে বগুড়ার কালিতলায় থাকতেন। তখন ওনাদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। এ মুহূর্তে সব ভাই-বোনদের নাম মনে নেই। তবে যে ক'টা মনে আছে তা আপনাদের না বলে থাকতে পারছি না। বড় আন্টির [আন্টি বলে ডাকতাম] নাম দরদী। ওনার স্নেহ-মমতা খুব বেশি ছিলো কি-না কখনো টের পাইনি। ছোটো আন্টির নাম ফুয়ারা। আর ছোটো মামার নাম ছিলো বুলেট। অন্যান্যদের নামগুলো মনে পড়ছে না দেখে আমার কিন্তু রীতিমতো খারাপই লাগছে। আমার এক চাচীর নাম মনা। ওনার বড় বোনের নাম 'বাচ্চা' বা 'বাচ্চি'! ছোটোটি 'ইতি' অর্থাৎ 'শেষ'। এর পরে আরেকজন হলে ঠিক নাম রাখতো?

'৮৫'র ডিসেম্বর। আগারগাঁও কমিউনিটি সেন্টারে আত্মীয়ার বিয়ে খেতে গেছি। পাশে বসা এক ভদ্রমহিলা ওনার চারটি বাচ্চাকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন—দৃশ্যটা বেশ কিছুক্ষণ ধরেই দেখছি। একটু পরপরই কানে আসছে, 'বন্যা ওদিকে যেও না।' 'বৃষ্টি যাওতো ভাস্করকে ধরে নিয়ে এসো।' ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবলাম ওনার সাথে একটু আলাপ করি। বললাম, 'ওরা কিন্তু

বাচ্চাগুলোকে ঘৃণায় নেবে না।

সোনারগাঁতে পিকনিকে যেয়ে এমন একজনের সাথে পরিচয় হয়েছিল। অথচ ভদ্রমহিলা রীতিমতো উচ্চ শিক্ষিতা। তারই বাচ্চা দু'টির নাম, কুড়ানী আর পটলা। ফুটফুটে সুন্দর, চটপটে বাচ্চা দুটির এরকম নাম শুনে আমার খারাপ লেগেছিল। সেজন্য বলেছিলাম, এখন তো পাল্টে রাখতে পারেন।' এ কথায় মহিলা এমন ভাবে আঁতকে উঠেছিলেন যে মনে হয়েছিলো খুবই খারাপ, অন্যায় কিছু বলে ফেলেছি। 'না, না, তা হয় না, ওদের এ নামই থাকুক—'আমি এটুকু শুনেই তার বিশ্বাসের গভীরতা দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছি শুধু। আমাদের বিদ্রোহী কবির ডাক নাম দুখু মিঞা। পর পর অনেকগুলো সন্তান মারা যাবার পর তার জন্ম হয়েছিল। তাইতো সবাই তাকে দুখু বলে ডাকতো। এই কবির এক নাতনীর নাম হাসির শব্দ। বলুন তো কি?—পারবেন না? 'খিলখিল।' তিনি নজরুল গীতির একজন শিল্পী।

এবার আসি, দুগ্ধজাত দ্রব্য নিয়ে। কি, চমকে উঠলেন? প্লিজ, চমকাবেন না। আপনারা শুনেছেন এমন নামই বলবো। 'ছানা, বাটার, মাখন, পনির। পনির নামের একজনকে অবশ্য অনেকেই চেনেন। ঐ যে, সিনেমা তৈরি করেন। মনে পড়ছে, এবার?—খুঁজলে, আরো নাম পাওয়া যাবে। তবে, এটুকই থাক। এবার অন্য দিকে যাওয়া যাক। কি বলেন?

এ মুহূর্তে আরো কয়েকটি ব্যাতিক্রম-ধর্মী নাম মনে পড়ছে। যদিও ব্যতিক্রম তবে প্রতিটির অর্থও আছে। তিলোত্তমা, কারিশমা, 'তিলোত্তমা ঢাকা নগরী'—এ বাক্য তো অহরহ শুনছি। 'ইস, ওনার কারিশমা দেখে বাঁচি না। ক্যারিশমার অনেকগুলি অর্থ আছে। ভালো অর্থে কাজ, কায়দা, (যেমন, বেশ ক্যারিশমা করে কাজটা বাগিয়েছি।) খারাপ অর্থে ন্যাকামো, ঢং ইত্যাদি। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী বন্যার একমাত্র কন্যার নাম 'প্রিয়দর্শিনী'। অর্থাৎ সুন্দর মুখশ্রী। দেখতে সুন্দর এই অর্থেই বোধহয় প্রিয়দর্শিনী বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রখ্যাত অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদীর মেয়ের নাম 'দেবযানী'। আমি কিন্তু নামটা এই একজনেরই শুনেছি। তারা আর পাঁচ জনের চেয়ে আলাদা। এজন্য, পুত্র-কন্যার নামও বেছে বেছে রাখেন বোধহয়। যাতে করে এক নামে সবাই চেনে। আমার এক বন্ধুর নাম শ্রাবন্তী। কিন্তু ওর গ্রামেমানুষ চাচা-চাচী-ভাই-বোনরা 'শেরাবণতী' 'শিরাবোনতি' উচ্চারণ করতো দেখে ওর একটা সহজ নামও রাখা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমার আরেকজনের কথা মনে পড়ে গেল। ওর নাম স্মিতা। কিন্তু উচ্চারণ বিকৃতির কারণে কারো কাছে যে 'ইসমিতা,' কারো কাছে 'আসমিত্যা'। শেষে ওর মা-বাবা গ্রামের বাড়িতে মিতা নাম চালু করলেন। যাদের অসুবিধে হতো তারাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কি, মুশকিল, তাই না?

আচ্ছা, আপনারা জীবনে কখনো শুনেছেন যে, 'আণ্ডা' মানুষের নাম? শোনেননি। আর, শুনবেন কি করে! এ নামে তো পৃথিবীতে একজন, হ্যাঁ, মাত্র একজনই আছে। তার বাড়ি নরসিংদী। আগে আমার মামার দোকানের কর্মচারী ছিলো। এখন না-কি নিজেই কাটা কাপড়ের বিজনেস করে। পুরান ঢাকায় থাকে।

'উৎস' নামটা কেমন? আমাকে একজন গর্বভরে শুধিয়েছিলো। উত্তর দেইনি। আপনারাই বলুন, কেমন? নাম রাখা হয় শুরু—শেষকে উপলক্ষ্য করে। অনেক প্রথম বাচ্চার নাম, শুভ, উৎস (একজনেরই শুনেছি), সূচনা, এবং শেষ হলে, চায়না, (চাই না আরকি!) ইতি,

সমাপ্তি, সমাপ্ত, আরনা ইত্যাদি রাখে। 'আরনা' আমি অনেক জনের নাম শুনেছি। কিংবা যখন পরপর মেয়ে হয় তখনো চায়না, আরনা, অনেকেই রাখেন। এটাও বুঝিবা এক ধরনের কুসংস্কার, কি বলেন? আমার নানুর কাছে শুনেছি, তারা চোদ্দ জন ভাই-বোন। তিনি সবার ছোটো। সেজন্য ওনার দাদী ওনার নাম রেখেছিলেন 'ফুরু'। অর্থাৎ শেষ আমরা সুযোগ পেলেই নানুকে খ্যাপাতাম 'ফুরুৎ' বলে। ওরে বাপরে—কী রাগাটাই না রাগতো। একটা বাচ্চার নাম 'দ্বিতীয়'। ও মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান। কণ্ঠশিল্পী মাহ্ মুদুন্নবীর ছেলের নাম পঞ্চম। ও পঞ্চম সন্তান কি না তা অবশ্য বলতে পারবো না।

আরো কিছু নাম আছে যেমন ধরুন—কচি, খুকু, খোকন, বাবু, ছোটমনি, বাচ্চু, শিশু এসব নাম শুনলে আমার কি মনে হয় জানেন? এরা কখনো বড় হবে না। মা-বাবার আদরের কচি খোকা খুকু হয়েই থাকবেন চিরটিকাল। আর কয়েকটি নাম শুনে তো আমি বুঝতেই পারি না—উনি ছেলে না মেয়ে। ফেরদৌস, বুলবুল, টুলটুল, কাজল, দোলন, পলাশ, শিমুল, রাতুল, এ ধরনের হাজারো নাম আছে; লিখতে গেলে আমার কাগজেও কুলোবে না। তারপর অনেকে আবার ছেলের মেয়েলি নাম রাখতে পছন্দ করেন। ঝুনা চৌধুরী,-বাবুনী—এদের দু'জনকেই আপনারা চেনেন। প্রথম জন অভিনেতা; দ্বিতীয় জন অভিনেত্রী কবরীর ছেলে। আবার, কোনো মেয়ের নামে যদি মনে হয় তিনি ছেলে, তবে কি বিব্রতকর অবস্থার মাঝেই না পড়তে হয়!

দেশে-বিদেশে অনেক পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। আমার মনে হয় যারা এমন মজার মজার নাম জন সমক্ষে উপহার দেন—তারাও কিছু পুরস্কারের দাবিদার। ঐ যে কথা আছে না-'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু, বিন্দু জল,
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।'
—হয়তো দেখা যাবে অদূর ভবিষ্যতে একদিন নামের বিষয়ে অস্কার পুরস্কার দেয়া হবে। ইস্, কি মজাটাই না হতো তাহলে। হাড়ি, পাতিল, বদনা, ঘটি, বাটি, টি.ভি. রেডিও ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষের নাম হয়েও শোভা বর্ধন করতো। তখন—কেও একজন একটা ফ্রিজ কিনলে হয়তো রসিদের নিচে লিখতেন,'আমি মোঃ ফ্রিজ আলী একখানা ফ্রিজ ক্রয় করিলাম··। কি দারুণ! আহা, আমি যদি দেখে যেতে পারতাম! কিন্তু···কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা ভয় হচ্ছে যে! তখন যদি দেশে নামের আকাল পড়ে, নামের দুর্ভিক্ষ আর কি! তখন কি হবে?

বিদেশী বন্ধুদেশ গুলো, নামের রিলিফ পাঠাবে, কিছু ঋণও নেয়া যাবে। ব্যা—স ওতেই কিছু দিন চলবে।

আপনারা জানেন কি নাম নিয়ে ব্যবসা আমাদের দেশে বেশ অনেক দিন ধরেই চলছে। কেন দেখেননি—সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বিভাগে—'নাম পাঠান। অ, ক অক্ষর দিয়ে। নির্বাচিত নামের জন্য একশ' টাকা দেয়া হবে।' এর পর হয়তো স্কুলে রচনা 'ইয়োর এইম ইন লাইফ-'এ সোনামনিরা লিখবে, 'আমি বড় হয়ে একটা নামের প্রতিষ্ঠান খুলবো। যেখানে নামের কারখানা থাকবে। সুন্দর নাম উৎপন্ন হবে। মান উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার থাকবে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে,বিদেশেও রপ্তানি করবো···।' কী চমৎকার পরিকল্পনা, তাই না?

মানুষের নাম যে 'মিস্টার'ও হয় সেটা আমি জানতাম না। 'মিস্টার' আমাদের মামা, মানে ছোটোবোনের ফ্রেণ্ডের মামা। সেই সূত্রে আমাদেরও মামা আর কি! মিস্টার-এর অর্থ করলে দাঁড়ায়—জনাব, মহাশয় ইত্যাদি। তবে জনাব

নাম আমি শুনেছি। উনি আব্বুর অফি-সে চাকুরি করেন। মিস্টার মামা, জনাব চাচা, শুনতে কেমন মজা লাগছে, তাই না? আচ্ছা, মিস্টার মামা জনাব চাচাকে যখন কেউ নিমন্ত্রণ কার্ড (কোনো অনু-ষ্ঠানের) দেয়, তখন খামের ওপরে কি লেখেন? 'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মিস্টার' আর চাচার বেলায় 'জনাব এবং জনাবা জনাব'—বোধহয়। আহারে! তাদেরকে কতোই না মাথা খাটাতে হয়। মনে নিশ্চয় ভয় থাকে—পাছে ওনারা মনে মনে বেয়াদবী (নাম নিয়ে) ভেবে বসেন।

লঞ্চ, স্টিমার, নৌকা মানুষের নাম না হলেও 'ফেরী' কিন্তু মানুষের নাম হয়েও শোভা বাড়াচ্ছে। এসব ছাড়াও অনেকের দৈহিক খুঁতও নামের অঙ্গ হিসেবে ব্যব-হার হয়। যেমন মজা পাগলা, সফু কানী, ল্যাংড়া ব্যাপারী, নারান হাতকাটা ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা অনেকের কাছে চেনার জন্য সুবিধাজনক হলেও তাদের কাছে সুখকর নয়।

অনেক হলো। আজ এপর্যন্তই থাক। আর একটা কথা—যাদের নাম এ সব নামের মধ্যে পড়েছে, তারা কিন্তু একটুও মাইণ্ড করতে পারবেন না। কোথায় জানি একটা গান শুনেছিলাম, কথাগুলো মনে হয় এই—

'নামের বড়াই কইরো না ভাই
নাম দিয়ে কি হয়
নামের মাঝে পাবে নাকো
সবার পরিচয়'।

—সত্যি কিন্তু! স্বজন, বিজন সবাইকে অনন্ত শুভেচ্ছা। 'সবাইকে' শব্দটার আগে ও পরে ও-চারটেও কিন্তু মানুষের নাম। এই এক্ষুণি লিখতে যেয়ে মনে পড়লো। স্বজন-বিজন আব্বুর বন্ধুর ছেলে। আর অনন্ত, সঙ্গীতা-শুভেচ্ছা, আমাদের টিচারের বাচ্চাদের নাম। আর নয়—ধন্যবাদ। □
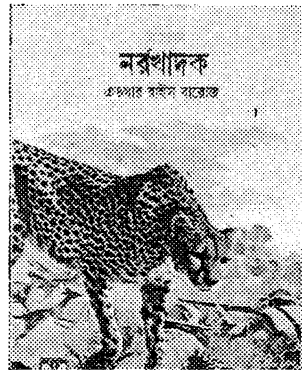
আমাদের ফুল, আমাদের ছোট্ট মেলকে নিয়ে গেলেন ঈশ্বর
তাঁরও বোধহয় গন্ধ শোঁকার ইচ্ছা

‘পাথরে লেখো নাম…’

জাকির হাসান সেলিম

‘I want to live unseen
and unknown
Unlamented to die—’

এমনিতরো ইচ্ছা কারো কারো থাকলেও সবার থাকে না—নশ্বর জীবন পাতের পর অনেকেই নিজের বা প্রিয়জনের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখার সহজাত প্রয়াসে কবরগাত্রে লিখে রাখে নাম, সঙ্গে হয়তো কীর্তিবাহী আরো দু'চার কথা। আর তা-ই হচ্ছে ‘এপিটাফ’, বাংলায় বলা যায় ‘সমাধিলিপি’।

‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে’; হ্যাঁ মৃত্যুর মাঝেই জীবনের বিনাশ—বেদনাদায়ক হলেও এ চিরসত্য। এই দুঃসহ চেতনা থেকেই সম্ভবত এপিটাফের উৎপত্তি ও প্রচলন। এপিটাফ মৃতের প্রতি শোক-শ্রদ্ধা-সম্মান স্নেহ-ভালবাসা প্রকাশের পাষাণ-মাধ্যম। এপিটাফ স্মৃতির মিনার, মৃত্যুঞ্জয়ী ফলক।

পূর্বে এপিটাফ অনেকটা রাজসখ ছিলো বলা যায়। এখনও অবশ্য সমাধিসৌধ ও সমাধিলিপি তৈরির সাথে সামর্থ্যের প্রশ্নটি ব্যাপকভাবে জড়িত। এ উপমহাদেশের অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ্'র কবরগাত্রে কেবল তাঁর জন্ম-মৃত্যু তারিখ এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত উৎকীর্ণ আছে।

এক্ষেত্রে নবাব মুর্শিদকুলী খানের ফার্সি এপিটাফটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তার বাংলা হলো : 'হযরত মুহম্মদ (দঃ) দুনিয়া ও বেহেশতের গৌরব। যে ব্যক্তি তাঁর দুয়ারের ধূলিরও যোগ্য নয় তার মাথায় পূণ্যবান বান্দার পদধূলি পড়ুক।' উল্লেখ্য, ধর্মান্তরিত মুর্শিদকুলী খান তাঁর এই ইচ্ছা-পূরণের জন্য কাটরা মসজিদের সিঁড়ির তলায় সমাহিত হয়েছেন। রানী অ্যান-এর এপিটাফটি চমৎকার : 'চিরহরিৎ এই দীর্ঘ বৃক্ষটিকে মার্চ তার বায়ুপ্রবাহ দিয়ে আঘাত হেনেছিল, পতনে তার কেঁদে-ছিল এপ্রিল, যে তাই সারা মাস কোনো ফুল ফোটাতে চায়নি পাছে বসন্তের সব ফুল হারিয়ে যায়।' মহামতি সম্রাট আলেকজাণ্ডারের আত্মবিশ্বাস খোদিত আছে তার সমাধিলিপিতে : 'এখানে এই মাটির ঢিবি যাকে ঢেকে রেখেছে পৃথিবীটা তার জন্যে খুব বেশি বড়ো ছিলো না।' এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়ালপোল স্থাপিত কর্সিকার রাজা থিওডোরের কাব্যময় এপিটাফটি বেশ দর্শনাশ্রয়ী : 'The grave—great teachers to the level bringth/Heroes and beggars galley slaves and kings.' অর্থ হচ্ছে : 'কবর এক মহান শিক্ষক যা বীর-ভিখারী ও ভৃত্যরাজাকে এক কাতারে নিয়ে আসে।' আর ভারতবর্ষের শেষ মোগল-সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর তাঁর মাজারে উৎকীর্ণ করে রাখার জন্য অন্তিম বাণীতে দুঃখ এবং খেদভরে লিখেছিলেন : 'কিতনা বদনসিব হ্যায় জাফর দাফন কে লিয়ে, দো গজ জমিন ভি না মিলি…'।

এ তো গেল রাজা-সম্রাটদের কথা। ইয়র্কশায়ারের মুকুটহীন সম্রাট রবিন-হুডের কবরগাত্রেও রয়েছে তার স্তুতি-মূলক এপিটাফ, যার মূল ভাবটি হলো: 'এখানে হান্টিংডনের রবার্ট আর্ল শুয়ে আছেন। সবাই তাকে রবিনহুড বলে ডাকতো। তার মতো ভালো মানুষ ইং-ল্যাণ্ড আর কখনো দেখবে না।'

কবি-সাহিত্যিকদের মৃত্যু-চিন্তা যেমন কিছুটা ভিন্নধর্মী তেমনই তাদের এপি-টাফেও কিছুটা বৈচিত্র্য অনভিপ্রেত নয়—স্যাডেস্ট থট-ও সেখানে সুইটেস্ট সঙ হয়ে ওঠে।

'দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে : তিষ্ঠ ক্ষণকাল : এ সমাধিস্থলে।

শহীদ আবুল বরকত-এর সমাধি

(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রারত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন ;
যশোরে সাগর-দাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে জননী জ্যাহ্নবী।'

কলকাতার মল্লিকবাজার সিমেট্রিতে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবক্ষ

মূর্তির নিচে মর্মরে খোদাই তাঁর স্বরচিত এই এপিটাফটির কথা সবারই জানা।

কবি বেন জনসনের কবরগাত্রে কাঠ-খোট্টা এপিটাফটির ভাবার্থ হলো: 'এখানে আর সব কবিদের সঙ্গে শুয়ে আছেন বেন জনসন, যিনি শ্রেষ্ঠ। তার সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাইলে তার জীবনী পাঠ করুন—অযথা এই পাথরকে জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ সে ভাষা-হীন।' আর বোন অগাস্টা নির্মিত সুবিখ্যাত কবি বায়রনের নিতান্ত গদ্যময় এপিটাফটিতে লেখা আছে: 'নিচের আঁধারে যেখানে তার পূর্বপুরুষ এবং মা'কে সমাহিত করা হয়েছে সেখানে ল্যাংকস্টার কাউন্টির জর্জ গর্ডন নোয়েল বায়রনের দেহাবশেষ রক্ষিত রয়েছে।'

সবচেয়ে ছন্দময় ও আবেগঘন সমাধিলিপিটি আছে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কবরে:

'বার মাজারে বা গরীবান
না চেরাগে না গুলে।
না পোড়ে পরওয়ানা সাদদ
না সাতারে বুলবুলে।'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে—

'গরীব গোরে দীপ জ্বেলো না,
ফুল দিও না কেউ ভুলে।
শামা পোকার না পোড়ে পাখ,
দাগা না পায় বুলবুলে।

'এখানে সা'দত হাসান সান্টো সমাহিত রয়েছে। তার অন্তরের সমস্ত লেখনশৈলীর তত্ত্ব ও তথ্য সঙ্গে নিয়ে বহু মণ মাটির নিচে থেকে সে এখনও চিন্তা করছে যে সে-ই বড় গল্পকার, নাকি খোদা' —মৃত্যুর আগেই অমর উর্দু সাহিত্যিক সা'দত হাসান সান্টো তাঁর এ আত্মম্ভরী এপিটাফ রচনা করেছিলেন।

ঢাকার আজিমপুর নতুন গোরস্থানে এদেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল হাই-এর সমাধিস্থ দীর্ঘ এপিটাফটি থেকে তাঁর যে পরিচিতি মেলে, সেটি হলো:

'মরিচা, মুর্শিদাবাদ: জন্মভূমি তাঁর।
আমৃত্যু রবীন্দ্রপ্রেমে দীপ্তিমান শিখা
প্রসন্ন পাণিনি ধ্যানে সম্পন্ন দীপিকা।
ধ্বনিতত্ত্বে কীর্তিমান একান্ত সবার
স্মৃতিমান্য; মিতবাক, সুকৃত, সুজন।
বিপুলবিত্ত প্রাণ অধ্যাপক—যাঁর

ইয়াকুব আলীর কবর

প্রীতিকণ্ঠ বিদ্যাঙ্গনে ঝরেছে অপার।
অনন্য ব্যক্তিত্ব স্নিগ্ধ সুস্মিত আনন।
বাংলার অমেয় কৃষ্টি সংশয়িত হলে
প্রতিকূল শক্তিশালী অতন্দ্র প্রহরা
দিয়েছেন বারংবার; তবু অশ্রুতলে
বিদ্যার তীর্থ আজ শূন্যতায় ভরা;
আগন্তুক ঋতু স্বপ্নে বৃক্ষপ্রেম জ্বলে;
তোমার নিঃশ্বাস বুঝি ফুলের পশরা?'

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এ দু'টি লাইন আজ শ্রেষ্ঠ এপিটাফের মর্যাদা পেয়েছে।

এছাড়া বাংলা ভাষায় বেশ ক'জন জীবিত কবি 'এপিটাফ' শীর্ষক কবিতাও লিখেছেন—এমনি দু'জনের কবিতা এখানে তুলে ধরা হলো :

'কিছুকাল সুখ ভোগ করে হলো মানুষের মতো
মৃত্যু ওর, কবি ছিলো, লোকটা কাঙালও ছিলো খুব।
মারা গেছে মহোৎসব করেছিলো প্রকাশকগণ,
কেননা, লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে, বিরক্ত করবে না
সন্ধ্যেবেলা সেজে-গুজে এসে বলবে না, টাকা দাও
নতুবা ভাঙ-চুর হবে, ধ্বংস হবে মহাফেজখানা,
চট্ জলদি টাকা দাও, নয়তো আগুন দেবো ঘরে
অথচ আগুনে পুড়ে গেল লোকটা—কবি ও কাঙাল।'

(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

'অর্ধেক খেয়েছে তাকে নারী প্রেম, প্রকৃতি ও শিল্পের সুন্দর
অর্ধেক খেয়েছে তাকে ক্ষুধা অনাহার আর যুদ্ধ মন্বন্তর।
ষোলআনা হারিয়ে সে তবু কি মায়াবী প্রলোভনে
একদিন এখানেই অমরতা চেয়েছিলো সংসার জীবনে।'

(নাসির আহমেদ)

এপিটাফের গুরুত্ব ও ব্যবহার পাশ্চাত্যেই বেশি। আমাদের দেশে এপিটাফ খুব বেশি নজরে পড়ে না প্রধানতঃ ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং আর্থিক অসঙ্গতির কারণে। তবে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কবরে এর প্রচলন লক্ষ্যণীয়।

আজিমপুরে যে ক'টি হাতেগোনা কবরে এপিটাফ রয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই বৈচিত্র্যহীন—কেবল মৃত কিংবা মৃতার নাম-ধাম-ঠিকানা ও জন্ম-মৃত্যু তারিখ এবং বড়জোর কোরআন শরীফের আয়াত মূল আরবী বা বাংলায় লিপিবদ্ধ। বাংলা তরজমাও আছে, যেমন ; জনৈকা ঈদন নেসার কবরে তার সন্তানেরা উৎকীর্ণ করেছেন : 'বলো তুমি, বলিতেছি শপথ খোদার, উঠিতে হইবে পুনঃ জানিও নিশ্চয়।

(আল কোরআন)'

এই আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে ঢুকতেই ডানদিকের একটি কবরের পাষাণ-গাত্রে কালো অক্ষরের একটি সুন্দর এপিটাফ ক্ষণিকের জন্য হলেও মৃত্যু-অন্ধকারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মনকে বিষণ্ণ করে। এপিটাফটি হচ্ছে : 'Let no one forget, Let nothing be forgotten, Pause Stranger, When you Pass me by, As you are now so once I, As I am now, So you will be, So prepare for death and follow me' কবরটি জনাব ইয়াকুব আলীর, জন্ম ১৮৮১-মৃত্যু ১৯৪৯। এ এপিটাফ তাঁর নিজেরই লেখা এবং পুত্র কর্তৃক স্থাপিত।

ডানদিকের শেষপ্রান্তে রয়েছে এদেশের পল্লীগীতি সম্রাট আব্বাসউদ্দীনের সমাধি। আর তাতে লেখা আছে তার গাওয়া সেই বহুল আদৃত ভাওয়াইয়া গানটির প্রথম ক'টি কলি :

'কি ও বন্ধু কাজল ভোমরারে।
কোনদিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যাও কয়া যাও রে...'

কিছুটা ভেতরে পাশাপাশি অবস্থিত দুটো কবরে 'ভাষা আন্দোলনে শহীদ' এই শিরোনামে সাদামাঠাভাবে শুধু উৎ-

ঈদন নেসার কবর

কীর্ণ আছে শহীদ শফিউর রহমান ও আবুল বরকত-এর নাম ও জন্ম-মৃত্যু তারিখ।

এই কবরস্থানেই আরেকটি এপিটাফ : 'বাবা-মানিক হোছনাইন রেজা, নিয়তির অদৃশ্য হাতের ছোঁয়াচে তুমি পরপারে, করুণাময় তোমায় শান্তি দিন, দীনহীন পিতামাতার এই দোয়াই সর্বস্ব।'

নতুন গোরস্থানে একটি কবরের সামনে থমকে দাঁড়াতেই হয়, কেননা তাতে লেখা :

'কে যাও, দাঁড়াও ভাই
তুলে দুটি হাত।
আল-হামদো পাঠ করে
করো মোনাজাত।'

ঢাকার আর্মেনিয়ান চার্চ প্রাঙ্গণে খৃষ্টানদের সমাধিস্থলটি বেশ পুরনো। ১৭৯১ সালে স্থাপিত এ সেমেট্রিতে অনেকগুলো এপিটাফের সন্ধান মেলে।

আব্বাস উদ্দীনের সমাধিলিপি

তন্মধ্যে ম্যাক এস ম্যাকারটিক নামের চব্বিশ বছর বয়স্ক এক যুবকের সমাধিলিপিটি বিশিষ্ট। দু'ভাগে বিভক্ত সে এপিটাফে তার ফিঁয়াসে এবং তার নিজের আবেগময় বক্তব্য রয়েছে—প্রেমিকা লিখেছে :

'As I loved him so I miss him
In my memory he is near
Loved, remembered, lodged for always
Bringing many a silent tear.'

আর তার নিচেই ছেলেটি সান্ত্বনা দিয়েছে :
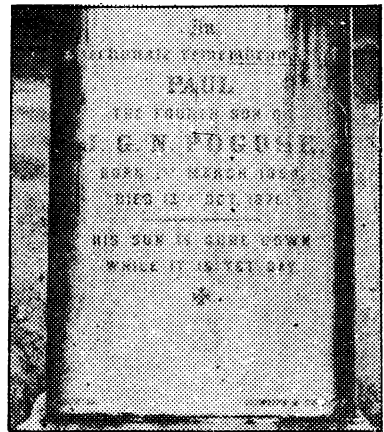
জে. জি. এন. পোগোস-এর সমাধিলিপি

'Weep not for me my sweet heart dear,
I am not dead, but sleeping here,
I was not yours but christs alone
He Loved me best and took me home.'

এখানেই ডেভিড আলেকজাণ্ডার (১৮-৫৮-১৯৩৯)-এর কবরে সুন্দর পাথরের স্মৃতিলিপিটির ভাবার্থ এরকম : 'আমি তোমাকে নৈঃশব্দের মধ্যে স্মরণ করি। আমার চলমান হৃৎপিণ্ডের মাঝে তোমার স্মৃতি বেঁচে আছে।' এছাড়া আরেক মজার এপিটাফ হলো :
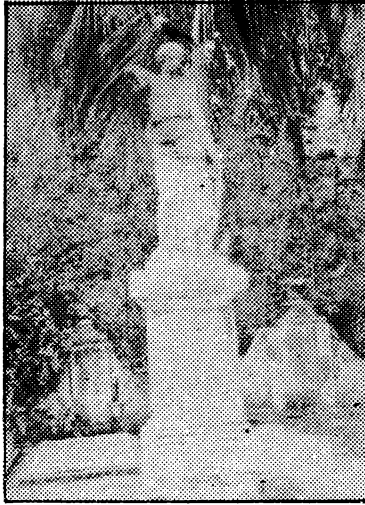
এরই পাদদেশে লেখা 'স্বামীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তার প্রতি…'

'A fond wifes tribute
To her deeply mourned
and best of husbands'

অর্থাৎ, 'স্বামীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তার প্রতি এক শোকবিহ্বল প্রিয়তমা পত্নীর শ্রদ্ধার্ঘ্য।' এটি ক্যাটচিক আভেটিক থমাসের সমাধির ওপর স্ত্রী কর্তৃক স্থাপিত এক সুন্দরী নারীমূর্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ রয়েছে।

নারিন্দার খৃষ্টান সমাধিস্থলে জে. জি. এন. পোগোস-এর অকাল প্রয়াত ছেলে পল-এর (১৮৫৪-১৮৭৬) এপিটাফটিও আকর্ষণীয় :

His Sun is gone down
While it is yet day.

(বেলা থাকতেই তার সূর্য অস্তাচলে গেছে)।

পাশেই জে. জি. এন. পোগোসের সমাধি, তাতে লেখা : Till the day break and shadows flee away, (বেলা ভাঙার আগেই ছায়া মুছে গেল)।

মা মেরীর মূর্তি সম্বলিত মারকার ডেভিডের স্ত্রী এলিজাবেথের সমাধির এপিটাফটিও বেশ সুন্দর : 'Haeven is my home,' অর্থাৎ 'স্বর্গই আমার ঠিকানা।' এবং প্রিয়তমা স্ত্রীর গড়া ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস কর্মচারী ব্যারিস্টার থমাস লোটেন জেনকিন্‌স্ (১৮৫৬-১৮৯)-এর সমাধিলিপি :

'If thou shouldst
Call me to resien
What most I Przie it
Ne'er was mine
I only yeild thee
What is thine
They will be done.'

একটু ভেতরদিকে একটি অদ্ভুত এপিটাফ চোখে পড়ে, স্যার লরেট ভারভিল-এর কবরের মাথার দিকে লেখা আছে : 'তোমার আত্মদানে পাকিস্তানের কল্যাণ হউক।' এর নিচেই একথার ইংরেজী অনুবাদ রয়েছে। অ্যানট জিয়া ঘোষ (জন্ম ১৪.৮.১৯০৮ মৃত্যু ১৬.৬.১৯৭৮)-এর কবরটি দামী নক্সা করা মার্বেল পাথরে

বাঁধানো। তাতে উৎকীর্ণ এ কথা কয়টি :

‘The greatest friend
We ever had
Everlastig peace to her
For there is no other
Can take the place of our dear
mother.’

ফুল হয়ে ফুটবার আগে কলি ঝরে গেলে প্রকৃতি হয় বিষণ্ণ। তেমনি শিশু-মৃত্যু স্বভাবতঃই আমাদের সবাইকে ব্যথিত করে। আর সেই সকরুণ আর্তি-রই বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রাণহীন শিলা-লিপিতে—নারিন্দায় ছোট্ট বালিকা ক্রিশ্চিনা ভিলহেল-মিনা শপের এপিটাফ-টি মনকে নাড়া দেয় : ‘মালী (ঈশ্বর) আমা-কে দিয়েছিল একটি কুঁড়িসম অনিন্দ্য-সুন্দর শিশু ; যেন তাকে আমরা আগলে রাখি, যেন সে মলিনা না হয়।’

কোলকাতার মল্লিক-বাজার সিমেট্রিতে আট বছরের এক শিশুর এপিটাফ সত্যি চমৎ-কার : ‘নিশুতি সমাধি, তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম এই মহামূল্য মুক্তোকণা। তার মা না আসা পর্যন্ত তাকে নিরাপদ রেখো। এই স্নিগ্ধ নক্ষত্র মুহূর্তের জন্য উদিত হয়েছিল আকাশ-তলে, তারপরই স্বর্গে অস্ত গেছে।’

অস্ট্রেলিয়ায় এক বাচ্চা ছেলের স্মৃতি-ফলকটিও এমনি হৃদয়স্পর্শী : ‘আমাদের ফুল, আমাদের ছোট্ট নেল-কে নিয়ে গেলেন ঈশ্বর। তাঁরও বোধহয় গন্ধ শোঁকার ইচ্ছা।’

এপিটাফ মাত্রই যে নিছক বিষণ্ণতা-মাখা শোকগাথা তা নয়—এপিটাফেও বৈচিত্র্য এনেছেন অনেকে, দর্শন-সাহিত্য কিংবা রস সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। কঠিন পাথরের নির্মম মৃত্যুবাণীও হালকা হয়েছে তাদের মজার মজার কথায় :

ইংল্যাণ্ডের হেয়ারফোর্ড সিমেট্রিতে রক্ষিত একটি এপিটাফে মৃতা স্ত্রী স্বামীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে, ‘প্রিয়, আমার জন্য মাতম কোরো না, আমি এখানে ঘুমিয়ে আছি মাত্র, একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো, আমরা আবার মিলিত হবো।’ স্বামী উত্তরে এর নিচেই লিখেছে, ‘প্রিয়া আমি তো শোক করছি না, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও, আমি আরেকটি স্ত্রী পেয়ে গেছি, তোমার কাছে আসতে পারছি না যে।’
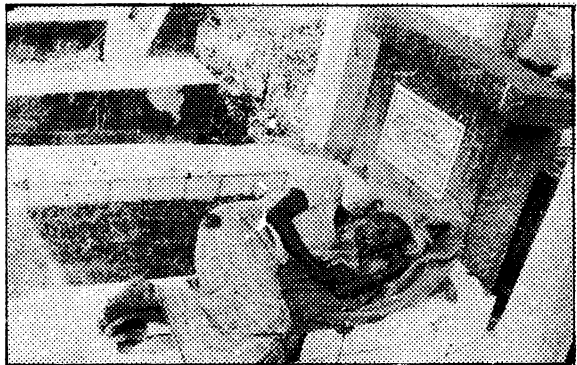
অপেক্ষা ?

একই সমাধিচত্বরে স্ত্রীর মৃত্যুতে সামান্য-তম কাতর না হয়ে আরেক স্বামীপ্রবর লিখেছে : ‘মরে গিয়ে সে নিজেও বেঁচেছে, আমিও বেঁচে গেছি !’ ম্যাসাচুসেটস-এ এক এপিটাফে আছে : ‘আমি এসে ছিলাম সকালে, তখন ছিলো বসন্ত, আমার মন ছিলো উজ্জ্বল—দুপুরে বেড়াতে বেরিয়ে-ছিলাম, তখন ছিলো গ্রীষ্ম আমার মন ছিলো প্রফুল্ল—বিকেলে বসে ছিলাম, তখন শরৎ এবং আমার মন বিষণ্ণ—রাতে শয্যা নিলাম, তখন শীত, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।’ সেখানেই এক মেল ড্রাই-

ভারের সমাধিলিপির সংক্ষিপ্তসার : 'আমার ইঞ্জিন এখন শান্ত-স্থির, বয়লারে কয়লা আর ওঠে না জ্বলে, জীবনের রেল-লাইন ফুরিয়ে গেছে—প্রতিটি স্টেশন পেরিয়ে এখন মরণ-সিগনালে এসে থেমে গেছি··· ।'

সবচেয়ে বিদ্রুপাত্মক ও শ্লেষমাখা এপি-টাফটি রয়েছে এবারডিন গীর্জা প্রাঙ্গণে শায়িতা এলিজাবেথ শার্লটের কবরে : 'এলিজাবেথ শার্লটের হাড় ক'খানা
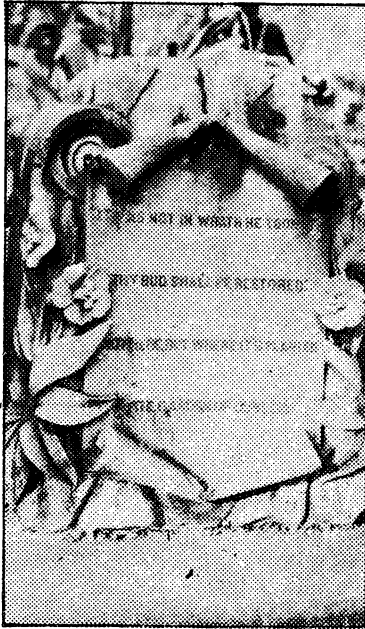
নারিন্দা সিমেট্রিতে শিশু ক্রিস্টিনার এপিটাফ

এখানে পড়ে আছে, কুমারী হয়ে জন্মেও যে মরেছে স্বৈরিণী হয়ে।' ইংল্যাণ্ডের জনৈক দুধ-বিক্রেতার অনুশোচনা এপি-টাফে :'সব সময় দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করেছি, সঠিক ওজন বা মাপের ধার ধারিনি কখনও, তাই নিশ্চিত ভাবেই শয়তানের কাছে আমার ঠাঁই মিলবে।' 'Poorly lived and poorly died, poorly burried and no one cried'—'এ হচ্ছে ব্যানডেন সিমেট্রিতে এক নিম্ন-বিত্তের সমাধিফলক। কিংসব্রিজ সমাধি-স্থলে গরীব এক ব্যক্তির এ এপিটাফটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সবারই এক ও অভিন্ন হবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় : 'আমি গরীব বলে গীর্জার দোরগোড়ায় কবর দেয়া হলো কিন্তু টাকার জোরে যতো ভালো কবরই তুমি কেনো না কেন সেখানে তোমার আমার অবস্থার মধ্যে কোনোই তফাৎ হবে না।'

১৭০০ সালে স্থাপিত এক অনন্য এপি-টাফ : 'আমার জন্যে কেঁদো না বরং মৃত্যুর আগে নিজের পাপের জন্য কাঁদো, কারণ মৃত্যুতে শোকের কিছু নেই কিন্তু পাপের জন্য অনুশোচনার প্রয়োজন রয়েছে।' আর সবচাইতে তাৎপর্যবহ ও যথার্থ এপিটাফটি আছে আমেরিকার নিউজার্সির এক সিমেট্রিতে, তার বাংলা রূপান্তর হলো : 'পাঠক, বাজে জীবনী এবং করুণ কবিতা পড়ে সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যাও—আমি কি ছিলাম তা তো এই মাটিই এখন বলে দিচ্ছে··· ।'

আসলেই তাই। পৃথিবীর বুকে অমর হয়ে থাকার চিরন্তন বাসনার প্রতীকী প্রকাশ এপিটাফ—যার অধিকাংশই শিলীভূত অতিরিক্ত প্রশস্তিগাথা এবং ক্ষণস্থায়ী। আমাদের ইসলাম ধর্মও তাই সঙ্গত ও যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই এপি-টাফের বিপক্ষে, এমনকি কবর চিহ্নিতকরণ-ও সমর্থন করে না। কারণ মানুষকে ঠাঁই করে নিতে হবে মানুষেরই হৃদয়ে। মর্মর-গাত্রে খোদিত নাম চিরদিন থাকে না, থাকবে না। মহাকালের বিনাশী ছোবলে একদিন না একদিন পাথরও ক্ষয়ে যায়। নাম যদি অমর এবং অম্লান করতেই হয়, তাহলে তা করতে হবে কীর্তি দিয়ে, কাজ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, মহিমা দিয়ে। মানুষের হৃদয়ে লিখতে হবে নাম, তবেই সে নাম রয়ে যাবে। □

(ছবি : হাসান মাহমুদ)

অপার্থিব সাক্ষাৎকার

গল্প

মূল : আলফ্রেড বেস্টার

রূপান্তর : জাহিদুস সাঈদ

ওটা যদি সত্যিই ২০২০ সালের অ্যালমানক হয় তার অর্থ ভবিষ্যৎ আমার হাতের মুঠোয়।

রেস্তোরাঁটা শহরের মাঝখানে হলেও ভিড় বেশ কম। চারপাশের ব্যস্ততা আর হৈ চৈ-এর মাঝখানে এই থমকে থাকা নীরবতা হঠাৎই চোখে পড়ে। পুরনো বলেই হয়তো লোকে এটাকে এড়িয়ে চলে। সেকেলে দালান, সাইনবোর্ড আর দরজা জানালা বলে দেয় হাল আমলের ফ্যাশান তেমন একটা পৌঁছায়নি কখনো। কিন্তু রেস্তোরাঁর মালিক জহীর মিয়ার এ নিয়ে তেমন একটা দুশ্চিন্তা নেই। এ রেস্তোরাঁয় আসলে বাঁধা খদ্দেরই বেশি। আর অপরিচিতদের এখানে খুব একটা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা হয় না।

কিন্তু সেদিন বিকালে যখন অচেনা একজন লোক জহীর মিয়ার কাছ থেকে
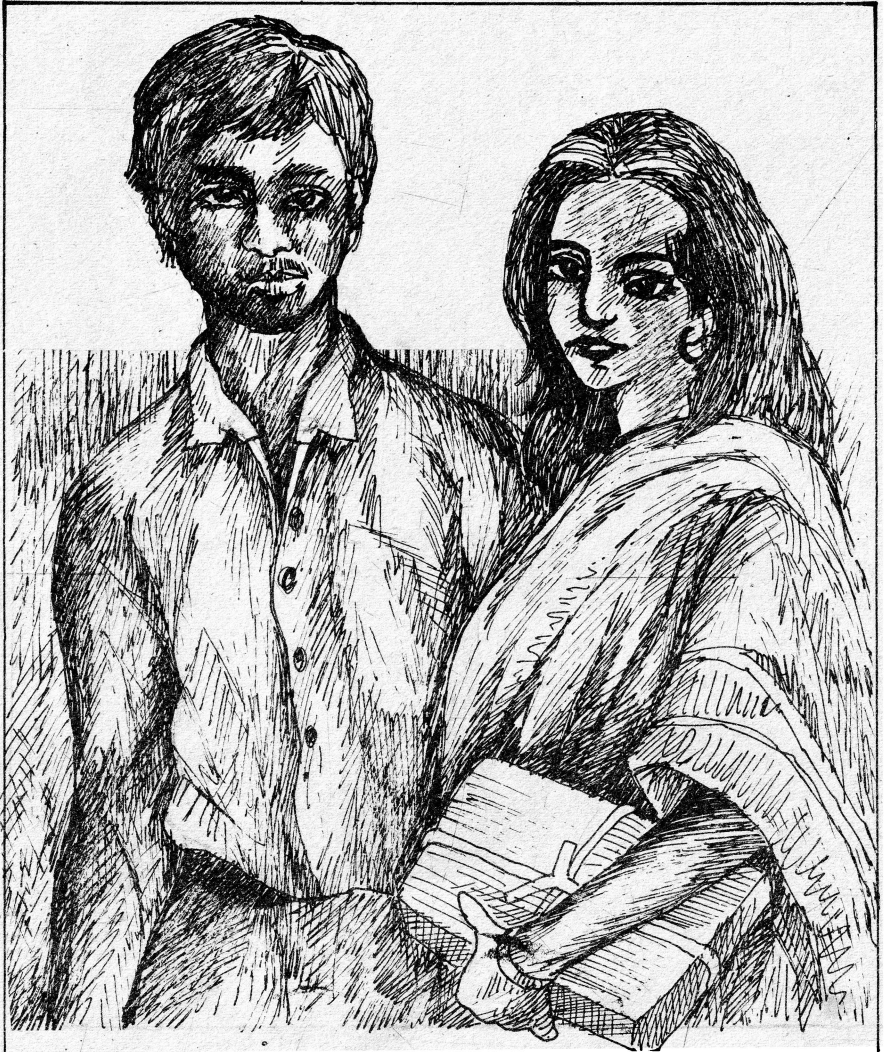
পেছনের কেবিনটা এক ঘণ্টার জন্যে ভাড়া চাইলো তখন সে না করতে পারলো না। লোকটাকে দেখে আর যাই হোক, সাধারণ লোক মনে হয়নি তার। পোশাক-আশাক, চলাফেরা কথাবার্তা সবই কেমন অন্য রকমের। জহীর মিয়া অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, এমনকি খাস লণ্ডনে মামুর হোটেলেও দিন কতক কাজ করেছেন। কাজেই হরেক রঙ চেহারার লোকজনের সাথে পরিচয় আছে। কিন্তু এ লোক কোনো ফর্মাতেই পড়ে না। সবচেয়ে মারাত্মক এর চোখ। সব জেটে

চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে বের হচ্ছে। তাকালে মনে হয় নিজের ভেতরটা কেউ বুঝি খোলা চিঠির মতোই পড়ে নিলো।

ফাল্গুন মাস। তবু বিকেলের দিকে ভালোই বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। শহরের রাস্তায় তাই লোক কম। 'ওই জামাইল্যা' গুলতানি বাদ দিয়া কামে ব, 'বলে জহীর মিয়া কাউন্টারে বসে দাঁত খুটছিল। এমন সময় লোকটা এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

'আপনার রেস্তোরাঁর পেছনের কেবিনটা এক ঘন্টার জন্যে ভাড়া চাই,' সরাসরি বললো সে।

জহীর মিয়া ইতস্তত করছিল। একে অচেনা লোক, তারওপর রোজ বিকেলেই এক জোড়া ছেলে মেয়ে ওটা ভাড়া নেয়। চেনা খদ্দেরকে তিনি ফেরাতে চান না। কিন্তু লোকটা তাকে ভাববার সময় দিলো না। পকেট থেকে ৫০০ টাকার একখানা নোট বার করে কাউন্টারে রাখলো। 'কেবিন তো ফাঁকা, তবে ভাড়া দিতে আপত্তি কোথায়। এই রাখুন এক ঘন্টার ভাড়া।'

জহীর মিয়া একটু দেরি করলেও শেষ পর্যন্ত নোটটা রাখলো। তারপর চোখ কুঁচকে বললো, 'সাবের নামডা।'

'আমাকে মিঃ বয়েন বলে ডাকতে পারেন,' বলে আগন্তুক দ্রুত ভেতরে চলে গেল।

'কেমন ধারা লোক কেডা জানে। কি সব উল্টাপাল্টা কথা কয়। নাম জিগাইলাম কয় বৈয়ম। বৈয়ম আবার মানুষের নাম অয় নাহি। অতগুলান ট্যাকা দিলো বইলাই রাজি হইলাম। মাগার ফ্যাসাদে পড়ন না লাগে,' মেহেদী রাঙানো দাড়িতে আরও দু'বার আঙুল চালিয়ে স্বগতোক্তি করলো জহীর মিয়া।

মিঃ বয়েন কেবিনে ঢুকেই আবার বের হলো। কাউন্টারে জানালো, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আসছে। বৃষ্টি ভেজা ফুটপাত পেরিয়ে পাশের অফিস বিল্ডিংটাতে পা রাখলো সে। কয়েন বক্সটা ফাঁকা। আশেপাশে কেউ নেই। তবুও চারদিকে বার কয়েক তাকিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বের করে সেটাকে তারের সঙ্গে জড়ালো। তারপর নির্দিষ্ট একটা নম্বরে ডায়াল করলো।

"কো অর্ডিনেট ওয়েস্ট সেভেনটি থ্রি—ফিফটি এইট—ফিফটিন, 'দ্রুত বলে গেল সে। 'ডিসব্যাণ্ড সিগমা, নর্থ ফর্টি ফাইভ—টুয়েন্টি··· ইষ্ট ফর্টিন··· সাউথ নাইন ···স্টেট, স্টেট ট্রান্সমিশন ক্লীয়ার।···আমি ফরিদ কবীরের ওপর নজর রাখতে চাই। তোমরা কো অর্ডিনেট করবে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন এইট ওহ সেভেন··· ঠিক আছে রাখি।'

যতক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছিলো নিউমার্কেট ছিলো ফাঁকা। কিন্তু বৃষ্টি ধরে আসতেই লোক-জনে ভরে উঠলো এলাকাটা। ভেজা চাতালের ওপর সপসপিয়ে চলছিল সবাই এদিক ওদিক। ধারণাটা মৌকে বলে ফেললো ফরিদ। ভেজা ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি মোটা হয়ে পড়ছিল এক পাশের নুড়ির স্তূপের ওপর। মৌ-এর হাসির শব্দ মিশে গেল তার সাথে। 'তুমি যা সব আজগুবী চিন্তা করো না, ফরিদ। মনেই হয় না তুমি ফরিদ কবীর সেক্রেটারিয়েটের একজন রাইজিং স্টার।'

'তাই বুঝি,' ফরিদ চিমটি কাটলো মৌ-এর কানের লতিতে।

'ধ্যেৎ, কি যে করো। লাগে না বুঝি। চলো ওদিকে যাই। বই কিনবে বলছিলে।'

একটু পর ওরা বেরিয়ে এলো। ফরিদের হাতে বইয়ের একখানা প্যাকেট। মৌ-এর হাতেও টুকিটাকি জিনিসপত্র। বৃষ্টির পর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিলো বাইরে। ফরিদ হঠাৎ বললো, 'চলো না কোথাও

বসি।'

'কোথায় বসবে?' মৌ শুধালো।

'জহীর মিয়ার রেস্তোরাঁতেই বসা যাক। পিছনের কেবিনে গল্প করে সময় কাটানো যাবে। তারা দুজনে একটা রিক্সা ভাড়া নিলো।

মিঃ বয়েন টেলিফোনে কথা সেরেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটা রিক্সা আসছিল রাস্তা ধরে। রিক্সায় দুজন ছেলেমেয়ে। ছেলেটার বয়স আটাশ থেকে ত্রিশ। মাঝারী উচ্চতা, ভারি গড়ন। মেয়েটা বেশ চমৎকার দেখতে, গালে একটা ছোট্ট তিল, হাসলে টোল পড়ে। রিক্সাটা রেস্তোরাঁর সামনে থামলো। ওরা দুজন নেমে রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়ালো।

মিঃ বয়েন রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখলো কবীর মিয়া বেশ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেছে। অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতেই সে ফরিদকে বোঝাচ্ছিল। 'দ্যাখলাম ঝড় বাদলা। তাই ভাবলাম আইজ কি আর বাইর অইবেন। তয় এটু পরে আয়েন। কেবিন তো ঐ সাবে ভি এক ঘণ্টার তরে ভাড়া নিছে।'

ওরা দুজন চলে যাচ্ছিলো, এমন সময় বয়েন ডাকলো ওদেরকে। 'দেখুন, আপনারা আজ কিছুক্ষণের জন্যে আমার অতিথি হতে পারেন।'

'না-না, তার দরকার নেই। আমরা অন্য সময় আসবো,' ফরিদ উত্তর দিলো।

'কিন্তু আমি আসলে আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। কাজেই চলে যাবেন না, প্লীজ।'

'সে কি!' বিস্ময়ের সুরে বললো মৌ। 'আমরা তো পনেরো বিশ মিনিট আগে ঠিক করলাম যে এখানে আসবো।'

'তাতে কি হয়েছে। এটা জেনে নেয়া কি কোনো ব্যাপার হলো। আপনাদের এখানে আসার লঙ্গিচিউড সেভেনটি থি ফিফটি এইট, ফিফটিন, ল্যাটিচিউড ফর্টি-ফর্টি ফাইভ টুয়েন্টি টু...'

'দেখুন,' রাগান্বিত ভাবে শুরু করলো ফরিদ,' আপনার উদ্দেশ্য...'

'দয়া করে শান্ত হোন। আমার কথা ঠাণ্ডা মাথায় একটু শুনতে হবে। চলুন, আগে বসা যাক।'

তারা বসলো।

বয়েন এবার শুরু করলো, 'আপনারা আমাদের একটা মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছেন। এর সমাধানের জন্যেই আপনাদের কাছে আসা।'

'আপনি পাগল নাকি। চিনি না জানি না, কোনো দিন দেখিওনি এর আগে, আপনাকে আবার কি সমস্যার মধ্যে ফেলবো আমরা।'

মৌ ওঠার চেষ্টা করলো। 'ফরিদ, আমার মনে হয় এখান থেকে যাওয়াটাই ভালো।'

বয়েন শশব্যস্তে বললো, 'বসুন বসুন, যাবেন কেন। আজ বিকেলে তো আপনারা নিউমার্কেট থেকে বই কিনেছেন। গোটা চারেক হবে। তার মধ্যে একটা অ্যালমানাকও ছিলো।'

ফরিদ ও মৌ একটু অবাক হয়েই মাথা ঝাঁকালো। 'হ্যাঁ, ছিলো। কিন্তু তাতে কি হলো।'

'অসুবিধাটা তো ওখানেই। আপনারা অ্যালমানাক কিনতে চেয়েছিলেন ১৯৮৮ সালের।'

'কিনতে চাইবো কেন, ১৯৮৮-র অ্যালমানাকই তো কিনেছি।'

'না, আপনারা তা কেনেননি,' বয়েনের গলার স্বর একটু চড়লো। তারপর একটু ভারি কিন্তু নিচু গলায় সে বললো, 'আপনারা কিনেছেন ২০20 সালের অ্যালমানাক।'

'কি বললেন!' ফরিদের চোখ সরু হয়ে যায়।

'২০20 সালের ওয়ার্ল্ড আলমান আপনার প্যাকেটে ওটাই আছে।

লে একটা ছোট্ট ভুল হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু এর জন্যে যাতে কোনো বিশৃংখলা না হয় সে জন্যে ভুলটা শুধরে নেয়া দরকার।'

কেবিন ফাটিয়ে হেসে উঠলো ফরিদ। 'আরে তাই নাকি, দেখি তো!' বলে হাত বাড়ালো টেবিলের ওপর রাখা প্যাকেটের দিকে।

বয়েনের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে সে ফরিদের কব্জী মুঠিতে ধরে ফেললো। 'আপনি ওটা খুলবেন না, মিঃ ফরিদ।'

ফরিদ থামলো, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে শান্ত গলায় বললো, 'তা আমাকে এখন কি করতে হবে?'

'আমি অ্যালমানাকটা চাই, এতে আপনার সম্মতি দরকার।' কয়েক মুহূর্তের নীরবতা এসে আশ্রয় নিলো কেবিনে।

ফরিদ কিছু ভাবলো, তারপর মুখ খুললো, 'ওটা যদি সত্যিই ২০২০ সালের অ্যালমানাক হয় তার অর্থ ভবিষ্যৎ আমার হাতের মুঠোয়।'

'কেমন করে বুঝলেন।'

'এতে বোঝার কিছু নেই। স্টক মার্কেট রিপোর্ট ··· রেস ··· রাজনীতি কুটোটা না ভেঙে বড়লোক হওয়া যাবে।'

'অবশ্যই,' বয়েন উত্তর দিলো। 'শুধু ধনী নয় প্রায় সর্বশক্তিমান। কিন্তু শুধুই রেস আর রাজনীতি। আপনার চিন্তা তো এখানেই থেমে থাকবে না।'

'বলুন,' ফরিদ চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো।

'আপনার সঞ্চিত তথ্য, তার বিশ্লেষণ এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ একটা বৈপ্লবিক বিশৃংখলার সৃষ্টি করবে। হাউজিং ইনভেস্টমেন্টের কথাই ধরুন—আপনি জানবেন কোন্ জমিটা আপনার কেনা দরকার। আদমশুমারীর তথ্য থেকে জানবেন জনসংখ্যা বিস্ফোরণ আগামীতে কতোটা সমস্যা সৃষ্টি করবে। জাহাজডুবি, সড়ক বা রেল দুর্ঘটনা, প্লেন হাইজ্যাকের রিপোর্ট আপনাকে রক্ষা করবে।'

'সত্যিই!' উত্তেজিত ভাবে বললো ফরিদ।

'আপনি জানবেন কোন্ কোম্পানীর শেয়ার আপনাকে কিনতে হবে। পোস্টাল রিসিট আপনাকে জানাবে কোনগুলো আগামী দিনের নগর। নোবেল বিজয়ীদের নাম থেকে জানবেন বিজ্ঞানের কোন্ শাখায় কতোটা অগ্রগতি হয়েছে। সামরিক বাজেট, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং শিল্প সংক্রান্ত তথ্য আপনাকে জানাবে আগামীতে দেশ ও বিশ্বের অর্থনীতি কোন্ পর্যায়ে রয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় থেকে মুদ্রাস্ফীতির খবর জানবেন, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট ব্যাঙ্ক, সাসপেনশন, জীবনবীমা এসবই আপনাকে সব ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে।'

'তাহলে তো এটাই আমার দরকার,' এতোক্ষণের চেপে রাখা শ্বাস ছেড়ে বললো ফরিদ।

'আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন?'

'কেন করবো না। টাকা আমার হাতে তো দুনিয়া আমার হাতে।'

'সেটা হয়তো ঠিক কিন্তু এমনভাবে চিন্তা করাটা কেমন ছেলেমানুষি হয়ে যায় না কি। আপনি আসলে কি চান। অর্থ সম্পদ। কিন্তু তার জন্যে পরিশ্রম দরকার। সহজ বিজয়ে কি আসলেই কোনো আনন্দ আছে।'

ফরিদ চুপ করে রইলো।

'আপনি যদি সহজেই টাকা চান, সম্পদ চান, তবে চুরি ডাকাতি করলেই পারেন, মানুষ ঠকিয়ে চলতে পারেন। বিনা পরিশ্রমেই সব পাবেন।'

'কিন্তু দেখুন, আমি ··' ফরিদ কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

'আপনার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আপনি অন্ধ হয়ে গেছেন।' বয়েন

হাসলো।

'আসলে আমি জানতে চাই জীবনে সফল হবো কিনা।'

'কিভাবে জানবেন। পাতা উল্টিয়ে দেখবেন কোথাও আপনার নাম আছে কিনা? কেন, নিজের উপর আপনার বিশ্বাস নেই? আপনার পেশাতে কি আপনি এর মধ্যেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেননি? মিস মৌসুমী, আমি কি ঠিক বলিনি?'

মৌ নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলো, তারপর বললো, 'হ্যাঁ, ওর যোগ্যতার কোনো অভাব নেই।'

'কিন্তু আমি জীবনের নিশ্চয়তা চাই। আমার পরিশ্রম বিফলে যাবে কিনা তা আমার জানা দরকার।' ফরিদ ঠেকানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

'জীবনটাই তো অনিশ্চয়তায় ভরা। এর মধ্যে নিশ্চয়তা কে খুঁজে পায়।'

ফরিদ চকিতে বয়েনের দৃঢ় ঠাণ্ডা মুখের দিকে তাকালো একবার, তারপর বললো, 'ধরুন, নিউক্লিয়ার বোমার ব্যাপারটা পৃথিবীটাই তো ধ্বংস হতে পারে এর মধ্যে।'

'পৃথিবী এর মধ্যে ধ্বংস হবে না। আমার উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করছে।'

'আমি কিভাবে আপনাকে বিশ্বাস করি।'

'তাহলে তো এতো তর্কের দরকার নেই। সেক্ষেত্রে অ্যালমানাকটার বিশেষ কোনো মূল্য আছে কি? বুঝতে পারছি, আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সাহস। জীবনের মুখোমুখি হয়ে কঠোর বাস্তবকে চ্যালেঞ্জ করতে আপনি ভয় পান। আপনি কি কাপুরুষ?'

'মোটেই না!' ফরিদ রেগে উঠলো।

'তবে আপনার অসুবিধা কি? যে দেশের ইতিহাস সংগ্রাম রক্তক্ষয় আর বাঁধনভাঙার লড়াইয়ে ভরা। সেদেশের মানুষ হিসাবে ততোটুকু সাহস কোথায় আপনার। আর একটা কথা। চুরি করে বা ফাঁকি দিয়ে কোনো খেলায় জিতে কি আপনি কোনো আনন্দ পান?'

'না,' ফরিদ মাথা নাড়লো।

'আমি বলছি এই বইটার পাতা ওল্টালে আপনারও ঠিক তেমনি লাগবে। বুঝবেন ভুল করেছেন। ভবিষ্যৎ জেনে ফেললে জীবনে কোনো প্রত্যাশা থাকে কি। পাতানো খেলা দেখে যেমন কোনো আনন্দ পাওয়া যায় না জীবনও আপনার কাছে তেমনি আনন্দবিহীন মনে হবে।'

ফরিদ মুখ খুললো এবার, 'কিন্তু বইটার যদি এতোই দরকার হয়ে থাকে তবে আপনি এটা কেড়ে নিচ্ছেন না কেন।'

'কোনো কিছুই আমরা চুরি কিংবা ছিনতাই করতে পারি না। তেমনি কিছু দিতেও পারি না। আমি উপহার হিসেবেই বইটা ফেরত চাই।'

'মিথ্যা কথা। আপনি জহীর মিয়াকে হোটেলের বিল দেননি?'

'হ্যাঁ, জহীর মিয়া তার পাওনা পেয়েছে। কিন্তু আমি আসলে তাকে কিছুই দেইনি। সে মনে করবে তাকে ঠকানো হয়েছে। আসলে তা ঠিক না। আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন। সবই নির্ভর করছে আপনার ওপর। আপনার সুবিবেচনা আমাদের মুক্তি দেবে। যে ভুলটা হয়ে গিয়েছে তা শোধরানো সম্ভব হবে।'

'কিন্তু আমার কাছে সব কিছুই কেমন গোলমেলে লাগছে,' ফরিদ অবিশ্বাসের সুর আনলো গলায়।

'ঠিক আছে, আপনারা দুজন আমার দিকে তাকান', ধীরে শান্ত গলায় বললো বয়েন।

তারা দুজনেই বয়েনের পাথরের মতো ঠাণ্ডা মুখে সবুজ চোখ জোড়ার দিকে তাকালো। হঠাৎ এক পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ এসে গোটা ঘরকে গিলে ফেললো। ফরিদ এবং মৌসুমী দুজনের শরীরই

কোনো অনির্দেশ্য অনুভূতিতে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

হঠাৎ ফরিদ কাঁপা গলায় বলে উঠলো, 'আশ্চর্য, এখন আমার মনে হয় মিঃ বয়েনই ঠিক বলেছেন।'

মৌসুমীও ভীত গলায় বললো 'তাই হোক, ফরিদ, অ্যালমানাকটা তুমি ফেরত দাও। ওতে যে শুধু প্রতিষ্ঠা আর সম্মানের কথাই থাকবে তা তো নয়। দুর্ঘটনা, মৃত্যু, ডিভোর্স, এসবও তো থাকতে পারে।'

'ঠিক আছে অ্যালমানাকটা আপনার কাছেই রাখুন,' ক্লান্ত ভাবে বললো ফরিদ।

বয়েন হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা তুলে নিলো এবং আড়ালে চলে গেল। একটু পরে যখন সে ফিরলো তখন তার হাতে দুটো প্যাকেট। একটা প্যাকেট সে টেবিলের ওপর রাখলো।

'আপনাদের দুজনকেই আমার ধন্যবাদ। কারণ একটা অনিশ্চিত অবস্থা থেকে আপনারা আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। এখন আমার উচিত অন্তত কিছু একটা আপনাদের উপহার দেয়া। কিন্তু আমি এমন কিছুই আপনাদের দিতে পারি না যা বর্তমান ঘটনাপ্রবাহকে বদলে দিতে পারে। তবুও একটা ছোট্ট উপহার আমি আপনাদের দেবো।' এটুকু বলেই সে ওদের দিকে একটা বো করলো, তারপর রেস্তোরাঁর দরজার দিকে ফিরলো।

ফরিদ উঠে দাঁড়ালো। 'আরে, উপহারটা দিলেন না।'

'ওটা জহীর মিয়ার কাছ থেকে পাবেন।'

ফরিদ ও মৌ বোকার মতো চুপচাপ বসে রইল।

'ভালোই পাগলের পাল্লায় পড়লাম।' মৌ-এর দিকে তাকিয়ে ফরিদ একটু ফ্যাকাসে হাসলো।

'কিন্তু তুমি তার কথা বিশ্বাস করেছিলে।'

'সেই জন্যই তো বোকা বললাম। কিন্তু আমি ভাবছি সামান্য অ্যালমানাকটার জন্যে শুধু শুধু একগাদা উদ্ভট কথা বলে তার লাভটা কি। মরুকগে। চলো উঠি।'

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। অনেকটা উদভ্রান্তের মতো জহীর মিয়া ঘরে ঢুকলো।

'হালার পুত গেল কোনে। ফকিন্নীর পোলা আমার লগে মশকারী। কেমন মানুষ, অ্যাঁ। দেখলে বুঝা যায় না।'

'কি ব্যাপার, কাকে শুধু শুধু গালাগালি দিচ্ছেন?' ফরিদ জিজ্ঞেস করলো।

'আরে ঐ বৈয়মনা কি নাম। হালারে গাল দিমু না তো কোলে বওয়াইয়া আদর করুম। আপনের কি, আপনের তো কিছু অয় নাই।'

'আরে ধুর, বলবেন তো কি হয়েছে।'

'কি আর কইমু! জাল নোট, জাল। হায় হায় হায়, কপালডা আমার পুড়লো। পাঁচশো ট্যাহা।'

জহীর মিয়া ঘরময় দাপাদাপি করতে লাগলো।

ফরিদ তাকে কিছুটা ক্ষান্ত করলো। তারপর বললো, 'কৈ দেখি আপনার নোটটা।'

জহীর মিয়া নোটখানা টেবিলের ওপর রাখলো। ফরিদ ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। হঠাৎ তার মুখখানা উত্তেজনায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একটু চিন্তা করে সে মানিব্যাগ থেকে ৫০০ টাকার আর একটা নোট বের করলো।

'মিঃ বয়েন আপনাকে ঠকায়নি। একটু মজা করেছে। বিলটা আসলে আমার দেবার কথা। নিন, এখন যান।'

'ফরিদ, তুমি কি পাগল হলে। পাঁচশো টাকা কেউ এভাবে নষ্ট করে,' মৌ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

'আমি ঠিকই আছি। আর টাকাটার

কথা যদি ধরো, তা হলে বলবো এতে কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং ভুল যা হয়েছিল তা এতক্ষণে ঠিক হলো।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, নোটটার দিকে তাকাও ভালো করে।'

হালকা সবুজ রঙের নোটটার এক পিঠে তারা মসজিদ আর অন্য পিঠে হাইকোর্টের ছবি। মৌ ভ্রূ কুঁচকে তাকি... রইলো। তার মনে হচ্ছিল নোটটা এখনকার চালু নোটগুলোর মতো নয়। ভালো করে আবার তাকালো সে এবং ফরিদের মতোই চমকে উঠলো।

নোটটার একপাশে নম্বর ঘ ৯০২৫০ সাল ২০১০ মাঝে লেখা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে, স্বাক্ষর—গভর্ণর ফরিদ কবীর। □

দুঃস্বপ্নের শিকার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

চোখে পড়া বন্ধ হলো এর ফলে। রলিনের বাবা তার মুখ ও শরীর পরিষ্কার করলো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না সে।

রলিনের মাথার পিছনের পুরো অংশটা, এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত খুলে আলগা হয়ে গেছে, চামড়া, মনে হচ্ছে যেন উইগ পরে আছে। খোলা জায়গাটার ভেতর দিয়ে সাদা খুলির অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে। পিঠে এবং পায়ে অসংখ্য গভীর ক্ষত। নিতম্বের তিন ইঞ্চি গভীরে প্রবেশ করেছে ভালুকের দাঁত।

'ধৈর্য ধরো খোকা। অনেক দূর যেতে হবে আমাদের। আমি জানি তুমি পারবে,' ছেলেকে সান্ত্বনা দিলো বাবা।

এবড়ো খেবড়ো ছয় মাইল রাস্তা পার হয়ে যেতে হবে পিকআপ ট্রাকের কাছে। সেটাতে করে সোলডটনা। সেখান থেকে প্লেন চার্টার করে এংকোরেজের প্রভিডেন্স হাসপাতালে যেতে হবে।

কিন্তু কোনোটাই ঠিকমতো হলো না। পিকআপের টায়ার পাংচার হয়ে গেল। সেটা বদলে নিয়ে সোলডটনার দিকে ছুটলো ওরা। কপাল খারাপ, চার্টার করার জন্যে কোনো প্লেন সেখানে নেই। এংকোরেজ থেকে অর্ডার দিয়ে চার্টার প্লেন নিয়ে আসতে হলো।

রাত তিনটার দিকে হাসপাতালে পৌঁছুলো রলিন। ততক্ষণে আটঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে অপারেশন চললো। শরীরের অর্ধেক রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল ওর। প্রায় তিন কোয়ার্টের মতো। সবগুলো তখন বন্ধ করতে ২০০ সেলাই দিতে হলো শরীরের বিভিন্ন জায়গায়।

আটদিন পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো রলিন। তার সার্জন ডঃ জেমস স্কালী বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে এতো জখম শরীরে নিয়ে কি করে একটা মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

কিন্তু তবু বেঁচে আছে রলিন। ১৯৮৪ সালের সেই ভয়াবহ ঘটনা স্মরণ করে আজও শিহরিত হয় সে। কিন্তু তাই বলে শিকার করা বন্ধ হয়নি ওর। পরের বছরই আবার আলাস্কার ওই দুর্গম অঞ্চলে মুস শিকার করতে চলে গেছে সে ড্যারেলের সাথে। □

(বিদেশী পত্রিকা থেকে)
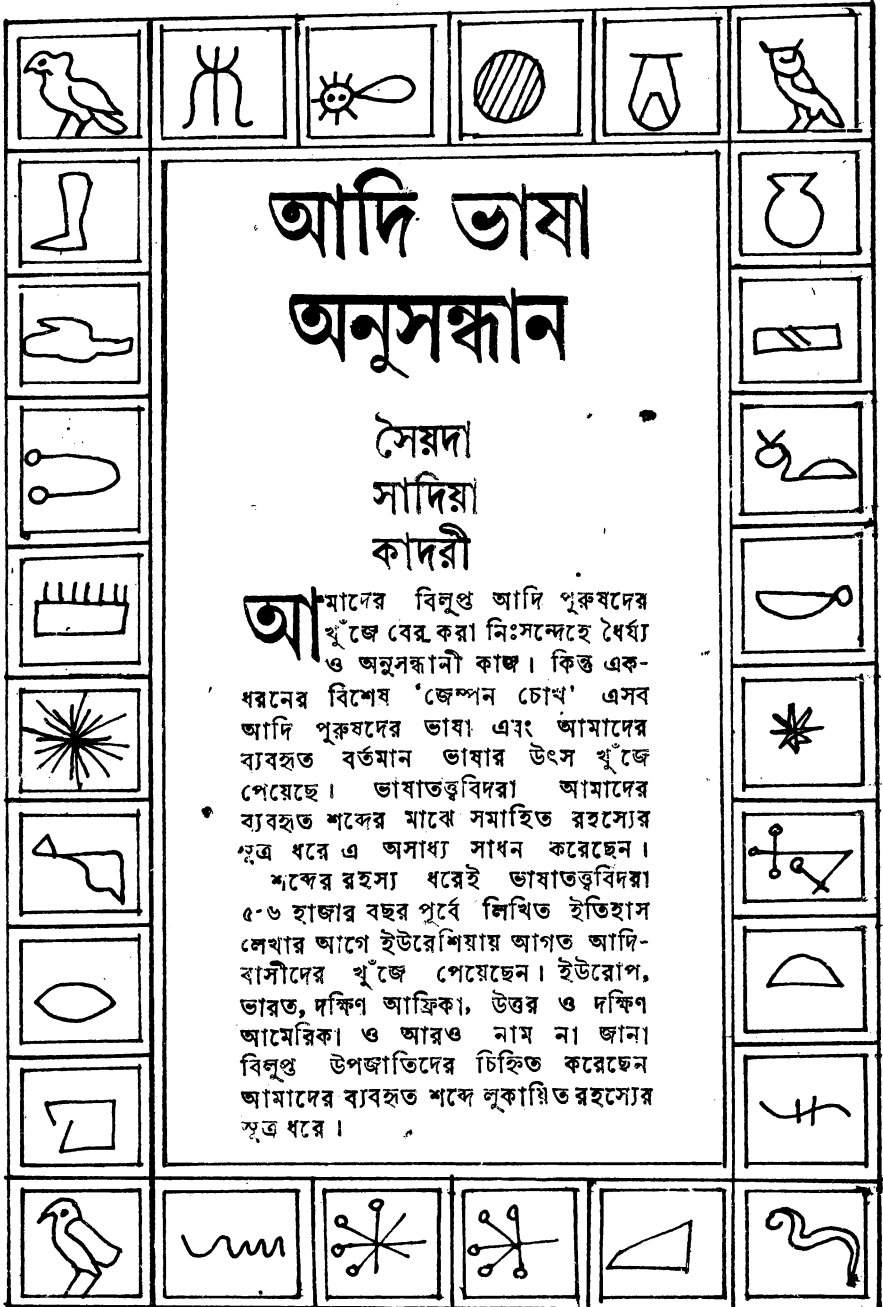
আদি ভাষা অনুসন্ধান

সৈয়দা
সাদিয়া
কাদরী

আমাদের বিলুপ্ত আদি পুরুষদের খুঁজে বের করা নিঃসন্দেহে ধৈর্য্য ও অনুসন্ধানী কাজ। কিন্তু এক-ধরনের বিশেষ 'জেম্পন চোখ' এসব আদি পুরুষদের ভাষা এবং আমাদের ব্যবহৃত বর্তমান ভাষার উৎস খুঁজে পেয়েছে। ভাষাতত্ত্ববিদরা আমাদের ব্যবহৃত শব্দের মাঝে সমাহিত রহস্যের সূত্র ধরে এ অসাধ্য সাধন করেছেন।

শব্দের রহস্য ধরেই ভাষাতত্ত্ববিদরা ৫-৬ হাজার বছর পূর্বে লিখিত ইতিহাস লেখার আগে ইউরেশিয়ায় আগত আদি-বাসীদের খুঁজে পেয়েছেন। ইউরোপ, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও আরও নাম না জানা বিলুপ্ত উপজাতিদের চিহ্নিত করেছেন আমাদের ব্যবহৃত শব্দে লুকায়িত রহস্যের সূত্র ধরে।

রহস্যটা হলো ঃ

বহু বছর ধরেই পণ্ডিতরা একটা বিষয় ভেবে বিভ্রান্ত হয়েছেন যে ভিন্ন ভাষার অনেক শব্দের মধ্যে আশ্চর্যজনক মিল দেখে। ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও অনেক শব্দের মধ্যে উচ্চারণগত ও অর্থগত সাদৃশ্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, হল্যাণ্ডে vadar, ল্যাটিনে pater, আইরিশে athir, পারস্যে pider, সংস্কৃতে pitr, এবং ইংরেজীতে father. এসব বিভিন্ন ভাষায় 'বাবা' বলতে এ-ধরনের বানান ও উচ্চারণ ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব, বিস্তৃত অঞ্চলের বিশাল অধিবাসীরা কিভাবে প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ ব্যবহার করছে? তাও আবার একই অর্থে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন বিভিন্ন ভাষার বেশ কিছু শব্দের মধ্যে এই মিলের কারণ হলো, হয়তো এই শব্দগুলি একটি বিশেষ সার্বজনীন ভাষা থেকে উদ্ভুত হয়েছে।

অবশেষে একজন বুদ্ধিদীপ্ত জার্মান জেকব গ্রীস ও তাঁর সহোদর ওয়েলহম 'গ্রীস রূপকথার প্রবর্তক' ভাষা পরিবর্তনের একটা নীতি উদ্ভাবন করেন। তাদের দু'জনকে সাহায্য করেন সমসাময়িক অন্যান্য ভাষা পণ্ডিতরা।
তাদের উদ্ভাবনে প্রমাণিত হলো যে ভাষায় এই পরিবর্তন নিয়মিত, দৃঢ় এবং মিলবিশিষ্ট। এই সুনির্দিষ্ট নিয়মে ভাষায় পরিবর্তন সবসময় সবস্থানেই হয়ে এসেছে এবং আধুনিক ভাষায় রূপান্তর ঘটেছে।

ধীরে ধীরে ভাষা পরিবর্তনের রহস্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হলো। জানা গেল FATHER এর আদি শব্দ PATER।

'WATER' এর আদি শব্দ Wodor। জার্মানে পানির ব্যবহৃত শব্দ হলো wasser, গ্রীকে hyder, রাশিয়াতে voda (তাদের জনপ্রিয় পানীয় vodcu voda র নামানুসারে রাখা হয়েছে), সংস্কৃতে udan।

এভাবে ভাষাবিদরা আধুনিক শব্দের অসংখ্য আদিশব্দ এক আদি শাখাকে চিহ্নিত করেছেন। আদি ভাষাকে তারা ইন্দোইউরোপীয়ান বলে চিহ্নিত করেছেন।

ল্যাটিন শাখা থেকে উদ্ভুত হয়েছে ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ফ্রেঞ্চ এবং রোমানিয়া। জার্মানিক শাখা থেকে উদ্ভুত হয়েছে ইংরেজী, জার্মান, ডেনিস, ডাচ, সুইডিশ এবং নরওজিয়ান।

কেলটিক শাখা থেকে উদ্ভুত হয়েছে ওয়েলস, আইরিশ, ব্রেটন। স্লাভিক শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষাভাষীরা হলো রুশ, পোলিশ, চেকশ্লীভাক, সার্বিয়ান এবং বুলগেরিয়ান।

তাছাড়া ইন্দো ইউরোপীয়ান শাখার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে লিথৌলিয়ান, পারাসিয়ান। গ্রীক, আমেরিকান এবং ভারতীয় কিছু প্রাদেশিক ভাষা যা সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত হয়েছে।

এসব আদিবাসীদের ব্যবহৃত ভাষা থেকেই উদ্ভুত হয়েছে আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক ভাষাসমূহ।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমাদের আদিপুরুষদের ব্যবহৃত ভাষা থেকেই তাদের জীবন প্রণালী সম্পর্কে জানা যায়।

আদি ভাষা	বর্তমান ভাষা
GWOU	Cow
MELG	Milk
UKSEN	Oxen
YUG	Yoke
OWA	Ewe
PLEVS	Fleece
WALNA	Wool
WEBH	Weave
STW	Sew

এসব শব্দ থেকে বোঝা যায় তারা গরু, ভেড়া, ষাঁড় ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর

ব্যবহার জানতো। দুধ পান করতো, পশুর চামড়া দিয়ে শরীর ঢাকতো।

আদি পুরুষেরা জমি চাষ করতো, শস্য বপন করতো এবং শস্য থেকে উৎপাদিত খাদ্য গ্রহণ করতো। শুধু তাই নয় তারা যে আগুনের ব্যবহার জানতো এবং রান্না করে খেতো তা নিম্নে বর্ণিত শব্দ গুলো থেকে বোঝা যাবে।

ARA-এর ইংরেজী রূপ plough, ল্যাটিনে arare। ইংরেজীতে চাষযোগ্য ভূমিকে বলে arable. আদি KWEIT থেকে ইংরেজী white এসেছে আর এই whit থেকে উদ্ভূত হয়েছে wheat বা জাম। জার্মানে প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ Hweits. আদি পুরুষেরা শুধু শস্যই ফলাতো না তারা রাঁধতেও জানতো।

আদি পুরুষেরা বন্য প্রাণীর নাম জানতো তাদের থেকে বিপদমুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে গাছে বসবাস করতো। বরফ পরার মৌসুমে নিরাপদে অবস্থান করতো। শুধু তাই নয় আমাদের আদি পুরুষেরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতো। প্রকৃতিকে ও সৃষ্টিকর্তাকে পবিত্র মনে করতো। এবং প্রার্থনা করতো তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে।

আমার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

খুরশীদ আলম

আমাদের সঙ্গীতের জগতে খুরশীদ আলম একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। এদেশের জনপ্রিয় গায়কদের মধ্যে তিনি একজন।

ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি রেডিওতে অডিশন দিলেও পরবর্তীকালে আধুনিক গানের শিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর কণ্ঠের হালকা ও দ্রুত লয়ের গানগুলোই তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে।

খুরশীদ আলমের জন্ম ১৯৪৬ সালে, বগুড়ায়। তিনি বর্তমানে বিসিআইসি'র মার্কেটিং ম্যানেজার। ব্যক্তিগত জীবনে খুরশীদ আলম বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। আধুনিক ও ফিল্মি গান সহ এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে আড়াই হাজারের মতো গান তার রেকর্ডিং হয়েছে।

আমার মতে প্রত্যেকের জীবনে কোনো না কোনো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। এখনো বুড়ো না হলেও বয়সটা খুব একটা কম নয়। ধরতে গেলে মাঝবয়সী। বিভিন্ন দিক থেকে এ পর্যন্ত আমার কম অভিজ্ঞতা হয়নি। এ-গুলোর মধ্যে কোনো কোনো ঘটনা আমার কাছে সত্যিকার অর্থে রোমাঞ্চকর।

আমি একজন গায়ক। গান-বাজনা নিয়ে জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ কাটিয়ে এসেছি। আর গান গাইতে গিয়ে এমন কিছু কিছু ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, যা স্মরণ করলে এখনো শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। যেমন বছর কয়েক আগের ঘটনা। এখনকার নীলফামারি জেলার সেই কিশোরগঞ্জ থেকে স্টেজে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ এসেছিল। আমি একা নই, ঢাকা থেকে আরো কয়েকজন শিল্পী গিয়েছিল সেখানে। তার মধ্যে কয়েকজন মেয়েও ছিলো। আমরা সৈয়দপুর পর্যন্ত বিমানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমাদের গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা। বিমান থেকে নেমে দেখি কোনো গাড়ি নেই। মেজাজ খিঁচড়ে গেল। কিন্তু অতোদুর গিয়ে তো আর ফেরা যায় না। নিজেরাই গাড়ি রিজার্ভ করে কিশোরগঞ্জে গেলাম। ওখানকার এক কলেজের অনুষ্ঠানে আমরা গান গাইবো। গিয়ে দেখি আমাদের জন্য খাওয়া-দাওরায় কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। খিদেয় মেজাজ আরো তিরিক্ষি হয়ে উঠলো। একজন অধ্যাপকের ওপর অনুষ্ঠানের ব্যয়-ভার দেখাশোনার দায়িত্ব ছিলো, তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলাম। সাফ জানিয়ে দিলাম—আমাদের সম্মানীর পুরো টাকা আগে-ভাগে বুঝিয়ে না দিলে স্টেজে উঠবো না। এ ঘটনার জের হিসেবেই সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠান শুরু হতে না হতেই অডিটোরিয়ামে গণ্ডগোল। কিছু উচ্ছৃঙ্খল দর্শকের লক্ষ্য ছিলাম আমরা। আমাদের স্টেজ আগলাবার দায়িত্বে ছিলো মাত্র চারজন পুলিশ। চারজনই অন্য জেলার লোক। কোনো উপায় না দেখে ওদেরকে আমি বললাম, 'আপনারা গুলি করবেন না। কেবল রাইফেলের বাঁট দিয়ে ধুমসে পেটাতে থাকেন।'

চারজন পুলিশই ছিলো যথেষ্ট সাহসী। ওরা আমার কথা শোনার পর আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না। ঝাঁপিয়ে পড়লো অবাধ্য দর্শকদের ওপর। রাইফেলের বাঁট দিয়ে সমানে পেটাতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল। উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা পেছনে হটে যেতে লাগলো। আমাদের রিজার্ভ করা গাড়িটা ছিলো। ঠিক করলাম, অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গণ ছেড়ে রেস্ট হাউসে চলে যাবো।

রেস্টহাউসে পৌঁছে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর একদল পুলিশ নিয়ে থানার ও. সি. এসে হাজির। তাঁকে দারুণ উদ্বিগ্ন মনে হলো। ও. সি. সাহেব আমাকে বললেন, 'আপনারা কাজটা ভালো করেননি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

ও.সি. সাহেব জানান যে কিশোরগঞ্জ জায়গা হিসেবে ভালো নয়। সেখানে তিনজন ই.উ.এন.ও. খুন হওয়ার নজীর আছে। ও. সি. সাহেব আরো বললেন, 'আপনাদের ওপর অনেকে খেপে গেছে। রাতে এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। ওরা যদি আক্রমণ করে তাহলে আমি ফৌজ দিয়েও ঠেকাতে পারবো না।'

ও.সি. সাহেবের কথা শুনে ভাবলাম রাতে কিশোরগঞ্জে থাকাটা ঠিক হবে না। সারাদিনে যে ধকল গেছে তাতে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবে রাতের অন্ধকারে সৈয়দপুরের রওনা হওয়ার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলাম না। গাড়িতে উঠতে গিয়ে জানা গেল, ট্যাংকে তেল নেই। যা তেল আছে

তাতে বড়জোর দু'এক মাইল যাওয়া যাবে। উপজেলা সদরে রাতের বেলায় পেট্রল মিলবে কই? ওখানে কোনো তেলের পাম্প নেই। রেস্ট হাউসের এক পিয়ন তেল যোগাড়ের দায়িত্ব নিয়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে এক টিন তেল নিয়ে এলো। কিন্তু তা ডিজেল। পিয়ন বুঝতে পারেনি, আমাদের গাড়িটা ডিজেলে নয় পেট্রলে চলে। মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম—পেট্রল যোগাড় করবো কি করে? এদিকে আমাদের কেউ কেউ খুবই আশঙ্কার মধ্যে ছিলো— জনতা কখন রেস্ট হাউস আক্রমণ করে। আমাদের মাঝে একজন পরামর্শ দিলো থানায় গেলে হয়তো পেট্রল পাওয়া যেতে পারে। কারণ ও.সি. সাহেব যে জীপে চড়ে রেস্ট হাউসে এসেছিল, সেটা পেট্রলে চলে।

এরপর আমরা আর দেরি করিনি। গাড়িতে চড়ে থানার দিকে রওনা হলাম। রাত তখন কম হয়নি। রাস্তাঘাট নির্জনই বলা চলে। তবু সতর্ক হয়ে এগুচ্ছিলাম বলে আমরা গাড়ির হেডলাইট জ্বালাইনি। একে তো হেডলাইট নেই, তারপর পেছনের মাঠ দিয়ে থানার চত্বরে ঢুকলাম, পুলিশের সন্দেহ হলো। পাহারারত সেন্ট্রি দূর থেকেই 'হল্ট' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। পুরনো মডেলের গাড়ির ইঞ্জিনের গটগট আওয়াজে তা আমরা শুনতে পাইনি। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর আমার চোখে পড়লো, থানার বারান্দায় আবছা অন্ধকারে পুলিশ আমাদের দিকে রাইফেল তাক করে গুলি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুহূর্তেই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। ব্রেক চাপার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাঠে শুয়ে পড়লাম।

পাহারারত পুলিশ এসে আমাদের ঘেরাও করলো। মাঠের অন্ধকার থেকে একটু আলোতে আসতেই একজন কনস্টেবল আমাকে চিনে ফেলো, 'আপনি খুরশীদ আলম না? গত বছর তো কুমিল্লা টাউনের উজালা হলে ফাংশন করেছিলেন।'

আমি বললাম, 'জি।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আমায় বললো, 'স্যার, আপনাদের ভাগ্য বহুত ভালো। আইজকা তো আপনাদের বাঁচার কথা আছিলো না।'

থানায় আমরা ও.সি. সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমাদের অসুবিধার কথা জানালাম। তিনি আমাদের সৈয়দপুর যাওয়ার মতো পেট্রল দিতে রাজি হলেন। সেই সঙ্গে এও পরামর্শ দিয়েছিলেন সোজা পথে নয়, বেশ ঘুরে যেতে হবে। কেননা ওরা রাস্তায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকতে পারে, বাগে পেলে ছাড়বে না।

কি আর করবো, ও.সি. সাহেবের কথা মতোই আমরা সোজা পথে না গিয়ে উল্টোদিকের রাস্তা ধরে গভীর রাতে কিশোরগঞ্জ থেকে বিদায় নিলাম। অনেকটা পথ ঘুরে যাওয়ার ফলে আমরা যখন সৈয়দপুরে এসে পৌঁছলাম তখন রাতের খুব একটা বাকি ছিলো না। পাখি ডাকা শুরু হয়েছে।

এতোক্ষণ সুদূর উত্তর বঙ্গের এক উপজেলা সদরের যে ঘটনার কথা শোনালাম, তা সচরাচর আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জীবনে ঘটে না। তাই কোনোরকম সন্দেহ না রেখে একে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হিসেবে ধরা চলে। আমার জীবনে এ জাতীয় আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো। যার কথা না বলে পারছি না। তবে ঐ অভিজ্ঞতার কথা শুরু করার আগে, আমার একান্ত ব্যক্তিগত দু'টি কথা বলতে চাই। আমার খুব শখ ছিলো সেনাবাহিনীতে চাকরি করার। কিন্তু ছোট বেলায় একবার মারামারি করতে গিয়ে বাঁ হাতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। সেনাবাহিনীর কমিশন র‍্যাঙ্কের জন্যে পরীক্ষা দেয়ার সময় দেখা গেল, ফিজিক্যালী

আনফিট আমি। কারণ ছোট বেলায় ঐ আঘাতের ফলে আমার বাঁ-হাতের বাহুর হাড় ভেঙে গেছে। সেনাবাহিনীতে যাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আমি মানসিক ভাবে নিজেকে তৈরি করেছিলাম। ফলে কঠোর ভাবে সময়ানুবর্তীতা মেনে চলা আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এখনো আমি কাউকে কথা দিলে ঠিক সময় মতো সেটা মেনে চলার চেষ্টা করি। আর এই কথা দিয়ে কথা রাখা নিয়েই ঘটেছিল আমার দ্বিতীয় রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

১৯৭২ সালের শেষের দিক। একটু একটু করে শীত পড়ছে। এক চলচ্চিত্র পরিচালক তাঁর ছবির গান গাওয়ার জন্য আমাকে মনোনীত করেন। একদিন তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন যে অমুক দিন ছবির মহরত হবে এবং ঐ অনুষ্ঠানে আমার গান রেকর্ডিং করা হবে। তখন আমি তাঁকে বললাম, অন্য দিনে হলে হয় না? ইবনে মিজান জানালেন, সেটা সম্ভব নয়, মহরত অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে।

তখন ইবনে মিজানকে বললাম, 'ঐদিন আমি আমার দাদীকে নিয়ে বগুড়ায় যাবো। ঠিক আছে, দাদীকে রেখে এসে মহরতের আগেই ঢাকায় চলে আসবো।'

আমার কথা শুনে মিজান সাহেব অবাক হয়ে বলেন, 'বলেন কি, আপনি বগুড়ায় যাবেন আবার আসবেন? ঠিক সময় মতো আসতে পারবেন তো। আমার কিন্তু মহরত।'

আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, আসবোই।

বগুড়ায় যাওয়ার জন্য রেডক্রস থেকে একটা অ্যাম্বুলেন্স যোগাড় করেছিলাম। বগুড়া থেকে ঢাকার দূরত্ব ১৬০ মাইল। পথে আরিচা নগরবাড়ি ছাড়াও আরো তিন চারটা ফেরী। আমরা রওনা দিয়েছিলাম ভোর পাঁচটায়।

আমার দাদীর বয়স প্রায় ৭০ বছর। তিনি ছিলেন অসুস্থ। স্ট্রোকের ফলে তাঁর শরীরের ডানপাশ প্যারালাইসড হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শেই তাঁকে বগুড়ার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। ছোটবেলা থেকেই আমি দাদীর কাছে মানুষ, তারপর স্ট্রোকের পর তাঁর জিভ ভারি হয়ে যায়। তাই আমি ছাড়া আর কেউ তাঁর কথা বুঝতো না। কাজেই তাঁর সঙ্গে না গিয়ে আমার কোনো উপায় ছিলো না।

ডাক্তার আমাকে বলে দিয়েছিল একটু সাবধানে যেতে। পথে যদি দাদীর বমি বমি ভাব হয়, তা হলে যেনো গাড়ি থামিয়ে রাখি। অ্যাম্বুলেন্সটা ছিল মার্সিডিজ বেঞ্জ। রাস্তা যতোই খারাপ থাক ভেতরে বসে ঝাঁকুনিটা তেমন টের পাওয়া যায় না। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের দিকে দাদীর পাশে আমি বসেছিলাম। আমার কেবল একটাই চিন্তা—ইবনে মিজানের কাছে কথা দিয়েছি, সময় মতো ফিরে আসতে পারবো?

শীতের সকাল হলেও রাস্তায় তেমন কুয়াশা ছিলো না। বেশ দ্রুতগতিতে অ্যাম্বুলেন্স এগিয়ে যাচ্ছিলো। এমনিতেই ভীড় ছিলো না। তারপর অ্যাম্বুলেন্স। নয়ারহাট ও তরাঘাটের ফেরী দুটো পেরুতে আমাদের সময় বেশি লাগলো না। আরিচায় গিয়ে আমরা সাতটার ফেরী ধরতে সক্ষম হলাম। পদ্মা-যমুনার স্রোত ঠেলে ফেরী নগরবাড়ি ঘাটে পৌঁছতে তিন ঘন্টার মতো সময় লেগে গেল।

নগরবাড়ি ছেড়ে বাঘাবাড়ির দিকে কিছুদূর এগুনোর পর লক্ষ্য করলাম, দাদীর বমি বমি ভাব হচ্ছে। ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স থামাতে বললাম। অ্যাম্বুলেন্স থামানোর পর, ট্রলিতে করে দাদীকে বাইরের খোলামেলা বাতাসে শ্বাস নেয়ার জন্য বের করলাম। তিনি আর বমি করলেন না। মিনিট বিশেক সেখানে থাকার পর আমরা আবার এগুতে

থাকলাম। ঐ ঘটনার পর দাদীকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তাটা একটু বেড়ে গেল। দাদী বমি করবে না-কি। বমি করাটা মোটেই ভালো হবে না। অবস্থার দ্রুত অবনতি হবে।

বাঘাবাড়ি ফেরীঘাটে কিছুটা ভীড় থাকলেও অ্যাম্বুলেন্স বলে আমাদেরকে আগে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হলো। ফেরী পার হওয়ার পর আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো যে আমি ঠিক মতোই ঢাকায় পৌঁছতে পারবো। উল্লাপাড়ার দিকে রাস্তায় বেঞ্চ পেতে কিছু ছেলে আমাদেরকে আটকালো। ওরা চাঁদা চাইলো। আমি বললাম, 'বগুড়ায় রোগী নিয়ে যাচ্ছি। আজই আবার ফিরবো। ফেরার পথে চাঁদা দেবো।'

ওরা আমাদের কথা শুনে যাওয়ার রাস্তা দিলো।

বেলা ১২ টার দিকে বগুড়া শহরে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদের গ্রাম হারুঞ্জা শহর থেকে তের মাইল দূরে। কাজেই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হতে বেশিক্ষণ লাগলো না।

আমাদের আগেই আমার মা গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর হাতে দাদীকে বুঝিয়ে দিয়ে আবার অ্যাম্বুলেন্সে গিয়ে বসলাম। মা আমাকে বাড়িতে ভাত খেয়ে রওনা হওয়ার অনুরোধ করেন। আমি তাঁকে বললাম, 'ভাত ফেরীতেই খেয়ে নেবো।'

ফেরার পথে অসুস্থ দাদী ছিলো, না তাই আমরা যদ্দুর সম্ভব গতি বাড়িয়েছি। দূর থেকেই লক্ষ্য করলাম, উল্লাপাড়ার চাঁদা পার্টি তখনো রয়েছে। ওদেরকে কথা দিলেও চাঁদা দেয়ার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিলো না। রাস্তা-ঘাটে চাঁদা দেয়া তো দূরের কথা—ভিক্ষা দেবার পক্ষপাতিও আমি নই। ফেরার পথে আমি ছিলাম ড্রাইভারের পাশের সিটে। তাকে বললাম, গাড়ি না থামিয়ে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় কি-না। ড্রাইভার ঢাকাইয়া ভাষায় জানালো এটা তার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। ব্যস, অ্যাম্বুলেন্সের গতি না কমিয়ে সে কেবল লম্বা হর্ণ বাজালো। রাস্তার পাশে একটু ফাঁকা জায়গা ছিলো, ড্রাইভার সেখান দিয়ে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এলো। আসার সময়, অ্যাম্বুলেন্সের বডির সঙ্গে রাস্তায় আড়াআড়িভাবে পেতে রাখা বেঞ্চটা ছিটকে পড়েছিলো কয়েকজনকে নিয়ে। আমরা যে এভাবে ওদের ধোকা দেবো এটা বোধহয় ওরা আঁচ করতে পারেনি। ওদের পক্ষে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা চলে এসেছিলাম নিরাপদ দূরত্বে।

পথের প্রতিটি ফেরী আমরা ঠিক মতো ধরতে পেরেছিলাম। ঢাকায় পৌঁছে পৌনে ছয়টা বেজে যায়। ছবির মহরত ছিলো কাকরাইলের ইপসা স্টুডিওতে, সন্ধ্যা সাতটায়।

সরাসরি ইপসা স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম। রাস্তার ধকল আর ধুলোবালিতে আমার চুল, চেহারা আর পোশাক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তা দেখে ইবনে মিজান বলেন, 'আগে বাসায় গিয়ে গোসল-টোসল করে আসুন।'

আমি আমার কথা রাখতে পারার তৃপ্তি নিয়ে বাসায় এসে গোসল করলাম। তারপর স্টুডিওতে গেলাম। গান রেকর্ডিং-এর সময় কোনো অসুবিধা হলো না। কারণ সময় মতো ফিরতে পারার আনন্দ এতোটাই আপ্লুত করে রেখেছিল যে দীর্ঘ ভ্রমণের কোনো রকম ক্লান্তি আমাকে অসুবিধা স্পর্শ করতে পারেনি। তাছাড়া আগে থেকেই গানটা আমার লেখা ছিলো।

সেদিন ইবনে মিজানের যে ছবির মহরত ছিলো। তার নাম হলো 'এক মুঠো ভাত'। আর আমি যে গানটা গেয়েছিলাম তার প্রথম কলি হলো, 'নাচ আমার ময়না তুই পয়সা পাবি রে… ।'

অনুলিখন : সারোয়ার কবীর

বিচিত্র তথ্য

প্রসঙ্গ : প্রেম

এক
মেরী ওয়েন্‌স নামক এক মহিলাকে আব্রাহাম লিংকন প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'এসো আমরা বিয়ে করি।' মেরীর ত্বরিৎ জবাব ছিলো, 'একটি মেয়েকে সুখী করার জন্য পুরুষের যে সব গুণাবলীর দরকার, তোমার মধ্যে তার ঘাটতি রয়েছে।'

দুই
অ্যানি বেসান্টের সাথে গভীর প্রেম ছিলো নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ-এর কিন্তু তাঁর স্বামী তখনো জীবিত। অনেক ভেবে অ্যানি সিদ্ধান্ত নিলেন, আর স্বামীর সাথে থাকা যাবে না। এবার থেকে বার্নার্ডের সাথে এক ছাদের নিচে বসবাস করবেন।

কিন্তু কথাটা বার্নার্ডকে জানাতেই তিনি ঝটপট লিখে পাঠালেন, 'ঈশ্বর এরচেয়ে আমি তোমাকে আইনত দশবার বিয়ে করতে রাজি। কিন্তু স্বামী জীবিত থাকতে ··· ?— এ যে পৃথিবীর সমস্ত চার্চের সম্মিলিত প্রার্থনার চেয়েও জঘন্য।'

তিন
ভ্যান গগ ভালবাসতেন এক পতিতাকে। এক

ভিনসেন্ট ভ্যান গগ

ক্রিসমাসে তিনি মেয়েটিকে তাঁর একটি কান কেটে উপহার পাঠিয়েছিলেন। কারণ, কথাপ্রসঙ্গে সে একদিন বলেছিল, 'তোমার সমস্ত শরীরের মধ্যে ছোট্ট কান দুটোই সবচেয়ে সুন্দর।'

চার
জোনাথন সুইফটের জীবনে যে দুজন মুখ্য নারী এসেছিলেন তাঁদের দুজনেরই নাম ছিলো 'এসথার।' একজন, এসথার জনসন। অন্যজন ভ্যানেসা এসথার। এদের দুজনকে নিয়েই জোনাথন তাঁর বিখ্যাত 'জার্নাল টু স্টেলা' এবং 'ক্যাডিনাম অ্যাণ্ড ভ্যানেসা' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। অথচ দুজনের কাউকেই তিনি প্রেমিকা হিসেবে স্বীকার করতেন না। যদিও ভ্যানেসা এসথারের সঙ্গে কিছুদিন একত্রে কাটিয়েছেনও, কিন্তু সম্পর্কের কথা উঠলেই বলতেন, 'ওটা নিছক বন্ধুত্বের ব্যাপার।'

পাঁচ
ষোল বছর বয়সে প্রথম প্রেমে পড়েছিলেন সিগমুণ্ড
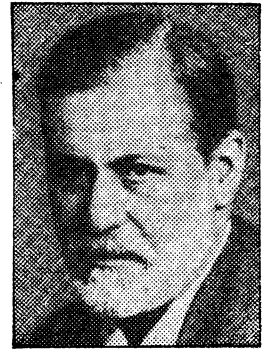
ফ্রয়েড

ফ্রয়েড। গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন প্রতিবেশিনী গিসেলা ফ্লুইসকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো গিসেলা

তাঁকে ভালবাসেননি। ভালবেসেছিলেন গিসেলার মা, মাদাম ফ্লুইস।

ছয়

রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে বাংলায় 'বিজয়া' বলে ডাকতেন। ফরাসী এই মহিলাকে তিনি কিছু বাংলা শব্দও শিখিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি শব্দ ছিলো—'ভালবাসা।'

সাত

রবার্ট ব্রাউনিং ও এলিজাবেথ ব্যারেট যখন পরস্পরের প্রেমে পড়েন তখনো তাঁরা কেউ কাউকে দেখেননি। প্রেম হয়েছিল কবিতার মাধ্যমে। দুইজনেই কবিতা লিখতেন। সেই থেকে পরিচয়, প্রেম এবং পরিণয়।

রবার্ট ব্রাউনিং

এলিজাবেথ ব্রাউনিং

আট

বিয়ের রাতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও তাঁর জোসেফিনকে একটি কুকুরের সঙ্গে শুতে হয়েছিল। তাঁরা দুজন যখন সঙ্গমে লিপ্ত, হঠাৎ কুকুরটি কামড়ে দেয় নেপোলিয়ানের পায়ের পাতায়। ব্যর্থ হয়ে যায় তাঁদের প্রথম সঙ্গম।

নয়

রোদ্যাকে ভালবাসতেন মেরী রোজ ব্যুরে। রোদ্যাও তাঁকে। তারপরও তাঁরা যখন দু'জন চার্চে গিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করেন, তখন তাঁদের সন্তানের বয়স বিশের কোঠা পেরিয়েছে। আর দুজনের একত্র বাসের কেটে গেছে পুরো তেপ্পান্ন বছর।

দশ
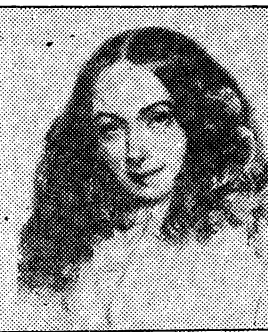
মেয়েটির নাম কামিল ক্লদেল। অসম্ভব রূপসী। রদ্যার কাছে কাজ শিখতে এসেছে। স্বভাব মতো রদ্যা প্রথম দিনই হঠাৎ হাত রেখে বসলেন তার ডান স্তনে। বিস্ময় ফুটে উঠলো মেয়েটির চোখে—'মোর, এটা কি করলেন?' 'বুঝলে না মেয়ে,' হাসলেন রদ্যা, 'দেখিয়ে দিলাম ভেনাস হেলেনরা তোমাদের ঠিক কোন খানে থাকে।'

'উহুঁ হলো না।' হাসতে হাসতে ক্লদেলও উল্টো খোঁচা লাগালো রদ্যার পাঁজরে, 'এই খানে থাকে ভেনাস হেলেনরা।' তার পর নিজের বুক দেখিয়ে বললো, 'আর এই খানে অ্যাডনিস, অ্যাপোলো কিংবা মিকেলেঞ্জেলোর ডেভিড।'

এগার

'তোমার যৌন আকর্ষণ এতো বেশি যে মুহূর্তে তুমি একশো মেয়েকে

চার্লি চ্যাপলিন

নিজের কাছে টেনে আনতে পারো।' চার্লি চ্যাপলিনকে বলেছিলেন তার এক-

কালীন প্রেমিকা লিটা গ্রে।

'ঠিক বললে না।' মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন চার্লি, 'সংখ্যাটা একশো না হবে এক হাজার।'

বারো

আন্দ্রেজিদ শৈশব থেকেই ভালবাসতেন তাঁর এক খালাতো বোনকে। কিন্তু বিয়ের আগে কখনোই মেয়েটির সাথে সহবাস করেননি। এমন কি চিন্তা পর্যন্ত করতেন না। কারণ, তাঁর মায়ের দেয়া ধারণা অনুযায়ী, এটা ছিলো একটা 'ঘোরতর পাপ।'

তেরো

ছবি দেখেই অলিভিয়া ল্যাংডনকে ভালবেসে
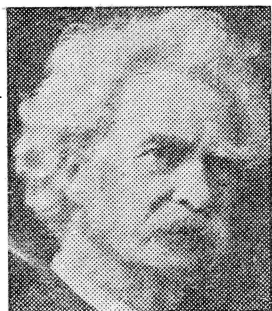
মার্ক টোয়েন

ফেলেছিলেন মার্ক টোয়েন। পরে অবশ্য তাঁদের পরিচয় এবং বিয়ে হয়েছিল। তখন টোয়েন অলিভিয়াকে আদর করে ডাকতেন 'লিবি।'

চোদ্দ

অনিন্দ্য সুন্দরী আঁতোয়ানেত দ্যু পনসকে একটা

চতুর্থ হেনরী

প্রেমপত্র লিখেছিলেন ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী। পত্রটিতে তিনি কালির বদলে ব্যবহার করেছিলেন নিজের রক্ত। কিন্তু তারপরও টলাতে পারেননি আঁতোয়ানেত পনসের হৃদয়। প্রত্যাখাত হয়েছিলেন।

পনরো

কথা হচ্ছে 'রবীন্দ্র যাদুঘর' নিয়ে। এই সময় সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাশ
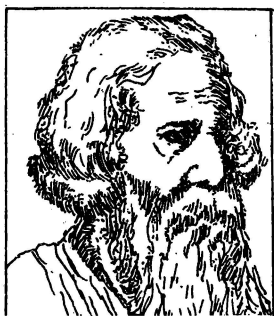
রবীন্দ্রনাথ

আন্না তড়খড়ের একটি চিঠি এনে হাতে দিলেন রবীন্দ্রনাথের। যৌবনে এই মাদ্রাজী যুবতীর প্রেমে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিঠিটি দেখে তিনি বললেন, 'তোমরা রবীন্দ্র যাদুঘর যদি করতে চাও তো এই পত্রটিকে সর্বাধিক গৌরবের স্থান দিও।'

ষোল

পাবলো পিকাসোর অনেক প্রেমিকা ছিলো। তিনি অবকাশ যাপনের সময় এদের সবাইকে একত্রে নিয়ে গল্প করতে পছন্দ
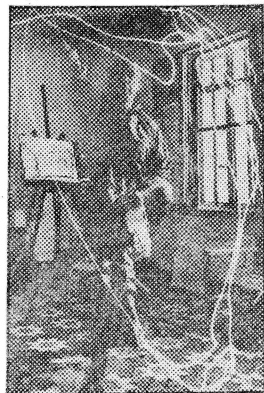
পিকাসো

করতেন। এতে বেশ একটা মজা হতো। সবাই পিকাসোর সঙ্গিনী হিসাবে বর্ণনা করতো নিজের অভিজ্ঞতা। কথা কাটাকাটি হতো। ঝগড়া বাঁধতো। আর পিকাসো পাশে বসেই গোটা ব্যাপারটা উপভোগ করতেন। □

ধ্রুব এষ
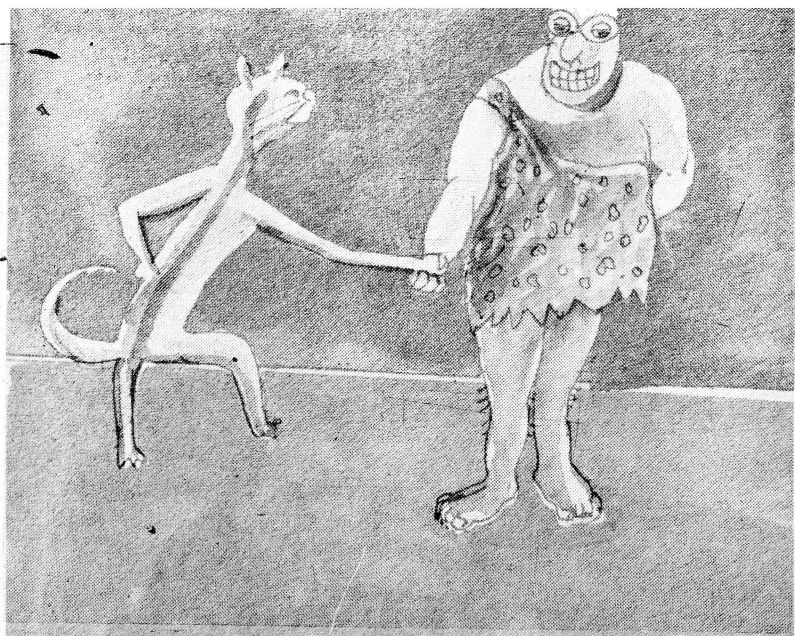
জীব মনন

আশেক মাহমুদ

'কুকুর বিড়ালের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে আমার সঙ্গে,' কিংবা 'এক্কেবারে বেড়ালের মতো স্বভাব মেয়েটার,' অথবা 'ভদ্রলোকের আচরণ সারমেয় সুলভ', এরকম বাক্য হরহামেশাই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কুকুর বিড়ালের আচরণ যে সব সময় জঘন্য, বিশ্রী হবে কিংবা কুকুর বিড়ালের সঙ্গে যে সব সময় খারাপ ব্যবহার করা হয়, তেমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বেশ কয়েকজন জীববিজ্ঞানী ইতর প্রাণীকুলের মনের গতি প্রকৃতি বোঝার জন্য ব্যাপক গবেষণাকর্ম করেছেন, প্রাথমিকভাবে তাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে কুকুর এবং বিড়াল।

সমগ্র মানব ইতিহাসে কেবলমাত্র দুধরনের ইতর প্রাণী মানুষের গৃহে প্রবেশের এবং স্বছন্দ বিচরণের সুযোগ পেয়েছে—কুকুর এবং বিড়াল। এদের পূর্ব পুরুষদের সময় থেকেই মানুষের সঙ্গে একটা অলিখিত চুক্তি আছে—মানুষ দিয়েছে আহার এবং নিরাপত্তা, বিনিময়ে ওরা মানুষের হয়ে কিছু কাজ করে যাচ্ছে।

কুকুরের কাজের প্রকৃতি বিচিত্র ধরনের —শিকার করা, সম্পত্তি পাহারা দেয়া, ছোটখাট কীটপতঙ্গ হত্যা করা, এমনকি শ্লেজ গাড়িটানা পর্যন্ত। বিড়ালের কাজ অবশ্য অতোটা ভিন্নমুখী নয়। প্রাথমিকভাবে তার কাজ হলো পোকামাকড় ধ্বংস করা, দ্বিতীয়ত গৃহপোষ্য প্রাণী হিসেবে জীবনযাপন। অবশ্য পোষ্য প্রাণী হিসেবে বিড়ালের কিছু বৈপরীত্য আছে। মানবকূলের সঙ্গে থেকেও নিজের স্বাধীনতাটুকু সম্পূর্ণ রেখে যথেচ্ছ বিচরণ আর কোনো প্রাণীর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

একেবারে বাচ্চা অবস্থা থেকেই মানুষের সঙ্গে থেকে এরা মনিবকে এক অর্থে বাবা মা ভেবে বসে।

ছাড়া অবস্থায় বিড়ালের দিন কাটে নিঃসঙ্গ ভাবে ঘোরাফেরা করে। কাজেই কুকুরের মতো মানুষের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটার ব্যাপারটি তার জন্য আকর্ষণীয় হয় না। পায়ে পায়ে হাঁটা, কিংবা বসা, কিংবা চুপচাপ শুয়ে থাকার নির্দেশ দিলে তা বিড়াল শিখতে পারে, কিন্তু বিষয়টিতে কখনো কৌতূহলী হয় না।

দরজা খোলার জন্য মনিবকে পটাতে পারলে, বেরিয়ে একবারের জন্যও বিড়াল পেছন ফিরে তাকায় না। মনুষ্য-পোষ্য বিড়াল-এর মাথা তখন কাজ করে না, বনের বিড়াল হয়ে যায় সে। ঠিক একই অবস্থায়, কুকুর যদি ঘর থেকে বের হয় তাহলে সে প্রত্যাশা করে মানব-সঙ্গীটিও পিছু পিছু আসুক।

বিড়াল ঘড় ঘড় করে কেন? তৃপ্তিতে? না, তা নয়। ব্যথা পেলে, আহত হলে, বাচ্চা হবার সময়, এমনকি মরার সময়ও বিড়াল উচ্চস্বরে দীর্ঘক্ষণ ঘড় ঘড় করে। ওই ঘড় ঘড় শব্দ হলো মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। এর অর্থ হতে পারে আমার কষ্ট হচ্ছে আমাকে একটু দেখো, অথবা তোমার যত্নের জন্য ধন্যবাদ।

অনেক পোষ্য কুকুর মালিকের সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতে চায়। কারণ সে মালিককেই তার বাবা-মা বলে ভাবে। তাছাড়া মায়ের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুতে যাওয়াটা তো সন্তানের জন্য স্বাভাবিক (এ ক্ষেত্রে মা বলতে যে মহিলাই হতে হবে তেমনটি নয়)।

বিড়ালের সঙ্গে যদি নরম করে কথা বলেন তো দেখবেন বিড়াল সোহাগের জবাব দিচ্ছে মাটিতে চিতপাত শুয়ে গড়াগড়ি খেয়ে; পা গুলো টান টান মেলা, থাবা থেকে নখ বেরোলো লেজ মোচড়াচ্ছে ধীরে ধীরে। আচমকা বিড়ালের এ মূর্তি দেখলে ভয় পাওয়ারই কথা। আসলে বিড়াল কিন্তু এই গড়াগড়ি দিয়ে বোঝাতে চায়—হৃদয় উন্মুক্ত মঞ্চ।

বহিরাগত যে কোনো লোককেই কুকুর সন্দেহের চোখে দেখে এবং বিকট চেঁচামেঁচি শুরু করে, ঘেউ ঘেউ করে। বহিরাগত যদি আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু না করে কুকুর আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যায়, উল্টোটা হলে অঘটন ঘটতে পারে।

অবশ্য কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেই সে আক্রমণ করবে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। কুকুরের ঘেউ ঘেউ আসলে সতর্ক সঙ্কেত—সে তার গোত্রের সঙ্গী এবং মানব-সঙ্গীদের সংকেত দেয়, 'তৈরি হও, এখানে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।' দেখা গেছে, একেবারে ভয়ডরহীন কুকুর সোজা তেড়ে এসে কামড়ে দেয়। যে কুকুরটি পালাতে চায় সেটি চুপচাপ থাকে, টু শব্দ না করে কেটে পড়ে।

কুকুরের শব্দ বা ডাক হলো দ্বন্দ্ব বা হতাশার বহিঃপ্রকাশ। যে কুকুরটি সব সময় আক্রমণোদ্যত, সেটি আসলে ভীত

সন্ত্রস্ত্র থাকে। দাঁত বের করে যে কুকুর আক্রমণ করতে চায়, সেটি স্বল্প পরিমাণে ভীত থাকে। ভীতি যখন আরও বেশি হয় ঘড় ঘড় তখন পরিণত হয় ঘেউ ঘেউ এ। অর্থাৎ 'আমি তোমাকে আক্রমণ করবো (ঘড় ঘড়), কিন্তু আমার দল আরও ভারি হওয়া প্রয়োজন, একা একা সাহস পাই না (ঘেউ ঘেউ)' যে কুকুরটি বেশি ঘেউ ঘেউ করে সেটি নাও কামড়াতে পারে।

অন্যপক্ষে বিড়াল সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে কখনও কখনও। অর্থাৎ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে সে ভয়ঙ্কর, বিষাক্ত।

অনেকে ভাবেন দেখামাত্র যে কুকুরটি লেজ মোচড়াচ্ছে সেটি আসলে বন্ধু ভাবাপন্ন। কথাটি সত্য নয়। অন্যপক্ষে একই ভঙ্গিতে লেজ নাড়লে বিড়ালকে শত্রু ভাবার কোনো কারণ নেই। আসলে এভাবে লেজ মোচড়ানোর অর্থ এরা কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে আছে।

ধরা যাক বিড়ালটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে। কিন্তু খোলা দরজার বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। বিড়ালটি এ অবস্থায় লেজ মোচড়াবে। দরজার কাছাকাছি এগিয়ে যদি পানির ঝাপটা লাগে তো মোচড়ানো বেড়ে যাবে কয়েকগুণ। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে বের হবে কি হবে না। কিন্তু একবার যদি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যায়, অর্থাৎ ঘরে ফিরে এলো সে, কিংবা বৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, সে ক্ষেত্রে লেজ মোচড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে।

এখন অনেকেরই জানা আছে যে কুকুর বিভিন্ন স্থানে মূত্র ত্যাগ করে সীমানা নির্ধারণ করে। বিড়ালও অনুরূপভাবে তার ভাব প্রকাশ করে। বিড়াল যখন আপনার পায়ের সঙ্গে গা ডলাডলি করে তা যে শুধুমাত্র বন্ধুত্ব প্রকাশের জন্য তা নয়, লেজের গোড়া দিয়ে বের হওয়া এক ধরনের গন্ধ সে আপনার গায়েও ছড়িয়ে দিচ্ছে যা দিয়ে সে সহজেই আপনাকে চিনে নিতে পারবে। লক্ষ্য করলে দেখবেন অনেক সময় আপনার গা চেটে, নিজের লোম চাটছে বিড়াল। এভাবে সে আসলে আপনাকে চিহ্নিত করে রাখছে।

অনেক সময় দেখা যায় বিড়াল বাবাজি খুবসে আপনার সাধের চেয়ার আঁচড়ে ওটার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। বিড়াল কেন এমন করে? আসলে বিড়ালের পুরনো ক্ষয়ে যাওয়া নখের নিচে নতুন ধারা-

লো নখ জন্মাছে। সাপের খোলশ ছাড়ানোর মতো বিড়ালও তাই আঁচড়ে আঁচড়ে উপরের নখ সরিয়ে নতুন নখ বের করে আনে। কুকুরের বাচ্চাদেরও এরকম কিছু ধ্বংসাত্মক আচরণ আছে। দেখা যায় স্লিপার, পুতুল, খবরের কাগজ আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিচ্ছে ওরা। শুধুমাত্র খেলাচ্ছলে ওরা তা করে না। চার থেকে নয় মাসের মধ্যে দাঁত উঠে কুকুরের বাচ্চার, এবং ওগুলোকে শক্ত করার জন্য এ ব্যাপারগুলো ঘটায়।

অনেক বিড়াল মালিক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, হয়তো আরাম করে চেয়ারে বসে আছেন আপনি, আচমকা লাফ দিয়ে আপনার কোলে এলো বিড়ালটি। তারপর সামনে পা দুটো দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করলো, এক সময় খোঁচা লেগে গেল আপনার উরুতে, ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আপনি বিড়ালকে। গবেষকরা দেখেছেন বিড়াল যখন কোলে উঠেছিল তখন সে আপনাকে মায়ের মতো ভালোবেসেই উঠেছিল। এবং একেবারে ছোটো থাকতে দুধ পাওয়ার জন্য মায়ের সঙ্গে যে ব্যবহার করতো সেই আচরণটি এখন করছে আপনার সঙ্গে, ফলে আচমকা ফেলে দেয়ায় তার জন্যে হতচকিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সব রোগীর পোষ্যপ্রাণী আছে তারা দীর্ঘজীবি হন। ডাক্তারী সূত্রেও একথা পরীক্ষিত হয়েছে একটি বন্ধু ভাবাপন্ন গৃহপালিত পোষ্য প্রাণী উচ্চ রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে। আধুনিক জীবন যাত্রায় মানুষ নানা রকম উৎকণ্ঠা, উদ্বেগে ভোগে। শুধুমাত্র একটি গৃহপোষ্য বিড়াল বা কুকুর প্রমাণ করতে পারে নির্দোষ নির্মম ভালবাসার মাধ্যমে, উৎকণ্ঠাহীন জীবনযাপনও সম্ভব। ☐

(বিদেশী পত্রিকা থেকে)

চীনা ডিশে আঁকা স্বর্গের ছবি।

সে-এক সুখের রাজ্য

মহাবিচারের দৃশ্য। হায়ারনি বশের আঁকা 'দা সেভেন ডেডলি সিনস'।
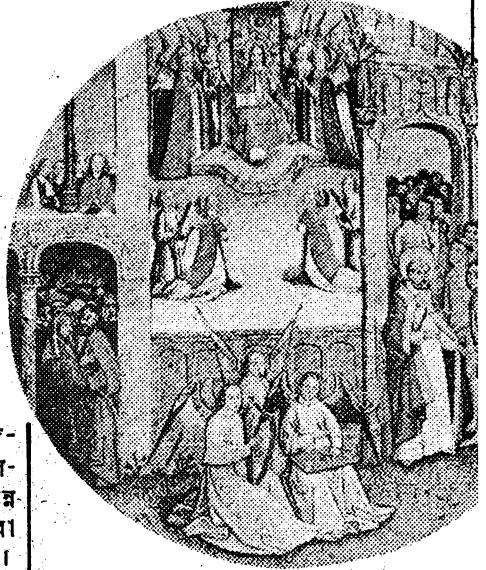
জেবীন হামিদ

মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে সেই আদিকাল থেকে মানুষ চিন্তা করে এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধর্মের এবং ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষেরা মোটামুটি এক ধরনের চিন্তাই করেছে। তা হলো, যারা পৃথিবীতে ভালো কাজ করবে তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত সুখ। আর খারাপ লোকরা পরকালে অনন্তকাল ধরে কষ্ট পাবে।

Paradise পারসী শব্দ। পরবর্তীতে এটি গ্রীক ভাষায় চলে আসে। এর অর্থ 'শান্তি ও আশীর্বাদের স্থান'। এই শব্দ পারসী রাজার মনোরম বাগান 'Garden of Eden' এর বেলায় ব্যবহার করা হতো। পরে বাইবেলের নতুন টেস্টামেন্টের লেখকরা Heaven বা স্বর্গের ক্ষেত্রে এই শব্দটা ব্যবহার করে। বেশিরভাগ পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্মে বলা হয়েছে, আকাশে কোথাও এই জায়গাটি আছে।

ভারতে বৈদিক সমাজে মনে করা হয় যে, আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে স্বর্গ অবস্থিত। সেটা হচ্ছে আলোর রাজ্য। সেখানে ভালো মানুষদের জন্যে থাকবে 'সুমধুর সঙ্গীত ও শারীরিক আনন্দের ব্যবস্থা। থাকবে না কোনো দুঃখ-কষ্ট, দায়িত্ব।'

হিন্দু ধর্মে মনে করা হয়, মেঘের উপরে রয়েছে স্বর্গরাজ্য। আকাশে স্বর্গের অবস্থান নিয়ে বৌদ্ধদের ধারণা অস্পষ্ট।

হিব্রু ও গ্রীকদের কাছ থেকে খ্রীষ্টানরা অনেক ধর্মমত গ্রহণ করেছে। ইহুদীদের কাছ থেকে তারা এটা জেনেছে যে আকাশের রাজ্যে স্রষ্টা ও পরীরা থাকে। গ্রীকদের কাছ থেকে মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক যাত্রার কথা বিশ্বাস করেছে। স্বর্গ সাতটি এবং সর্বশেষটি সর্বশ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বাসটিও গ্রীকদেরই।

ইলিসিয়াম অঞ্চল গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর জন্মস্থান। এখানে বহু বিখ্যাত কবি জন্মেছেন। বিখ্যাত গ্রীক কবি হোমার এর মতে, স্বর্গ রয়েছে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। অন্যান্যদের ধারণায়, আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে স্বর্গ রয়েছে সেখানে মিষ্টি ফলের গাছ আছে। সেই গাছের ফলগুলি বছরে তিনবার নতুন করে রূপে-রসে ভরপুর হয়।

স্ক্যাণ্ডিনিভিয়ান দেশগুলি (নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, আইসল্যাণ্ড)-এর জলদস্যুদের মধ্যে valhalla বা স্বর্গ সম্পর্কে ধারণা কিছু কম সুখকর ছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, এটা হচ্ছে মৃতদের থাকার জায়গা। এসগার্ডের প্রাসাদে ৪৫০টি এতো বিশাল গেট থাকবে যে ৮৫০ জন মৃত বীর সৈনিক পাশাপাশি মার্চ করে ঢুকতে পারবে। স্রষ্টা Odin-এর পরিচারিকারা খুব জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বীর সৈনিকদের বাছাই করে নিয়ে আসবে এখানে। এরপর Odin প্রাসাদের ভিতরে তাদের ভোজে আপ্যায়িত করবেন।

যারা বীর তাদের জন্যেও স্বর্গে খুব একটা শান্তি নেই। কেননা, তাদেরকে এখানে সবসময় যুদ্ধ করতে হবে। তবে যুদ্ধ করতে করতে যারা মারা পড়বে তাদেরকে Odin-এর সাথে ভোজ খাওয়ার জন্যে জীবিত করা হবে। এইটুকুই তাদের সুখ।

চীনা মতবাদ:

খ্রীস্টের জন্মের হাজার হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন চীনে বিভিন্ন ধরনের স্বর্গীয় দর্শনের কথা প্রচলিত ছিলো।

স্বর্গ অনেক এবং সবচেয়ে ভালো দুইটি হলো পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্রে অবস্থিত 'Tsles of Blest' এবং তুর্কিস্থান পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত 'পশ্চিমের স্বর্গটি।'

চীনারা মনে করে, পৃথিবীতে দুইটি বিপরীত শক্তি একই সাথে কাজ করে। ভালো শক্তির নাম yang। সে উষ্ণ, শক্তিশালী, কর্মদক্ষ, দৃঢ় ও উজ্জ্বল। yin খারাপ শক্তি। সে স্ত্রীজাতীয় ও শীত, অস্পষ্টতা, রহস্য ও পরিবর্তনের প্রতীক। স্বর্গ yang-এর প্রভাবে পরিচালিত হয় এবং পৃথিবীর উপর প্রভাব রয়েছে yin-এর। অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনে যেখানে ভালো ও খারাপ শক্তির মধ্যে সবসময় সংঘর্ষ চলে সেখানে প্রাচীন চীনারা মনে করতো, yang ও yin একসাথে কাজ

করার ব্যাপারে একমত থাকতো।

চীনা দর্শনের মূল কথা হলো Taoism। এটি হচ্ছে পথ। একে বুঝতে পারাটা জীবনের এক গভীর রহস্য। Tao যখন স্বাভাবিকভাবে চলতে পারবে তখনই শুধু স্বর্গ আর পৃথিবীর মধ্যে ঐক্য সম্ভব। ধীরে ধীরে এই দর্শনের যাদুবিদ্যার প্রভাব চলে আসে। এরপর থেকে মনে করা হতে থাকে যে, এটি হচ্ছে স্বর্গরাজ্য। পরীদের রানী এই রাজ্য শাসন করে থাকে।

ইসলাম সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম। খুব সহজ-সরল ধর্মমত-এর। এক আল্লাহ্‌র প্রতি এই ধর্মের লোকেরা বিশ্বাসী। ইসলাম অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ। মুসলিম অর্থ যে আত্মসমর্পণ করেছে। মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্‌ প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন হজরত মোহাম্মদ (সঃ)। আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নির্দেশ তার কাছেই নাযিল হয়েছে। এইগুলিকে একত্র করে সৃষ্টি হয়েছে কোরআন—মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

পনেরোশো শতকে জার্মান চিত্রকর লচনার-এর আঁকা 'জাজমেন্ট ডে'।

স্বর্গে পদবী অনুসারে নানাজনের নানা স্থান

কোরআনে বেহেশত ঃ

পবিত্র কোরআনে বেহেশতের উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে বেহেশতবাসীদের জন্যে থাকবে মনোরম উদ্যান, ফোয়ারা, শরাব (নেশা হবে না সে পানীয় খেলে) এবং হুরপরী। অবিশ্বাসীদের প্রতি তারা হাসবে। তাদের কোনো অভাব থাকবে না এবং তারা চিরযৌবনের অধিকারী হবে।

বৌদ্ধ মত ঃ

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মৃত্যুর পরে পরকালে দোযখ-বেহেশত এসবে বিশ্বাস করে না। তারা এই পৃথিবীতেই বারবার জন্মগ্রহণের কথা বিশ্বাস করে। যারা ভালো কাজ করবে তারা পরবর্তী জন্মে উন্নত জীবন যাপন করবে। খারাপ লোকেরা অনুন্নত জীবন যাপনে বাধ্য হবে।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা ভারতের উত্তর অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ধর্মমত ছিলো, যে ব্যক্তি সব প্রকার মানসিক ও শারীরিক আনন্দ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবে সে 'নির্বান' প্রাপ্ত হবে। নির্বান লাভ করাই ছিলো বৌদ্ধদের মূল লক্ষ্য।

প্রাচীন চীন, জাপান ও তিব্বতে বৌদ্ধদের এক অংশ 'পশ্চিমের স্বর্গে' বিশ্বাস করতো। এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'এই জায়গার চারিপাশে রয়েছে উজ্জ্বল রশ্মির স্তম্ভ এবং অমূল্য রত্নরাশি। ভগবান বুদ্ধ সেসবের মাঝে সোনার পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকবেন। আর চারপাশে বসে থাকবে তার অনুরাগীরা।'

নরক সম্পর্কে ধারণা ঃ

ইহুদী আর খ্রীষ্টানদের মতানুসারে মনে করা হয়েছে, এটা একটা বীভৎস জায়গা। সেখানে পাপীদের সারিবদ্ধভাবে

সিগনোরেলির আঁকা 'লাস্ট জাজমেন্ট'। নরকের দৃশ্য।

স্বর্গ-নরকের দ্বারপথ
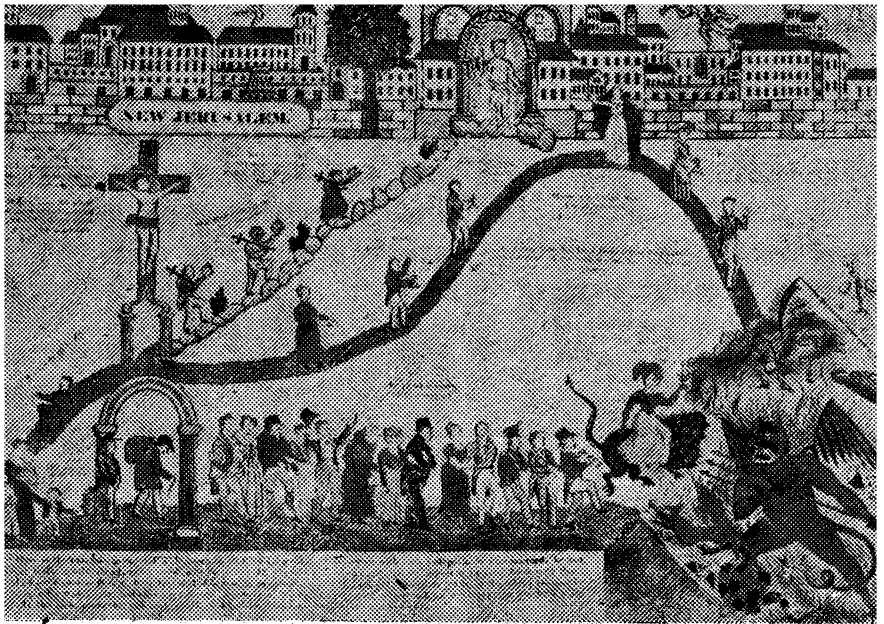
আগুনে পোড়ানো হবে।

আধুনিক চিন্তাধারার একজন শিল্পী Sartre নরককে 'বন্ধ বৃত্ত' হিসাবে কল্পনা করেছেন। দুইজন মহিলা ও একজন পুরুষ একটি ছোট্ট কামরায় সবসময়ের জন্যে বন্ধ অবস্থায় আছে বলে অঙ্কনে দেখানো হয়েছে।

প্রাচীন খ্রীষ্টানদের ধারণা সম্পর্কে দ্বিতীয় শতাব্দীতে Apocalypse of Peter গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'এবং সেখানে নাস্তিকদের জিহবাতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে। তাদের নিচে থাকবে প্রজ্জ্বলিত আগুন। পাশে আরেকটি জায়গায় তরবারীর চেয়েও ধারালো পাথরকে আগুনে উত্তপ্ত করে অপরাধী নারী-পুরুষকে সেখানে বেঁধে রাখা হবে। যেসব মেয়েরা বিয়ের আগে পর্যন্ত কুমারী থাকে না, তাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। তাদের শরীরের মাংস টুকরো টুকরো করে কাটা হবে।'

হোমার নরককে এক অন্ধকারময় দুঃখের জগত হিসাবে কল্পনা করেছেন। নরককে মৃত্যুর দেবতা Hades-এর রাজ্য হিসাবে ইলিয়াডে বর্ণনা করেছেন, 'ক্ষয়-প্রাপ্ত হবার একটি ঘৃণ্য জায়গা। যেখানে দেবতারা ভয়-ভীতিতে পূর্ণ করে রেখেছেন।' গ্রীকরা মৃত্যুকে এতো ভয় পেতো যে, পারতপক্ষে এর নামই তারা মুখে আনতে চাইতো না।

মৃত্যু নদী ঃ

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়, গ্রীসের আর্সেডিয়া প্রদেশের নিচে Styx নদী হচ্ছে মৃত্যুনদী। Charon মৃতদেরকে এই নদী পার করে যমপুরীতে পৌঁছে দেয়।

ইসলামে নরকের ভয়ঙ্কর চিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'চারিপাশে আগুন, ক্ষতিকর বায়ু ও জ্বালাময় পানি রয়েছে।'

মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়। তবে মৃত্যুর পরে সুন্দর একটি রাজ্যে যাওয়ার আশা থাকলে মৃত্যু-ভীতি কিছুটা কমবে। আমাদের সবারই প্রত্যাশা সেই সুখের রাজ্যে প্রবেশের। □

সেবা প্রকাশনীর
আগামী
তিনটি
উপহার

সম্পূর্ণ রহস্যোপন্যাস
মৃত্যু পুতুল
কবির আশরাফ
StoicX

কাদের খানের একমাত্র মেয়ে ফিরোজা দোতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে মারা যাবার পর তার বউ নিজে চুলোর আগুনে পুড়িয়ে ছাই করেছিলেন এটাকে।
ফিরে এসেছে পুতুলটা।

'বাড়িটাতো ভালোই, কিন্তু এত-বড় বাড়ি সাজাবো কি দিয়ে?' স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন মাজেদা বেগম।

'অসুবিধা কি। ফার্নিচার আমাদের কম নেই খুব একটা।'

'আব্বু, আমরা মোটে চারজন। এত-বড় বাড়িটায় থাকবো কি করে?'

মেয়ের দিকে তাকালেন আহাদ সাহেব। বাড়ি দেখে মেয়েটা খুশি হয়েছে কিনা বুঝতে পারলেন না। তবে চঞ্চলতা আছে খুব। ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

পুরনো লাল ইঁটের বাড়িটা খুব সস্তায় পেয়ে গেছেন আহাদ সাহেব। পাহাড়-তলীতে একটা ভাড়া বাসায় এতদিন ছিলেন। জাঁকজমক সেখানে ভালোই ছিলো। তবুও তো ভাড়া বাড়ি।

তাছাড়া রমরমা প্র্যাকটিস। ডাক্তার হিসাবে নামডাক কিছুটা ছিলো। সব ছেড়েছুড়ে চলে এলেন কুসুমপুরে। চিটা-গাঙে এই অঞ্চলটাই সবচেয়ে প্রাচীন। হিন্দু জমিদারদের বাড়িঘর আছে ছড়ানো ছিটানো। ভাঙা-চোরা। পলেস্তারা খসা।

এই বাড়িটাই সবচেয়ে ভালো। মালিক কাদের চৌধুরী কেন যে হুট করে বিক্রি করে দিলেন এটা বুঝতে পারলেন না আহাদ সাহেব। বেশি কিছু জিজ্ঞেসও করেননি এ ব্যাপারে।

হাজার হোক জমিদারী শানশওকত আছে বাড়িটাতে। সুযোগ বারবার আসে না। বিশাল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন আহাদ সাহেব। 'একটু নির্জন, এই যা।'

'একটু না, বেশ নির্জন। আমার তো রাত বিরেতে গা ছমছম করবে একা বেরুতে।' মাজেদা বেগম ক্ষোভ চেপে রাখার চেষ্টা করলেন না।

'আরে না না। ওই তো ওদিকে রশীদ চেয়ারম্যানের বাড়ি। আর পুবে ফজু মিয়ার বাড়ি। তেমন কোনো অসুবিধা হবে না,' স্ত্রীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন আহাদ সাহেব।

'এই তোমরা সব দেখছো কি? মাল-

পত্রগুলো নামাও না। বিকেল হতে তো আর বাকি নেই।'

তাড়া খেয়ে ঠেলাঅলারা ধরাধরি করে মালপত্র নামাতে শুরু করলো। সেগুন কাঠের ভারি ভারি খাট পালং। টেনে হিঁচড়ে নামাবার চেষ্টা করতেই হ্যা হ্যা করে উঠলেন আহাদ সাহেব। 'আহ্ হা। আঁচড় লাগবে তো খাটে। আলগা করে তুলে নামাও না। কাজকর্ম শেখোনি কিছু?'

বিকেল নাগাদ সব জিনিসপত্র ঘরে তোলা হয়ে গেল। মিতার উৎসাহের অন্ত নেই। এটা সেটা ধরে টানাটানি করছে। আহাদ সাহেব খুশি হলেন। একে নিয়েই চিন্তা ছিলো। ভীষণ জেদী মেয়ে। যদি অপছন্দ করে বসতো তাহলে মুশকিল হতো খুব।

'কি মা, পছন্দ হয়েছে বাড়ি?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। কেমন রাজবাড়ি রাজবাড়ি ভাব, না?'

'আরে রাজবাড়িই তো ছিলো এটা।' মেয়ের কথায় হাসলেন আহাদ সাহেব। 'জমিদার নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি ছিলো এটা। কাচারী বাড়ি। কোলকাতা থেকে এখানে এসে থাকতেন মাঝে মাঝে।'

'আমার রুম ঠিক করে ফেলেছি দোতলায়।'

'তাই নাকি? তুমি একা একা থাকতে পারবে আলাদা রুমে?'

'বারে। আগের বাসায় ছিলাম না?' ঠোঁট ওল্টালো মিতা।

'ঠিক আছে। তোমার মাকে বলে দেখো।'

কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে বিছানাপত্র ঠিকঠাক করছিলেন মাজেদা বেগম। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এখন তার পরিশ্রম করার সময় নয়। হাবুর মাকে চিৎকার করে কিছু একটা বলে এ ঘরে এসে ঢুকলেন।

'কি কথা হচ্ছে বাপ-মেয়েতে?'

'মিতা দোতলায় আলাদা ঘরে থাকতে চাইছে।'

'বললেই হলো। ওই একরত্তি মেয়ে দোতলায় একা থাকবে!'

'আহা, তা কেন? আমরাও তো দোতলায়ই থাকবো।'

'মোটেই না, একতলায় থাকবো সবাই। দোতলায় কাঠের বড় বড় জানালা। কেমন একটা প্রাচীন প্রাচীন ভাব। মাকড়সার জালে ভর্তি।'

স্বামীর কথাকে আমলেই আনলেন না মাজেদা বেগম। ওপরতলাটা পছন্দ হয়নি তার। অনেক উঁচুতে সিলিং আর অদ্ভুত তিনকোণা জানালা। দেয়ালের গায়ে বড় বড় কাঠের আলমারি। ওখানে থাকলে রাতে ভয় লাগবে তার।

'জানো, আব্বু, দোতলায় বাদুর আছে,' চোখ বড় বড় করে বললো মিতা।

'বাদুর? কোথায়?'

'দোতলার ভেন্টিলেটরে অনেকগুলো দেখলাম।'

'তোর আর ওপরে গিয়ে কাজ নেই। মুখে খামচে দেবে,' মেয়েকে সাবধান করে দিলেন মাজেদা বেগম। আহাদ সাহেব বললেন, 'যাক না। খেলুক ওপরে গিয়ে। বাদুর কাউকে খামচায় না।'

এই এক দুর্বলতা তার। মেয়েটার মুখের দিকে চাইলে কিছুতেই তাকে না বলতে পারেন না। বারো বৎসরের বিবাহিত জীবনে কোনো সন্তান হয়নি তাদের। চার বৎসরের মাথায় এতিমখানা থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন মিতাকে।

চার বৎসর বয়স তখন মিতার। আহাদ সাহেব বা মাজেদা বেগম কোনোদিনই বুঝতে দেননি কাউকে মিতা তাদের পালিতা মেয়ে। কিন্তু মিতা জানে।

মা বাবার অভাব কখনো বোধ করেনি

সে। সুযোগ হয়নি। আদরে স্নেহে তাকে ঘিরে রেখেছেন আহাদ দম্পতি।

সন্ধ্যা নামছে পাহাড়ে। দূরের সমুদ্রে অবিশ্রাম গর্জনে ভেঙে পড়ছে ঢেউ। সেদিকে তাকিয়ে রইলেন আহাদ সাহেব। সাগর পারের নতুন জীবন কেমন হবে কে জানে।

খুশিতে নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকলো মিতা। 'আব্বু, আব্বু, দেখো এটা কি?'

প্রায় দেড়ফুট লম্বা একটা পুতুল মিতার হাতে। 'কোথায় পেলে এটা?'

'দোতলায়। দেয়াল আলমারির ভেতরে ছিলো। ইস, কি সুন্দর না পুতুলটা?' খুশিতে চকচক করছে মিতার চোখ।

ভালো করে পুতুলটা দেখলেন আহাদ সাহেব। অনেক পুরনো। তিরিশ চল্লিশ বছরেরও হতে পারে। এর আগে এ ধরনের পুতুল চোখে পড়েনি তার। কালো ফ্রক পরা। মাথায় ইউরোপিয়ান বাচ্চাদের মতো কালো বনেট।

'মনে হয় কাদের সাহেবের জিনিস। ভুলে ফেলে গেছেন। কাল একসময় দিয়ে আসতে হবে ওটা।'

'না, দেবো না এটা আমি। আমি পেয়েছি এটা। আমার পুতুল।' বুকের সাথে চেপে ধরলো মিতা পুতুলটা। যেন কেউ কেড়ে নেবে বলে ভয় পাচ্ছে।

মাজেদা বেগম ঘরে ঢুকলেন। মুখে ক্লান্তির ছাপ। 'না, আজকে সব গোছগাছ করা সম্ভব না। হাবুর মা তো একটা আলসের হদ্দ। তোমার ফার্মেসীর ওরা খাট-পালংগুলো ফিট করে না দিয়ে গেলে মেঝেতে শুতে হতো আজ।'

আহাদ সাহেব হাসলেন। স্ত্রীর এই গোছগাছ করার অভ্যাস অনেক পুরনো। একদিনেই সব করে ফেলতে চায়।

'দেখো কি পেয়েছে তোমার মেয়ে।'

'দেখেছি আমি। সকাল থেকেই তো দোতলায় পই পই করে ঘুরছে। আরো কতো কি সে আবিষ্কার করবে কে জানে।'
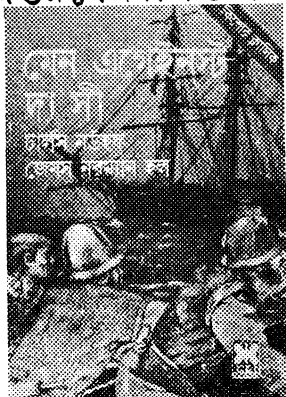
এই মিতা, যা হাতমুখ ধুয়ে আয়। মাকড়সার জাল আর তেলেপোকার লাদি দিয়ে তো ঢেকে গেছে মাথা।'

'অ্যাঁ, মা। কি বলো তুমি।' ঘেন্নায় তিড়িং-বিড়িং করতে লাগলো মিতা। মাথা ঝাঁকালো কয়েকবার।

'চা খাইবেন, আম্মা?' নতুন পাকের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হাবুর মা। আদর্শ ফোকলা বুড়ি। কানে প্রায় শোনেই না। তবে শরীর শক্ত সমর্থ। কাজ করতে পারে খুব। 'খাওয়া যাক এক কাপ, কি বলো?' স্ত্রীর দিকে চাইলেন আহাদ সাহেব।

'হরলিকস বানাও। খুব টায়ার্ড লাগছে।' চেয়ারে বসলেন মাজেদা বেগম।

'আম্মু, এটার নাম দিয়েছি কি জানো?' আদর করে পুতুলটার মাথায় হাত বুলাচ্ছে মিতা। অদ্ভুত একটা পুতুল। চোখ দুটো একদম সাদা। মাথাটা সামান্য ওপর দিকে তোলা, মনে হয় যেন অন্ধ।

'কি?'

'পুতুলটা খুব পুরনো মনে হয় না? তাই নাম দিলাম জুলেখা।'

'কি নাম দিলি?' ভ্রূ কুঁচকে গেল মাজেদা বেগমের।

'জুলেখা।'

'এটা একটা নাম হলো? কত্তো সুন্দর সুন্দর নাম আছে। তা না একটা গাঁইয়া নাম রাখলি?'

'আমার বন্ধু। আমার যা খুশি রাখবো।' ঠোঁট ফুলালো মিতা। মায়ের খোঁচাটা ভালো লাগেনি ওর।

বাপের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালো মিতা। 'তোমার বন্ধু বুঝি এটা?'

'হ্যাঁ। এতবড় ডল পুতুল আর কারো নেই।'

'ঠিক আছে। আমরা তাহলে পাঁচজন হলাম বাসায়, না?'

হেসে ফেললো মিতা। তার নিজের রুমের দিকে চলে গেল সে।

নিচতলায় মোট পাঁচটা রুম। সামনের দিকে ড্রইং রুম। মাঝখানের ঘরটাকে লিভিংরুম বানানো হয়েছে। উত্তর দিকের ছোটো রুমটায় মিতা আর বুয়া থাকবে। পুবের ঘরটা আহাদ সাহেবের স্টাডি। পাঁচ নম্বর কক্ষে রান্নাঘর।

নতুন বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি, পানি, সবই আছে। মিতা নিজের ঘরে ঢুকে সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল চারদিক।

বাইরে রাত নেমেছে। গ্রামটা এখন শুনসান, নীরব মনে হচ্ছে। শুধু সমুদ্রের চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো মিতা।
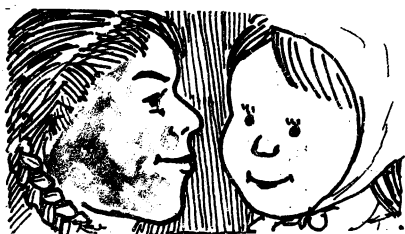
জোনাকীর আলোয় ভরে গেছে সমুদ্রের ধার। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর সমুদ্রের উঁচু পাড়। পায়ের শব্দে পিছনে চাইলো মিতা। আহাদ সাহেব ঢুকলেন ভিতরে।

'বাহ্। চমৎকার সাজানো হয়েছে তো মা মনির রুম।'

'জুলেখা থাকবে আমার পড়ার টেবিলের ওপর, আর বুয়া ওই দিকে। আচ্ছা, আব্বু, ওই ফাঁকা জায়গাটায় তো আমরা রাতে বেড়াতে পারবো, না?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন আহাদ সাহেব। কি নির্জন। অথচ কি সুন্দর। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। চিটাগাঙের হৈ হুল্লোড়ের সাথে কোনো তুলনাই হয় না।

চাঁদের আলোয় দুই ফিটের মতো উঁচু লাল ইঁটের দেয়ালটা চোখে পড়লো।

এতক্ষণে। হঠাৎ একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠলো মন। এই রুমে মিতাকে থাকতে দেয়া কি ঠিক হলো? জানালা দিয়ে তাকালেই ওর চোখে পড়বে ওটা।

চৌধুরীদের পুরনো পারিবারিক গোরস্তান। এই ঘরে বসে গোরস্তানটাই চোখে পড়বে ওর সবার আগে। ছোট্ট মেয়ে। ভয় পাবে না?

অথচ যে রকম জেদী। একবার যখন নিজে পছন্দ করেছে শত চেষ্টাতেও আর রুম বদলাতে রাজি হবে বলে মনে হয়-না। খুঁতখুঁত করছে আহাদ সাহেবের মন।

'ওটা কবরস্তান, মা। ওখানে বেড়াতে যেতে পাববো না আমরা।'

'তুমি যদি চাও তাহলে ওই দিকের রুমটা নিতে পারো।'

'কেন?'

'রাতের বেলা ভয় করবে না?'

'নাহ্। আমরা তো তিনজন থাকবো এ ঘরে।'

'তিনজন মানে?'

'বারে। আমি, বুয়া আর জুলেখা। তিনজন হলাম না?'

ভুলেই গিয়েছিলেন আহাদ সাহেব ব্যাপারটা। 'ওহহো। তাই তো। তোমার তো আবার বন্ধু জুটেছে এক-জন।'

রাতের খাবার শেষে তাড়াতাড়ি শোওয়া হলো আজ। নতুন বাড়ি। মাজেদা বেগম একা উঠোনে যেতেই রাজি হলেন না। তার নাকি গা ছমছম করে। বুয়া গিয়ে উঠোনের দিকের দেয়া-লের ছোট গেটটা বন্ধ করে দিয়ে এলো।

বেশ কয়েকটা বড় বড় শিশু আর ইউক্যালিপ্টাস গাছ উঠোনে। একটা দুর্লভ গাছ আছে। নাগলিঙ্গম।

মিতাকে শুইয়ে দিতে এসে আহাদ দম্পতি উঠোনটা আরেকবার দেখলেন ভালো করে। মাজেদা বেগমের মনে হলো এই বাড়িতে আরো কিছু লোক থাকলে ভালো হতো।

'চোর ডাকাতের ভয় নেই তো?'

'আরে না। এই তো কাছেই পুলিশ ফাঁড়ি আছে একটা। তাছাড়া লোকজনও খুব ভালো এদিকটায়।'

স্ত্রীকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললেন বটে কথাটা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এসব ব্যাপার আরো ভালো করে ভেবে দেখা উচিত ছিলো তাঁর। বাড়িটা সত্যি বড্ড নির্জন।

মিতার রুম থেকে নিজেদের ঘরে চলে আসবার সময় পুতুলটাকে দেখতে পেলেন আহাদ সাহেব। টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে জানালার বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এলো আহাদ সাহেবের। মনে হলো সত্যি সত্যি দশ-বারো বৎসরের একটা মেয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। চোখ দুটো দুধ সাদা, অদ্ভুত। কিন্তু মনে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে সব কিছু। জীবন্ত।

মেয়ের গোঙানির শব্দে ঘুম ভাঙলো মাজেদা বেগমের। ঘুম প্রায় আজকাল হয়ই না তার। এখন সাত মাস চলছে। শুয়ে বসে কোনভাবেই স্বস্তি পান না।

তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললেন। দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। হালকা নীল আলোয় চুপচাপ শুয়ে আছে মিতা। মশারীর ফাঁক দিয়ে সুন্দর, মায়াভরা মুখটা দেখা যাচ্ছে। 'এই মিতা।' ঝাঁকানি দিলেন মেয়েকে মৃদুভাবে। 'স্বপ্ন দেখ-

ছিলি ?'

'চোখ খুলে চাইলো মিতা। কয়েক-মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো ফ্যালফ্যাল করে। তারপর স্বাভাবিক হয়ে এলো। 'হ্যাঁ। এখন না। সকালে বলবো।'

'ওই ঘরে শুবি ? ভয় লাগছে ?'

ঘাড় নাড়লো মিতা। কি যে হয়েছে মেয়ের—সাত-আট মাস হয়ে গেল সব সময় আলাদা বিছানায় ঘুমাবে। মেঝেতে অঘোরে ঘুমুচ্ছে হাবুর মা। বুকটা সামান্য ওঠানামা করছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে বেঁচে আছে।

শুয়ে শুয়ে মিতা স্বপ্নটার কথা ভাবছে। বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে সে।

অন্ধ একটা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে সমুদ্রের ধারের উঁচু রাস্তা দিয়ে। কয়েকটা দুষ্টু ছেলেমেয়ে পিছু নিয়েছে তার। ক্ষ্যাপাচ্ছে।

'সামনে একটা পাথর আছে। ঘুরে যাও।'

'এদিকেগেলে সোজা পানিতে পড়বি।'

চুপচাপ হাঁটছে মেয়েটা। দশ এগারো বছর বয়স। দৃষ্টিহীনের আড়ষ্ঠ, সাবধানী হাঁটা। দুই হাত শূন্যে ভাসছে। বোঝার চেষ্টা করছে কোনো বাধা আছে কিনা।

হাসছে দুষ্টু ছেলেগুলো। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ মেয়েটা। সন্দেহ দেখা দিলো মনে। এই পথ তার মুখস্থ। বহুবার গেছে এখান দিয়ে। তবু কোনো ভুল হচ্ছে না তো ?

কি করবে সে এখন। মনকে শান্ত করলো অনেক চেষ্টা করে। ওদেরকে পাত্তা না দেয়াই ভালো। পাজী ছেলে-মেয়ে সব।

'তোর মা নাগর নিয়ে বসে আছে। জলদি বাড়ি যা।'

'তোর বাবাই নাকি ভাড়া খাটায়। আব্বার কাছে শুনেছি।'

কান ঝাঁ ঝাঁ করছে মেয়েটার। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করলো তা সত্ত্বেও।

সামান্য ভুল হলেই বিপদ হতে পারে। কয়েকবার এদিক ওদিক পা বাড়িয়ে পরখ করলো সে। কয়েকটা নুড়ি ঠেকলো পায়ে। এই পথে তো নুড়ি নেই। তাহলে ?

সমুদ্রের আওয়াজ শুনে দিক খোঁজার চেষ্টা করলো মেয়েটা। জোরে বাতাস বইছে আজ। চারদিক থেকেই ভেসে আসছে এক জলরাশির গর্জন। ভয় পেলো সে এবার।

হাততালি দিয়ে হাসছে ছেলেমেয়ে-গুলো। মনে হচ্ছে চারদিক ঘিরে রেখে-ছে ওরা। বাঁয়ে একটু ঘুরলো মেয়েটা। সম্ভবতঃ এটাই।

পাঁচ-সাত হাত এগিয়ে গেল সামনে। হঠাৎ একটা বড় পাথরে ঠেকলো হাত। ক্ষুদ্র বুকটা কেঁপে উঠলো অজানা আশঙ্কায়।

'ঠিকই আছে। যাও না,' বিকৃত স্বরে বললো একজন।

কয়েক পা পিছিয়ে এলো সে এবার। সমুদ্রের গর্জনের শব্দ হঠাৎ বেড়ে গেল। একটা গাংচিলের কর্কশ ডাক শোনা গেল কাছেই।

সোজা সামনে হাঁটবার চেষ্টা করলো মেয়েটা। অসহায় বোধ করলো ভীষণ ভাবে। আর কতো দূরে বাড়ি ?

এক পা সামনে দিয়েই বুঝতে পারলো ভুল হয়ে গেছে। পিছিয়ে আসাব চেষ্টা করলো তাড়াতাড়ি। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। বাতাসে কয়েকবার দ্রুত পাক খেলো ছোটো দুটো হাত। টের পেলো শূন্যে ভাসছে তার শরীর।

চারপাশ থেকে ঠাণ্ডা পানি এসে যখন তাকে ঘিরে ধরলো তখন কোনো কষ্ট অনুভব করলো না মেয়েটা।

তার সমস্ত মন জুড়ে তখন ভর করেছে

ভীষণ ক্রোধ। কেন, কেন সে দেখতে পায় না? কেন তাকে এভাবে অসহায় অবস্থায় পড়তে হলো।

ঘৃণা আর রাগে তখন চারপাশের পরিস্থিতি বেমালুম ভুলে গেছে মেয়েটা। ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে, আর তখনই মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো মিতার। বুঝতে পারলো ঘেমে গেছে সারা শরীর। স্বপ্নের মেয়েটার কথা মনে পড়লো। খুব মায়া হলো তার জন্যে। কেমন যেন চেনা চেনা লাগলো ওকে। কোথায় দেখেছে আগে?

নতুন স্কুলে আজই প্রথম গেল মিতা। চট্টগ্রাম শহরের স্কুলের সাথে কোনো তুলনাই চলে না এর। সব কিছু ছোটো ছোটো। শেলী আর চম্পাকে খুব ভালো লাগলো ওর। প্রথম দিনই ওকে বেঞ্চে বসার জায়গা করে দিয়েছে ওরা।

কিন্তু শিউলিকে বিশেষ পছন্দ হয়নি। কেমন যেন হিংসুটে চেহারা মেয়েটার। মিতা স্কুলে ফার্স্ট হতো শুনে চেহারা শুকনো হয়ে গেছে ওর। এ পর্যন্ত শিউলিই ছিলো ফার্স্ট গার্ল। শেলীই সাবধান করে দিলো ওকে।

'শিউলিটা না খুব হিংসুটে। আর খুব ড'াট। ওর বাবা তো সওদাগর। খুব বড়লোক। কাউকে পাত্তাই দেয় না।'

মিতার মন খারাপ হয়ে গেল। নতুন জায়গায় এসেই কারো সাথে মন কষাকষি করতে চায়নি ও। কিন্তু কপাল খারাপ। 'আমি ওর সাথে ঠিকই খাতির জমাতে পারবো, দেখো। আমার নামই তো মিতা।'

'চেষ্টা করেই দেখো না।'

ঘন্টা বাজার পর এগিয়ে গেল মিতাই।

'তোমার নাম শিউলি?'

'হ্যাঁ, তোমার?'

'মিতা।'

'তোমরা বুঝি ওই পুরনো জমিদার বাড়িটা কিনেছো?'

'হ্যাঁ। খুব সুন্দর না বাড়িটা?'

'সুন্দর না ছাই। ক'দিন গেলেই বুঝতে পারবে।'

ঠোঁট বেকিয়ে বললো শিউলি। মুখ কালো করে চলে এলো মিতা। মেয়েটা আসলেই হিংসুটে। ওরা জমিদারবাড়ি কিনেছে বলে হিংসা করছে। মনে মনে রাগ হলো মিতার।

'তোমরা আমাদের বাসায় খেলতে এসো, কেমন?' চম্পা, শেলীদেরকে বললো মিতা।

খুব চতুরভাবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো ওরা। ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না মিতা।

'না, ভাই। অতদূরে মা যেতে দেবে না। তারচে তুমিই বরং এসো আমাদের বাসায়।'

'বারে। আমার বুঝি দূর হবে না?'

'তাহলে সাগরের ধারে আম বাগানে খেলবো আমরা, কেমন?'

'তা না হয় হলো। তাই বলে আমাদের বাসায় আসবে না কেন?'

চোরা চোরা মুখে হাসলো শেলী। কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

ক্লাশে প্রথম দিনটা ভালোই কাটলো মিতার। বাসায় ফিরতেই মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, কেমন লাগলো স্কুলে।'

'খুব ভালো। জানো, আম্মু, এখানে আপা, স্যাররা না খুব ভালো। একদম বকে না। শেলী, চম্পা, চিত্রা এরাও খুব ভালো।'

'এরি মধ্যে এতো বন্ধু জুটে গেছে?'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ কি মনে পড়লো, বললো, 'কালকে জুলেখাকে স্কুলে নিয়ে যাবো, আম্মু। আজকে মনেই ছিলো না।'

'কথা শোনো ধাড়ি মেয়ের। ক্লাস ফাইভের মেয়ে পুতুল নিয়ে স্কুলে গেলে হাসাহাসি করবে না সবাই?'

'করলে করবে। আমি ওদের ধার ধারি নাকি?'

হাত মুখ ধুতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো

মিতা। মাজেদা বেগম খুশি হয়েছেন যে মিতার স্কুল ভালো লেগেছে। চট্টগ্রাম শহরের স্কুলের কথা মনে পড়লো তার। কয়েকটা মেয়ে, 'পা[illegible] [illegible]য়ে' বলে খুঁচিয়ে প্রায় পাগল বা[illegible] [illegible]লেছিল মিতাকে।

সেই ভয় এখনো কাটেনি তার। [illegible]খা-নে কেউ যদি আবার জে[illegible] [illegible] তাহলে? মেয়ের মায়াভরা [illegible]টা ম[illegible] হতেই বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠলো। বারো বছর পর তার নিজের সন্তান আসছে।

সহ্য করতে পারবে তো মিতা? নাকি নিজেকে অবহেলিত মনে করবে? মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না তো? অজানা আশঙ্কায় মুখটা মলিন হয়ে গেল তার।

হাজার হোক মিতাই তাদের প্রথম সন্তান।

বিকেলবেলা হাঁটতে বেরুলো মিতা। উত্তর দিকে চট্টগ্রামের রাস্তা। সেদিকে গেল না সে। পুব দিকে সাগর। ওদের বাসা থেকে প্রায় চারশো গজ দূর হবে।

সরু পায়ে চলা পথ। কিছুদূর হাঁটতেই গোরস্তানটা চোখে পড়লো মিতার। অনেক পুরনো লাল ইঁটের নিচু দেয়াল। পলেস্তারা খসে পড়েছে। ঝোপঝাড়, লজ্জাবতী লতায় ভর্তি। সিমেন্ট আর মার্বেল পাথরে ঘেরা কবরগুলো প্রায় দেখাই যায় না। কয়েকটা হেডস্টোন খুব উঁচু। ত্রিশ চল্লিশটার মতো কবর। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো মিতা।

ভেতরে ঢোকার ইচ্ছা হলো ওর। কিন্তু একটু ভয় ভয়ও লাগছে। আম বাগানটা নজরে পড়লো ওর। কবরস্তানের পাশেই।

দোলনায় দুলছে একটা ছোটো ছেলে। আরেকটা মেয়ে ধাক্কা দিচ্ছে পাশে দাঁড়িয়ে। মিতার চেয়ে ছোটোই হবে মেয়েটা। ছেলেটা আরো ছোটো।

এগিয়ে গেল ওদের দিকে মিতা।

দাঁড়িয়ে রইলো দোলনার পাশে।

'তুমি দোলনায় ঝুলবে?' ছোট্ট ছেলেটা বললো। খুব মিষ্টি চেহারা ছেলেটার।

ইস্। এ রকম যদি একটা ভাই থাকতো আমার। ভাবলো মিতা। মনটা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। নিজের বাবা-মারই খবর নেই। আবার ভাই।

দোলনা থেকে নেমে এসে হাত ধরে ওকে টানছে ছেলেটা। 'তুমি খেলবে? তাহলে এসো।'

'তোমার নাম কি?'

'টুনু। ওর নাম বিলু।' মেয়েটাকে দেখালো টুনু।

খুশিভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। কিন্তু কিছু বলছে না। আবার কথা বললো টুনু। 'বিলু কথা বলতে পারে না।'

'তোমার বোন, না?'

'হ্যাঁ।'

দোলনায় তুলতে গিয়ে হাত থেকে ফসকে নিচে পড়ে গেল মিতার পুতুলটা। চম্পাকে দেখতে পেলো সে। আম বাগানে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কি. তোমার পুতুল। খুব সুন্দর তো।'

চম্পার কাছ থেকে নিয়ে নিলো পুতুলটা মিতা। 'এইটা আমার বন্ধু।'

'কোত্থেকে কিনেছো?'

'পেয়েছি। আমাদের নতুন বাসার দোতলায়,' খুশিভরা কণ্ঠ মিতার।

সন্দেহভরা চোখে চাইলো চম্পা। 'আগে থেকেই ছিলো ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'পুতুলটা ফিরোজার ছিলো। আমি দেখেছি ওর কাছে। এটা ফেলে দিও। ভালো না পুতুলটা,' বিরসমুখে বললো চম্পা।

'এত্তবড় পুতুলটা ফেলে দেবো, না?'

'নইলে ফিরোজার মতো তুমিও মরবে।'

চম্পার উপর রাগ হলো মিতার। এসব কথার মানে কি? 'মরবো মানে?'

'তোমাদের বাসায় আগে থাকতো ফিরোজা। দুদিন পুতুলটা দেখেছিলাম ওর কাছে। তারপরই তো ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল ও। হাতে তখন এটা ছিলো।'

'ধ্যাৎ।'

'চলো ওই দিক থেকে ঘুরে আসি। শেলীদের বাসা না ওটা?'

'চলো।'

টুনুদের রেখে হাঁটতে লাগলো ওরা। শেলীকে দেখা গেল ওদের বাসার বারান্দায়। মিতাদের সাথে যোগ দিলো সেও।

'এখানে এসে অনেক বন্ধু হলো আমার। সবচেয়ে আগে বন্ধু হয়েছে জুলেখা।' বুকে চেপে ধরলো মিতা জুলেখাকে।

'কে?' অবাক হলো শেলী।

'জুলেখা।' পুতুলটাকে দেখালো মিতা।

বিস্মিত চোখে চম্পার দিকে চাইলো শেলী।

'এই নামটা তুমি কোথায় পেলে?'

'মনে হলো, তাই দিলাম। একটু পুরনো ধরনের তো পুতুলটা।'

'কেউ বলেনি তোমাকে?' চোখ আরো বড় হলো শেলীর।

'নাহ্।'

মিতাকে এড়িয়ে আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো ওরা। কিছু একটা কথা বিনিময় করলো চোখে চোখে।

'এসো আমার সঙ্গে।'

মিতাকে টানতে টানতে কবরস্তানের দিকে নিয়ে গেল শেলী। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, বুঝতে পারছে মিতা। সেও কোনো কথা না বলে ওদের সাথে ঢুকলো গোরস্তানে।

একটা অনেক পুরনো কবরস্তানের

কাছে এলো শেলী। ঝুঁকে পড়ে দেখলো কিছু একটা। তারপর ঘাস, লতাপাতা হাত দিয়ে সরিয়ে একটা জীর্ণ হেডস্টোন বের করলো। খোদাই করা সিমেন্টে ছোট্ট করে লেখা, 'জুলেখা।'

আর কিছুই লেখা নেই। কবে জন্ম, কবে মৃত্যু, বাবা-মার নাম, কিছুই নেই।

মিতা কিছু বুঝতে পারলো না। শেলী আর চম্পা বিচিত্র এক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু ঘাবড়ালো না মিতা।

'চলো আমবাগানে গিয়ে খেলি।'

কিন্তু শেলী আর চম্পার মধ্যে খেলার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না।

বেশ কয়েকবার মিতাকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো ওরা।

স্কুলে শিউলির সাথে ছোটখাট একটা ঝগড়াই হয়ে গেল মিতার। কোথা থেকে যেন শুনেছে সে মিতা বাবা-মার পালিতা মেয়ে। এতিমখানায় ছিলো। সেটা ধরেই খোঁচা দিলো সে। 'তুমি তো আহাদ সাহেবের মেয়ে না। এতিমখানায় ছিলে। তুমি আমাদের সাথে খেলবে না।'

রাগ চেপে রাখতে পারলো না মিতা। শেলী আর চম্পার দিকে তাকালো সে। নতুন খবরটা শুনে ওদের মুখেও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। আরো কয়েকজন তাকিয়ে আছে এই দিকে।

'খবরদার, বাজে কথা বলবে না। আমি তো আব্বু-আম্মুরই মেয়ে।'

'বাড়িতে থাকলেই মেয়ে হয় না।' বিদ্রূপ ঝিলিক দিচ্ছে শিউলির চোখে।

অসহায় বোধ করছে মিতা। শেলীরাও কিছু বলছে না। মিতা জানে শিউলি সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু আব্বু-আম্মু এতো আদর করে ওকে। ওরাই তো তার বাবা-মা। হঠাৎ কান্না পেলো মিতার।

শেলী থামিয়ে দিলো শিউলিকে। 'বেশি প্যাটপ্যাট করো তুমি। এসব নিয়ে তোমার কথা বলার কি দরকার?'

বাসায় ফেরার সময় কেমন জ্বর জ্বর বোধ করলো মিতা। শরীর খারাপ লাগছে বলে আপার কাছ থেকে এক ঘণ্টা আগেই ছুটি চেয়ে নিয়েছে।

সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটে আসছে মিতা। একা। মন খুব খারাপ। শিউলি, শেলী, চম্পা, সবার ওপর রাগ হচ্ছে তার। কচুর স্কুল। আর যাবে না সে ওখানে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সমুদ্রের দিকে চাইলো কয়েকবার। ফিকে হয়ে আসছে রোদ। কয়েক মিনিটের মধ্যে কুয়াশায় ঢেকে গেল চারদিক।

কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছে মিতা। কুয়াশায় পথ ঘাট কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

একটা হালকা ছায়ার মতো আবছা দেখতে পেলো মিতা। কালো ফ্রক পরা একটা মেয়ে হেঁটে আসছে যেন এদিকে। কুয়াশার ঘন পর্দা ভেদ করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না মিতা।

গন্ধটা হঠাৎ করেই চিনতে পারলো সে। কর্পূরের গন্ধ।

আন্দাজে পা ফেলতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেললো মিতা। জ্বরের ঘোরে বুঝতে পারলো না কি ঘটতে যাচ্ছে। হালকা ছায়াটা বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই উপর থেকে নিচে পড়লো মিতা।

বাতাসে তখন সমুদ্রের বুনো গর্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

বিলুই প্রথম দেখলো। মিতার জ্ঞানহীন দেহটা। বোবা বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো উঁচু রাস্তা থেকে। নিচে কয়েকটা পাথরের ওপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে সেই একটু আগে দেখা মেয়েটা।

আহাদ সাহেব থরথর করে কাঁপছেন। বিলুর দুর্বোধ্য চিৎকারে কয়েকজন লোক জুটে গিয়েছিল। তারাই ধরাধরি করে মিতাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

যতোটা ভয় করেছিলেন ততোটা ক্ষতি হয়নি। বাম পায়ের হাড়ে ফ্রাকচার হয়েছে। গ্রীনস্টিক ফ্র্যাকচার।

'আল্লার রহমত, মাজেদা। মিতা ভয়েই জ্ঞান হারিয়েছিল। চিন্তার কিছু নেই।'

মাজেদা বেগম নির্বাক হয়ে রইলেন। এক্সরে রিপোর্টটা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তারা। মিতা শুয়ে রইলো বিছানায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে।

রশীদ চেয়ারম্যানের বউ খবরটা শুনে সন্ধ্যার দিকে আহাদ সাহেবের বাড়িতে এলেন।

'এইমাত্র শুনলাম খবরটা। আহা হা। আসতে না আসতেই কি একটা বালা মসিবত।'

'আগেই বলেছিলাম পাহাড় পর্বতের কাছে বাড়ি কিনে কাজ নেই, উনি শুনলেন না।'

'পাহাড় পর্বতের দোষ নয়, ভাবী, তবে বাড়িটা একটু দেখে শুনে কিনলেই হতো।'

'এই বাড়িটা তো ভালোই। একটু বেশি বড় অবশ্য।'

'রাতে একা বাইরে যাবেন না, ভাবী। উঠোনের গাছপালাগুলো অনেক পুরনো তো। সাবধান থাকা ভালো।'

'কেন?'

'না, পোয়াতী মেয়েদের একটু সাবধান থাকা ভালো।'

'ও,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন মাজেদা বেগম।

খারাপ কিছু শুনবেন ভেবেছিলেন। বাড়িটা তার নিজেরই এখন আর ভালো লাগছে না। মিতার পাটা ভাঙলো এখানে আসার জন্যেই তো।

জ্বরের ঘোরে মাথা এপাশ ওপাশ করছে মিতা। চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে আছে মায়ের মুখের দিকে। অপরিচিত আরেকজনকে দেখতে পেলো পাশে। রশীদ চেয়ারম্যানের বউ।

'আমি চম্পার মা। কেমন আছো মিতা?'

উত্তর দিলো না মিতা। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, 'জুলেখা কোথায়?'

'কাকে খুঁজছে?'

'জুলেখা। ওর পুতুলের নাম।'

কথাটা এখানেও ছড়িয়ে গেছে। 'মিতা আপনার পালিতা মেয়ে নাকি?' আস্ত পানটা গালে পুরে জিজ্ঞেস করলেন রশীদ গিন্নী।

'নিজের মেয়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসি আমরা ওকে,' বলেই হেসে ফেললেন মাজেদা বেগম। এ ব্যাপারে আর কিছু বলতে চান না।

'এই পুতুলটা কোথায় পেলেন?' প্রায় চমকে উঠলেন রশীদ গিন্নী। প্রাচীন চেহারার পুতুলটা এতক্ষণে চোখে পড়েছে তার। টেবিলের ওপর নির্ণিমেষ দাঁড়িয়ে আছে।

'আমার মেয়েই ওটা খুঁজে বের করেছে। দোতলার দেয়াল আলমারির ভেতর ছিলো।'

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না রশীদ গিন্নী। কাদের খানের একমাত্র মেয়ে ফিরোজা দোতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে মারা যাবার পর তার বউ নিজে চুলোর আগুনে পুড়িয়ে ছাই করেছিলেন এটাকে।

ফিরে এসেছে পুতুলটা।

শিরশির করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে

গেল মেরুদণ্ড দিয়ে। এরই নাম জুলেখা। নামটাও কেমন যেন। কোথায় যেন শুনেছেন আগে। আর দেরি করলেন না।

'আজ উঠি, ভাবী। কোনো চিন্তা করবেন না। মিতা ভালো হয়ে উঠলে আমার বাসায় বেড়াতে যাবেন কিন্তু।'

কার নিয়ে এসেছিলেন রশীদ গিন্নী। স্টার্ট দিচ্ছে ড্রাইভার গাড়িতে। সদর দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তাকে মাজেদা বেগম।

রশীদ আহমেদ বাড়িতেই ছিলেন। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন তার স্ত্রী।

'ওগো শুনছো?'

'কি ব্যাপার, চম্পার মা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ রশীদ সাহেব।

'কাদের সাহেবের মেয়েটা মারা যাবার সময় একটা পুতুল নিয়ে তার বউ খুব হৈ চৈ করেছিলেন, তোমার মনে আছে?'

'না তো। কোন্ পুতুল?'

'ফিরোজা সারাদিন ওটা নিয়েই থাকতো। শেষের দিকে বিড়বিড় করে নাকি আলাপও করতো ওটার সাথে।'

'তো কি হয়েছে? বাচ্চা মেয়েরা এটা করতেই পারে।'

'আরে না। গভীর রাতে ওই পুতুল হাতে নাকি ছাদে ঘুরে বেড়াতো ফিরোজা। ফরিদা ভাবীর ধারণা পুতুলটাই ধাক্কা মেরে তার মেয়েকে দোতলা থেকে ফেলে দিয়েছিল। ফিরোজা মারা যাবার পর চুলোর আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন উনি সেটাকে।'

'ব্যস, চুকে গেল।' মুচকি হাসি রশীদ সাহেবের ঠোঁটে।

'ওই পুতুলটা ফিরে এসেছে,' ফিস-ফিস করে বললেন রশীদ গিন্নী।

'তার মানে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল রশীদ সাহেবের।

'এইমাত্র আমি নিজে দেখে এলাম। মিতার পড়ার টেবিলে সাজানো রয়েছে ওটা।'

'ওরকম পুতুল আরো থাকতে পারে।'

'না। দোতলায় দেয়াল আলমারির ভিতর পেয়েছে ওটাকে মিতা। তাছাড়া অদ্ভুত একটা পুতুল। আমাদের দেশে এ রকম তৈরি হয় না।'

'আমি তো এর মধ্যে কোনো রহস্য দেখি না।'

'কি নাম রেখেছে জানো? জুলেখা।' তুরুপের তাসটি টেবিলে রাখলেন রশীদ গিন্নী।

'তাই নাকি?' এবার আর কণ্ঠে হালকা সুরটি নেই।

'আসতে না আসতেই পা ভাঙলো মেয়েটা। দেখো আরো কত কি হয়।'

চুমকির কাজ করা শাড়ির মতো লাগছে সমুদ্রকে। দুপুরের খর রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। কুসুমপুরের সবুজ প্রকৃতিতে যেন আনন্দের শিহরণ জেগেছে।

সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে মিতা। পায়ের ব্যথাটা এখন আর নেই। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আর কখনো হাঁটতে পারবে কিনা জানে না সে। স্কুলে যেতে চায়নি ও। কিন্তু মাজেদা বেগম বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠিয়েছেন।

বিষণ্ণ হয়ে আছে মিতার চেহারা। ডাইনে দূরে তাকিয়ে দেখতে পেলো গোরস্তানের পাশের আম বাগানে এককা দোককা খেলছে তিনটে মেয়ে। বিলুকে চিনতে পারলো।

ও কি আর কোনোদিন ওদের মতো

(১২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অ্যানিমেশন কার্টুন

সাদেকুল আজিজ

অ্যানিমেটেড কার্টুন ছবির ইতিহাসে কোন্ ছবিটা সবচাইতে বেশি খ্যাতি পেয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে নিঃসন্দেহে বলা যায় ওয়াল্ট ডিজনী নির্মিত 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্ফস' ছবিটির কথা। ছোটবেলায় রাজকন্যা আর সাত বামনের রূপকথা শোনেনি এমন লোক বোধহয় কমই পাওয়া যাবে। কালজয়ী সেই রূপকথাটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেয়া হয়েছে বহুবার। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছে এই 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্ফস'। তিরাশি মিনিটের এই কার্টুন চলচ্চিত্রটি হলিউডের শ্রেষ্ঠ সবাক চলচ্চিত্র গুলির অন্যতম। এটিই একমাত্র ছবি যা একসাথে প্রদর্শিত হয়েছে বিশ্বের ষাটটি দেশে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে এর—পঞ্চাশ বছরে সাতবার মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এ পর্যন্ত ছবিটা সারাবিশ্বে প্রায় পাঁচশো

মিলিয়নেরও বেশি লোক দেখেছে। এতগুলো রেকর্ড দেখেই বোঝা যায় কি অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই অ্যানিমেটেড কার্টুন ছবিটি।

এই ছবির নির্মাণ ইতিহাস শুরু হয় ১৯৩৪ সালে। আগেই বলেছি, ওয়াল্ট ডিজনী ছিলেন ছবির নির্মাতা। ১৯৩৪-এ যখন তিনি তার 'মিকি মাউজ', 'সিলি সিমফনি', 'থ্রি লিটল পিগস', 'গুফি' ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত—তখন তিনি হাত দেন এই ছবির কাজে। স্বল্প দৈর্ঘ্যের কার্টুন এর আগেও তৈরি করেছেন ডিজনী—কিন্তু তাতে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেননি। টাকার দরকার তখন ডিজনীর, টাকার জন্য ছোটভাই রয়-এর সাথে তার পার্টনারশিপ ভেঙে পড়ার অবস্থা তখন। কাজেই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, আর্থিক সংকট নিরসনের জন্য পূর্ণ দৈর্ঘ্য কার্টুন চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন।

ক্যানসাস সিটিতে থাকতে ছোটবেলায় নির্বাক স্নো হোয়াইট দেখেছিলেন ডিজনী। এই রূপকথার কাহিনীটাই তাঁর পছন্দ হলো। সেই যে, সৎ মা রানীর ষড়যন্ত্রে রাজকন্যা স্নো হোয়াইট বনে গিয়ে জল্লাদের হাত থেকে রেহাই পায়, তারপর আশ্রয় পায় সাত বামনের কাছে। সেখানেই একদিন হাজির হয় সেই সৎমা, আসলে যে একটা ডাইনী। বিষাক্ত আপেল খাইয়ে মেরে ফেলে স্নো হোয়াইটকে। বনের মধ্যে কাঁচের কফিনে শুইয়ে রাখে তাকে বামনেরা। তারপর একদিন এক রাজপুত্র এসে তাকে জীবিত করে তোলে। সব মিলিয়ে কার্টুন ছবির জন্য সব মাল মশলাই এতে পেলেন ডিজনী। রাজকন্যা আর রাজপুত্রের প্রেম, আশ্রয় দানকারী সাত বামনের হাস্য কৌতুক তো থাকছেই সেই সাথে কাহিনীকে নাটকীয় করার জন্য থাকছে ডাইনী বুড়ি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ওয়াল্ট ডিজনী, এই কাহিনী নিয়েই তিনি তৈরি করবেন কার্টুন ছবি।

সবাই হেসে উড়িয়ে দিলো তাঁর কথা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যানালিস্টরা এই পরিকল্পনাকে ডিজনীর মূর্খতা ভাবলেন। তাদের ধারণা ছিলো দর্শকরা ছবি শেষ হবার আগেই হল ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু ওয়াল্ট তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস, ছবিটা তাকে সাফল্য এনে দেবেই। একদিন রাতে তিনি তার চল্লিশজন আর্টিস্টকে জড়ো করলেন রেকর্ডিং স্টেজে। ঘন্টার পর ঘন্টা স্নো হোয়াইটের কাহিনীর উপর লেকচার দিলেন তিনি। বোঝালেন প্রতিটি ঘটনা, চেনালেন প্রতিটা চরিত্র। সবশেষে জানালেন এটাই হবে তাঁর প্রথম অ্যানিমেটেড ফিচার। কুশলীরা অবাক হলো ডিজনীর এ কথা শুনে। কারণ, একটা শর্ট কার্টুন তৈরি করা যখন এতো কষ্ট—আর এটাতো পূর্ণ দৈর্ঘ্য। তবু তাঁর কথায় উদ্দীপনা পেলো সবাই, কোমর বেঁধে লাগলো ছবি তৈরির কাজে।

প্রথমেই আসে সাত বামনের কথা। সাতজন বামন রাজকন্যার দুঃসময়ের বন্ধু, ওদের হাস্য রসাত্মক কাজকর্মই মাতিয়ে রাখে দর্শকদের। কিন্তু মুশকিল হলো, গল্পে এদের কোনো নাম নেই। আর, চলচ্চিত্র বলেই সাতজনের নাম দিতে হবে। এর আগে কোনো বই বা ছবিতে এদের নাম ছিলো না। ডিজনীই তাঁর ছবিতে সর্বপ্রথম নাম দিলেন সাত বামনের। এই সাত জনের নাম হচ্ছে—ডক (Doc), ডোপি (Dopey), স্লিপি (Sleepy), স্নিজি (Sneezy), হ্যাপি (Happy), গ্রাম্পি (Grumpy), ব্যাশফুল (Bashpul)। গল্পে বর্ণিত সাত জনের চেহারা সুরৎ যেহেতু একই ধরনের তাই ছবিতে তাদের আলাদা করে চেনার জন্য রয়েছে তাদের নাম, আচার আচরণ আর কথা বলার ভঙ্গি। এজন্যই বামন

দের সর্দারদের নাম দিলেন ডিজনী—'ডক', ডক্টরের অপভ্রংশ। যুক্তি দেখালেন তিনি, তাঁর চেনামতে কিছু ডাক্তার আছেন যারা নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করেন। ছবিতে ডক কে এমন ভাবে দেখানো হলো—যেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকে দু পায়ের উপর দৃঢ় ভাবে, হাত দুটো থাকে পেছনে—ঠিক যেন সর্দার সর্দার ভাব। গ্রাম্পি কে দেখান হলো একটু কুঁজো করে। স্নিজির স্বভাবই হলো হ্যাঁচ্চো দেয়া। যে সময়টুকুতে সে হ্যাঁচ্চো দেয় না—সে সময়টুকুতে স্নিজিকে অত্যন্ত দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে দেখান হয়।

স্নিজির গলার স্বর নেপথ্যে দেয়ার জন্য এলেন হলিউডের বিখ্যাত কমেডীয়ান বিলি গিলবার্ট—যিনি তাঁর বিখ্যাত 'হ্যাঁচ্চো' অন্যান্য ছবিতেও প্রয়োগ করে বিখ্যাত হয়েছেন। স্লিপি আর গ্রাম্পির জন্য নেপথ্যে কণ্ঠ দিলেন পিন্টো কোলভিগ। হ্যাপি, ব্যাশফুল আর ডকের জন্য নেপথ্যে কণ্ঠ দিলেন যথাক্রমে ওটিস হারলান, স্কটি ম্যাটর্'র, আর রয় অ্যাট ওয়েল। তাঁরা সবাই চরিত্রাভিনেতা। বাকি থাকলো শুধু ডোপি। ছবিতে দেখা যায় হ্যাপি, স্নো হোয়াইটকে ডোপির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এই ভাবে, 'এই হচ্ছে ডোপি। কারো সাথে কথা বলে না ও।'

বিস্মিত স্নো হোয়াইট যখন জানতে চায় ডোপি বোবা কিনা, তখন হ্যাপি জানায়, 'আসলে কথাই বলতে শেখেনি ও। মানে, কোনদিন চেষ্টা করে দেখেনি কথা বলতে।'

কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ডিজনী, ডোপিকে দিয়ে কথা বলানো হবে না। মৌনতা হবে ওর বৈশিষ্ট্য।

এবার আসে রাজকন্যা স্নো হোয়াইটের পালা। যেহেতু নায়িকা, তাই তার গলা মিষ্টি আর সুরেলা হওয়া চাই। এ ব্যাপারে ডিজনী শরণাপন্ন হলেন হলিউডের বিখ্যাত ভয়েস কোচ গিডো ক্যাসেলোটির। গিডোকে কিছু করতে হলো না, তাঁর মেয়ে অ্যাড্রিয়ানাই এগিয়ে এলো এ-ব্যাপারে। অ্যাড্রিয়ানার সুন্দর গলার স্বরই তাকে পাইয়ে দিলো স্নো হোয়াইটের চরিত্রটা। রাজপুত্রের গলার জন্য নেপথ্যে কণ্ঠদানকারী হিসাবে বাছাই করা হলো সফল ব্রডওয়ে অভিনেতা হ্যারি স্টক ওয়েল কে। বাকি রইলো একটা দ্বৈত চরিত্র শয়তান রানী, যাদুর পরশে যে কিনা ডাইনীতে পরিণত হয়, তার চরিত্রকে ডিজনী সাজালেন অনেকটা লেডী ম্যাকবেথ আর বিগ ব্যাড উলফের ধাঁচে। বাইরে সুন্দরী হলেও ভিতরে ভয়ঙ্কর এই খল চরিত্রটির জন্য নেপথ্যে কণ্ঠ দিলেন অভিনেত্রী লুসিল লা ভার্ন। গলার স্বর দু'রকম করতে পারতেন তিনি। স্বাভাবিক গলা দিয়ে রানীর চরিত্র ফুটিয়ে তোলা ছাড়াও লুসিল তাঁর ভীতিপ্রদ কর্কশ গলার স্বর দিয়ে রানীর আরেকটি রূপকে যথার্থ ভাবেই রূপায়িত করলেন।

এরপর আরেকটা আকর্ষণ রাখা হলো ছবির জন্য। গান—যে গান শুনে চমৎকৃত হবে দর্শকরা। গীতিকার ফ্র্যাঙ্ক চার্চিল আর ল্যারী মোরী রচিত আটটি গান ছবির জন্য বাছাই করলেন ডিজনী। এদের মধ্যে রয়েছে 'আই অ্যাম উইশিং,' 'হুইস্‌ল হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক,' 'হাই হো' আর 'সাম ডে মাই প্রিন্স উইল কাম'।

ওয়াল্ট ডিজনীর অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা মিলিয়ে ভালোই এগিয়ে চললো ছবির কাজ। এরই মধ্যে একদিন তিনি কয়েকজন লোকের সাথে ছুটির দিন বেরোলেন ঘোড়ায় চেপে। সপ্তাহান্তের দিনে দুপুরবেলায় তাঁরা যে ডরমেটরীতে থাকলেন, সেখানে ডিজনীর ঘুম হলো না। কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর সঙ্গীরা দিবানিদ্রাকালে নাক ডাকাচ্ছিলেন। ঘুম না এলেও

ডিজনীর মাথায় এলো নতুন প্ল্যান। প্রত্যেক সঙ্গীর নাক ডাকানো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন তিনি। সোমবার ফিরে এসেই তাঁর ছবির কাহিনীকারদের নির্দেশ দিলেন তিনি। ছবির যে সিকোয়েন্সে সাত বামন স্নো হোয়াইটকে নিজেদের শোবার ঘর দেখিয়ে দিয়ে ঘুমুতে যায়, সেখানে কিছু যোগ করবেন তিনি। দৃশ্যটাতে দেখা যাবে সাতজন বামন সাত রকম কায়দায় নাক ডাকায়। ওয়াল্টের ভাষায়—'সাত রকমের নাক ডাকানি মিলে একটা সিমফনি তৈরি করবে।' পরিকল্পনা মাফিক কাজ চললো। তাই ছবিতে দেখা যায়, গ্রাম্পির অবস্থা ঠিক ওয়াল্টের মতোই—অন্যের নাক ডাকানির জ্বালায় ঘুমুতে পারে না। স্ন্যাপের বাটিতে শুয়ে অন্যদের দেখে ও। ব্যাশ-ফুল শোয় একটা ড্রয়ারে। নিচু গোঙানির স্বরে নাক ডাকায় সে। কাপবোর্ডে শুয়ে হুইসেলের মতো শব্দ করে নাক ডাকায় হ্যাপি। ডকের শয্যা একটা সিঙ্ক। ঘুমানোর সময় ওর খোলা মুখে টপটপ করে পানি পড়ে। ফলে নাক ডাকলে মনে হয় গার্গল করছে। স্লিজি নাক ডাকায় মশার প্যানপ্যানানির মতো শব্দ করে। আর ডোপির নাক ডাকানোর শব্দটা আসলে বেহালার E স্ট্রিং এর শব্দ।

এছাড়াও প্রতিটা বামনকে আলাদা চেনার জন্য ছিলো তাঁদের হাঁটার কৌশল। এই ছবির একজন অ্যানিমেটর ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক টমাস। তাঁর অ্যানিমেট করা একটা দৃশ্যতে দেখা যায় ডোপি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হোঁচট খায় পরমুহূর্তে সামলে নেবার জন্য পা টেনে নেয়। ভঙ্গিটা পছন্দ হলো ওয়াল্ট ডিজনীর। মত দিলেন পুরো ছবিটাতে ওভাবেই হাঁটবে ডোপি—ওটাই তার হাঁটার স্টাইল। যদিও আগের অংশে ডোপির হাঁটার কায়দা আলাদা তবু ডিজনী নতুন করে অ্যানিমেট করালেন ঐ দৃশ্যগুলো। শুধু একবারই নয়, এমন বহুবার করেছেন ডিজনী ছবি তৈরির সময়। হয়তো কোনো আইডিয়া এলো মাথায়—সাথে সাথে সেটা কাজে লাগালেন তিনি।

ছবির আরেকজন অ্যানিমেটর ছিলেন শ্যামুস কালহ্যান। যে দৃশ্যটাতে দেখা যায় বামনরা ফিরছে তাদের মুক্তার খনি থেকে 'হাই হো' গানটা গাইতে গাইতে, সে দৃশ্যটাকে অ্যানিমেট করেছিলেন তিনি। পুরো দৃশ্যটা তৈরি করতে ছমাস সময় লেগেছিল তাঁর, আঁকতে হয়েছিল দুই হাজার ছবি। আর পুরো ছবিটার জন্য আঁকতে হয়েছিল দুই মিলিয়ন ছবি। শ্যামুস আর তাঁর সহযোগী নিক ডিটোলীর অক্লান্ত পরিশ্রমে যখন ছত্রিশ ইঞ্চি লম্বা ড্রয়িং-এ ভরে উঠছে শেলফগুলো, তখনই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। অসাবধানতা বশতঃ ডিটোলীর হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে যায় একগাদা স্তূপীকৃত বাতিল ড্রয়িং এর উপর। ব্যস, লাফিয়ে উঠলো আগুনের শিখা। মুহূর্তের ব্যবধানে এক শেলফ থেকে অন্য শেলফে ছড়িয়ে পড়লো আগুন। ডিটোলী তাড়াতাড়ি ভেজা তোয়ালে দিয়ে কোনমতে আগুন নেভালেন। কিন্তু ততক্ষণে কিছু ছবির মূল ড্রয়িং-এর সোয়া ইঞ্চির কাছাকাছি পুড়ে গেছে। তবু কোনোটাই এতো খারাপ হয়নি, যে অ্যানিমেট করানো যাবে না। এ যাত্রা রেহাই পেয়ে গেল 'হাই হো' গানের দৃশ্য। হয়তো সিকোয়েন্সটা বাদই দিতে হতো, তবু রক্ষা পেলো কোনোমতে।

ওদিকে আরেক ফ্যাসাদ। ডিজনীর টাকা পয়সা ফুরিয়ে আসছে তখন। ছবি শুরুর সময় ধার্য পাঁচ লাখ ডলারের বাজেট ইতিমধ্যেই দু'বার ডাবল হয়েছে। ব্যাংক ওয়ালারাও লোন দিতে নারাজ—তাঁরা আগে দেখতে চান কি করতে পেরেছেন ডিজনী এ পর্যন্ত।

আবারো ডিজনীকে বলতে হলো ছবির

কাহিনীর অংশ বিশেষ। ব্যাংক মালিক-দের বোঝালেন, লোনটা না পেলে স্নো হোয়াইটকে বিষাক্ত আপেল খাওয়ানো কিংবা, রাজপুত্রের চুম্বনে স্নো হোয়াই-টের পুনর্জীবন লাভ—এই গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য-গুলি চিত্রায়িত করতে পারবেন না তিনি, ছবিটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শেষ পর্যন্ত লোন পেলেন ডিজনী, এবং ছবিটাও তৈরি হলো। ১৯৩৭ সালে মুক্তি পেলো 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্ফস'। আর এটাই এনে দিলো ডিজনীকে ব্যবসায়িক সাফল্য আর অর্থ—যা না থাকলে হয়তো আজ কোনো ডিজনী স্টুডিও থাকতো না।

পুরো ছবি বানাতে লেগেছিল দেড় মিলিয়ন ডলার।

১৯৩৯ এ এই ছবিটাই ওয়াল্ট ডিজনী-কে এনে দেয় একাডেমী পুরস্কারের গৌরব। বড় একটা অসকারের সাথে সাতটা ছোটো ছোটো অসকার পেলেন তিনি। সাতটা মিনিয়েচার অস্কার তাঁকে দেয়া হয় চমৎকার বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান তৈরি করে দর্শকদের আনন্দ দান আর মোশন পিকচারের জগতে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত করার জন্য।

এই অ্যানিমেশন কার্টুন ছবিটি রয়েছে অলটাইম বক্স অফিস হিট হিসাবে। পুরোবিশ্বে প্রদর্শিত হয়ে লাভ হয়েছে তিনশো ষাট মিলিয়ন ডলার। টাকাটা বড় কথা নয়, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এ ছবি আজ এক ইতিহাস। একটা স্মৃতি। চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক।

১৯৩৭ সালে ছবিটার মুক্তির সপ্তাহে 'টাইম' পত্রিকা একটা কভার স্টোরি প্রকাশ করে স্নো হোয়াইটের ওপর। প্রতিবেদনে লেখা ছিলো, Snow white is a combination of Hollywood, the Grim brothers, and the sad searching fantasy of universal childhood. It is an authentic, masterpice, to be shown and loved by new generations long after the current crop of Hollywood stars are sleeping where no princes kiss can awaken them. □

কোপাকাবানা হোটেলে গিয়ে উঠলো লোকটা। থাকলো মাত্র কয়েকদিন। তারপর জীপে চড়ে হারিয়ে গেল আন্দিজ পর্বতমালার পূর্বদিকের ঢালের গহীনে, প্রায় জনমানব শূন্য জঙ্গলে।
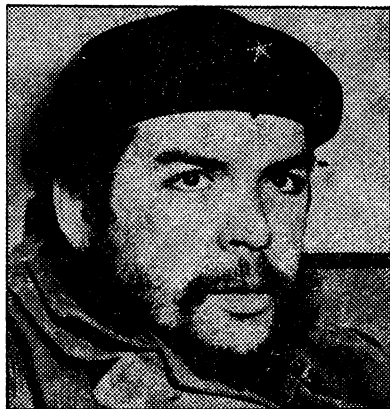
চে গুয়েভারার শেষ দিনগুলো

কবির আশরাফ

লোকটা যখন লা পাজ শহরে এসে পৌঁছুলো, কেউ তাকে খেয়াল করেনি। ১২০০০ ফুট উপরে বলিভিয়ার শান্ত, শীতল রাজধানী শহরের কর্তৃপক্ষ জানতেই পারলো না তাঁর কথা।

দেখলে মনে হয় মধ্যবয়সী ব্যবসায়ী। ছোটোখাটো, টেকো মানুষটি। চোখে হর্নরিমড চশমা, মুখে লম্বা পাইপ। সঙ্গে উরুগুয়ের পাসপোর্ট। কোপাকাবানা হোটেলে গিয়ে উঠলো সে। কিন্তু থাকলো মাত্র কয়েকদিন। তারপর একটা জীপে চড়ে সে হারিয়ে গেল আন্দিজ পর্বতমালার পূর্বদিকের ঢালের গহীন, প্রায় জনমানবশূন্য জঙ্গলে। এতোদিন পরে আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত সে। সামনে অনেক ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাস। এ

ভাবে বলিভিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন কমিউনিস্ট বিশ্বের নেতৃস্থানীয় গেরিলা, কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর ডান হাত, আর্নেস্টো চে গুয়েভারা। বিশ মাস আগে হঠাৎ করে তিনি কিউবা থেকে উধাও হয়ে যান। এই গেরিলার অন্তর্ধানের ব্যাপারটা সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল সে সময়। এখন সবার অজান্তে চুল দাঁড়ি ছেটে তিনি হাজির হলেন বলিভিয়ায়। ল্যাটিন আমেরিকায় কমিউনিজম ছড়িয়ে দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য।

কিছুদিনের মধ্যেই বলিভিয়ায় একটা গেরিলা আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন। স্থল বেষ্টিত, পাহাড় জঙ্গল ভরা দরিদ্র দেশ বলিভিয়া। লোকসংখ্যা মাত্র চল্লিশ লক্ষ। কিন্তু তা হলে কি হবে। রাজনৈতিক দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পাঁচটি দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে তার। ওই পাঁচটি দেশ মিলে হয় দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় আশি ভাগ। গুয়েভারা আশা করছেন এখান থেকে অন্য দেশগুলোর বিশেষতঃ পেরু ও আর্জেন্টিনায় বিপ্লব ছড়িয়ে দেয়া সহজ হবে।

'মহাদেশীয় যুদ্ধ' শুরু করার একটা মহাপরিকল্পনা ছিলো ফিদেল ক্যাস্ট্রোর। তারই অংশ হিসেবে বেশ কয়েকবার গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার চেষ্টা করেছেন তিনি দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু সফল হননি। সেই পরিকল্পনার ফলেই বলিভিয়ার জঙ্গলে এসে হাজির হলেন চে গুয়েভারা।

কিউবাতে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে সফল গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতির শীর্ষে পৌঁচেছেন গুয়েভারা। তার জন্ম আর্জেন্টিনায়। ক্যাস্ট্রোর মন্ত্রীসভায় শিল্পমন্ত্রীর পদ দেয়া হয়েছিল তাঁকে। তাছাড়া একটা বই লিখেছিলেন গেরিলা যুদ্ধের উপর। হট কেকের মতো সেটা বিক্রি হয় সারা পৃথিবী জুড়ে।

১৯৬৫ সালে তিনি পদত্যাগ করে চলে যান কঙ্গোয়। সেখানে একটি কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান সংঘটিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু ব্যর্থতা তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। তাঁর রক্তে ছিলো বিপ্লবের নেশা। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

লা পাজ থেকে বেরিয়ে গুয়েভারা সরাসরি হিসাবে প্রায় চারশো মাইল দূরের একটি ছোটো জঙ্গলাকীর্ণ খামারে যান। নানকা হুয়াজা নদীর ধারের এই খামারটি বলিভিয়ার দুজন বিপ্লবী কিনে নিয়েছিলেন যাতে এখান থেকে গুয়েভারা তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক না করেই।

এই গহীন জঙ্গলে বসে বিপ্লবী গুয়েভারা কি কাজকর্ম করতেন তা সঠিকভাবে জানা দুষ্কর। তিনি নিজে ডাইরি লিখতেন, তা থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। অন্যান্য সহকর্মী যারা ধরা পড়েন বা পালিয়ে যান তাঁরা এবং বলিভিয়া সরকার ও সি. আই. এ.র মাধ্যমে আরো কিছু তথ্য যোগাড় করা গেছে।

প্রথম দু'সপ্তাহ চে গুয়েভারা সমস্ত এলাকাটা ঘুরে ফিরে পর্যবেক্ষণ করেন। গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম শর্ত হচ্ছে এলাকার খুঁটিনাটি সব কিছু যোদ্ধাদের নখদর্পণে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে কিউবা থেকে টাকা পয়সা, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র এবং লংরেঞ্জ রেডিও নিয়ে আরো পাঁচজন বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছেন।

খামার থেকে পোয়া মাইল দূরে তাঁরা বেইস ক্যাম্প গড়ে তুললেন। আক্রমণ ঠেকানোর জন্য পরিখা এবং গর্ত খুড়লেন। বিশাল আকারের গুহা এবং টানেল তৈরি করে অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিসহ একটি ফিল্ড

হাসপাতাল গড়ে তুললেন তাঁরা। গুয়েভারার সতর্ক দৃষ্টির সামনে চললো গুলি চালনা প্রশিক্ষণ এবং কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া।

স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে দলে টেনে আনবার চেষ্টা করেছিলেন গুয়েভারা। সম্ভবতঃ নেতৃত্বের কোন্দলের জন্য তা করা সম্ভব হয়নি। বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি কখনোই নিজেকে পুরোপুরি এই আন্দোলনে জড়িত করেনি। এর ফলে যদিও ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন কমিউনিস্ট তাঁর দলে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু তবুও দলের সদস্য সংখ্যা কখনোই পঞ্চাশ-এর বেশি হয়নি।

সংখ্যার এই স্বল্পতা গুয়েভারাকে হতোদ্যম করতে পারেনি। কিউবাতে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিলেন মাত্র তেরো জনকে নিয়ে। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশজন নিষ্ঠাবান গেরিলা যোদ্ধা মিলে যে কোনো ল্যাটিন আমেরিকান দেশে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

গেরিলা যুদ্ধের সাধারণ নিয়মে গুয়েভারা আশা করেছিলেন যে ছোটো ছোটো দ্রুত আক্রমণের মাধ্যমে সরকারকে দুর্বল ও ভঙ্গুর করে তুলতে পারবেন তারা। গরীব চাষীরা তাঁদেরকে মুক্তিদাতা হিসাবে মনে করবে এবং দলে দলে তাঁর বাহিনীতে যোগ দেবে। এক বিরাট মুক্তিবাহিনী নিয়ে শহরের লোকদের সমর্থনে তাঁরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবেন।

বলিভিয়ার সমস্যার অন্ত ছিলো না। এটা ছিলো বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। জনগণের মাথাপিছু আয় ছিলো বৎসরে দু'হাজার টাকারও কম। ঘন ঘন সরকার বদল, বলতে গেলে গত একশো বৎসর ধরে দেশটাকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে গিয়েছিল। জনসংখ্যার বেশির ভাগই ইণ্ডিয়ান চাষী। তারা গরীব থেকেও গরীব। সে সময়কার যিনি প্রেসিডেন্ট আটবার তাঁর জীবননাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই ছিলো দেশের অবস্থা।

সেনাবাহিনীর অবস্থা ছিলো আরো খারাপ। দুই হাজার নিয়মিত সৈন্য আর সতেরো হাজার ন্যাশনাল সার্ভিসম্যান। সাকুল্যে উনিশ হাজার লোকের একটা দুর্বল বাহিনী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত মাউজার রাইফেল তাদের একমাত্র অস্ত্র।

১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গুয়েভারা চব্বিশ জন লোক নিয়ে সাত সপ্তাহের জঙ্গল মার্চ শুরু করেন। উদ্দেশ্য যোদ্ধাদের কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ানো। এলাকাটা ভালোভাবে চিনে নেয়া এবং জনগণের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের জন্যে এই এলাকাটা বেছে নেয়া উচিত হয়নি তাঁর।

কিউবার সিয়েরা সায়েস্ত্রায় ক্যাস্ট্রো সফল হতে পেরেছিলেন সম্ভবতঃ এই কারণে যে এলাকাটা ছিলো জনবহুল। চাষীরা তাঁকে খাবার দিয়ে, লোক দিয়ে সাহায্য করেছে। ঘন জনবহুল এলাকায় গেরিলাদের পালিয়ে থাকতে সুবিধা হয়েছিল।

কিন্তু এখানে বলতে গেলে কোনো জনবসতিই ছিলো না। নানকা হুয়াজার ওপারের জঙ্গলে কোনো মানুষ বাস করতো না। যে কয়েকটি বসতি ছিলো তাও ত্রিশ বৎসর আগের বিউকেনিক প্লেসে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

খাবারের ভাণ্ডার খুব দ্রুত ফুরিয়ে এলে বনের জংলী ফলমূল আর ছোটো ছোটো বন্যপ্রাণী শিকার করে তাঁরা খেতে শুরু করলেন। কয়েকজন ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়লেন।

ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলেন কেউ কেউ। হাতে পায়ে ফোস্কা পড়ে ক্ষত হয়ে গেল। পাহাড়ী এলাকাটি তাঁরা যা

ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্গম বলে প্রমাণিত হলো। ফলে দুর্দশা আরো বেড়ে গেল। নদী পার হতে গিয়ে দুজন ডুবে মরলেন। অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই একটা ভেলা ঘূর্ণিপাকে পড়ে তলিয়ে গেল।

কষ্টেসৃষ্টে গুয়েভারা দলবল নিয়ে নানাকাহুয়াজায় ফিরে এলেন। তাঁর জন্য দুজন আগন্তুক অপেক্ষা করছিল। একজন আর্জেন্টিনার বিপ্লবী সিরো বাস্তে। আর্জেন্টিনায় ভবিষ্যৎ অপারেশনের জন্য নানকাহুয়াজায় তাঁর লোকদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারে পরিকল্পনা করার জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছিল।

অন্যজন প্যারিসের এক ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান, রেজি দ্যব্রে। কিউবার বিপ্লবীদের দেখে মুগ্ধ হয়ে ছাব্বিশ বৎসরের এই যুবক কমিউনিস্ট বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষা লাভ করেন এবং 'রেভাল্যুশন উইদিন দা রেভাল্যুশন' নামে একটি বই লেখেন। গুয়েভারার আমন্ত্রণেই তিনি এসে হাজির হয়েছেন বলিভিয়ার জঙ্গলে।

দ্যব্রের ক্ষুরধার মেধা গুয়েভারাকে মুগ্ধ করেছিল কিন্তু গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে এই যুবক একেবারেই অচল বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি তাকে একটি সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠী সংগঠিত করার জন্য ইউরোপে ফেরত পাঠাবার পরিকল্পনা করেন।

ফেরার পথে দ্যব্রে এবং বাস্তোস বলিভিয়ার কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়তেন না যদি না এরিমধ্যে দুজন স্থানীয় গেরিলা দলত্যাগ না করতো। তারা দলত্যাগ করে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এবং মুখ খুলতে বাধ্য হয়। গেরিলাদের খোঁজে সেনাবাহিনীর একটি পেট্রোল ইউনিট পাঠানো হয়। মার্চের তিন তারিখে গেরিলাদের একটি অনুসন্ধানী দল সেনা পেট্রোলকে একটি নদী পার হবার সময় দেখে ফেলে। তৎক্ষণাৎ, আক্রমণ চালিয়ে তারা সাতজন সৈন্যকে হত্যা করে। চেগুয়েভারার কাছে এই খবর পৌঁছানো মাত্র তিনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। 'খুব ভালো। যুদ্ধ তাহলে শুরু হয়ে গেল।'

এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে শিগগীরই আরো শক্তিশালী সেনাদল আসবে সেটা জানতেন গুয়েভারা। তাই তিনি নানকা হুয়াজু ক্যাম্প ত্যাগ করেন। সঙ্গে নিয়ে যান দুই আগন্তুক অতিথিকে। কিন্তু এরা তাঁর জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসী এই যুবক গেরিলা যুদ্ধের তাত্ত্বিক হিসাবে বেশ নাম কিনেছিলেন। এবার জঙ্গলের গহীনে এসে বাস্তবতার কাঠিন্য দেখে একেবারে মুষড়ে পড়লেন। গুয়েভারা তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন যে দ্যব্রে খুব মানসিক অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন এবং অনবরত বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করতেন। এদের দুজনের হাত থেকে তিনি মুক্তি পেতে চাইলেন।

এপ্রিলের ২০ তারিখে ভাকা গুজমান শহরের কাছাকাছি এসে পড়লেন তাঁরা। এখানে দ্যব্রে এবং বাস্তোসকে ত্যাগ করলেন গুয়েভারা যাতে তারা সভ্যতার কাছে ফিরে যেতে পারে। পায়ে হেঁটে শহরে ঢুকবার পর পুলিশ দুজনকেই গ্রেপ্তার করে। গেরিলাদের সাথে সংশ্রব রাখার দায়ে সামরিক আদালতে তাদের বিচার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দ্যব্রে গ্রেপ্তার হবার সাথে সাথে তাঁর বাবা-মা এবং বন্ধুবান্ধবরা সারা দুনিয়া তোলপাড় করে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গল বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্যারিয়েন্তোসকে চিঠি লেখেন। ভ্যাটিকান পর্যন্ত এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করে। এসব প্রতিবাদ ও অনুরোধে বলিভিয়া সরকার খুবই বিব্রত বোধ করেন। তাঁরা দ্যব্রে এবং বাস্তোসকে ত্রিশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

এই শোরগোলে আসল ক্ষতি হয় গুয়েভারার, রেজি দ্যব্রে স্বীকার করেন যে বহুদিন ধরে নিখোঁজ যোদ্ধা গুয়েভারাই গেরিলাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পরে তিনি অবশ্য তাঁর বক্তব্য অস্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তোস আসল ঘটনা ফাঁস করে দেন। অথচ গুয়েভারা এদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন তাঁর অস্তিত্বের কথা কোনভাবেই প্রকাশ না করা হয়।

ফল যা হবার তাই হলো। বলিভিয়া সেনাবাহিনীর লোক পুরো এলাকায় গিজগিজ করতে লাগলো। গেরিলারা যেদিকেই পা বাড়ায় দেখতে পায় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে সৈন্যরা। যদিও তাদের কাছে কোনো অধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ছিলো না, প্রশিক্ষণ ছিলো না তবুও শুধু সংখ্যার জোরেই তারা কোণঠাসা করে ফেললো গেরিলাদের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চে গুয়েভারার অস্তিত্বের কথা জানতে পেরে ষোলো সদস্যের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত 'গ্রীন বেরে' কমাণ্ডোদের পাঠালো বলিভিয়ার একটি রেঞ্জার ব্যাটালিয়নকে ষোলো সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বা সি. আই. এ. আদাজল খেয়ে লেগে গেল গুয়েভারার দলের বিরুদ্ধে।

পিছু হটা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না গুয়েভারার। একে একে তাঁর দলের লোক সংখ্যা কমতে লাগলো। প্রায়শঃই সংঘর্ষ হতে থাকলো সরকারী বাহিনীর সাথে। স্থানীয় যারা ছিলো তাদের অনেকেই দলত্যাগ করলো। সময় খুব খারাপ তখন তাঁর জন্যে। পুরনো হাঁপানী তাকে খুব কষ্ট দিতে শুরু করলো। কারো সাহায্য নিয়ে বা খচ্চরের পিঠে চেপে ছাড়া একস্থান থেকে অন্যখানে যাবার উপায় রইলো না তাঁর। নিজের লেখা গেরিলা যুদ্ধের ম্যানুয়েলে তিনি বলেছেন গেরিলাদের থাকতে হবে লোহার শরীর। কিন্তু তাঁর নিজের শরীরের অবস্থাই তখন কাহিল।

সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার যা গুয়েভারাকে আহত করলো তা হচ্ছে কৃষকরা তাঁকে নয়, সরকারী বাহিনীকে সাহায্য করছিল। জন সমর্থন ছাড়া সশস্ত্র সংগ্রাম অসম্ভব এ কথা গুয়েভারা তাঁর ম্যানুয়েলে বলেছিলেন কিন্তু তিনিই হতাশ হয়ে ডায়রীতে লিখলেন, 'এই এলাকার লোকেরা পাথরের মতোই দুর্ভেদ্য। তাদের সাথে কথা বলা যায় কিন্তু তাদের চোখের গভীরে জমা হয়ে থাকে অবিশ্বাস।'

যুদ্ধ তখনো শেষ হয়ে যায়নি। জুলাই-এর ২৭ তারিখে, গেরিলারা ৮ জন সরকারী সৈন্যকে অ্যামবুশ করে ৩ জনকে হত্যা করে। পাল্টা আক্রমণে দুজন গেরিলা নিহত হয়। ৩১ শে অগাস্টে মাথার উপরে অস্ত্র তুলে হেঁটে নদী পার হবার সময় গেরিলাদের একটি দল সরকারী বাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়ে। নয় জন মারা যায়, একজন ধরা পড়ে।

যে ছয় জন কিউবান দক্ষিণ আমেরিকায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত করার সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রথম বলিভিয়ায় এসেছিল তাদের দুই জন মৃত দুই জন আহত, একজন নিখোঁজ এবং সর্বশেষ জন গুয়েভারা নিজে তখন অসুস্থ।

যুক্তরাষ্ট্রের কমাণ্ডোদের ট্রেনিং পাওয়া বাহিনী যখন মাঠে নামলো তখন আর কোনো উপায় রইলো না গুয়েভারার। তারা ভালো করেই শিখে নিয়েছে কি করে গেরিলা যুদ্ধের মোকাবেলা করতে হয়। সি. আই. এ.র চরদের সহায়তায় আর 'গ্রীন বেরে' দের প্রশিক্ষণে বলিভিয়ানরা চে গুয়েভারার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নেমে গেল। কিউবায় গুয়েভারা যা করতে পেরেছিলেন বলিভিয়ায় তা পারলেন না।

সরকারী বাহিনী গেরিলাদের নির্দয়-

ভাবে ধাওয়া করতে লাগলো। মাইলের পর মাইল দুর্ভেদ্য, দুর্গম পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে তারা গেরিলাদের পিছু নিলো। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টায় তারা বিশ্রাম নেবার সময়ও পেলো না। পালাবার রাস্তাও বন্ধ।

অক্টোবরের ৭ তারিখে গুয়েভারা তার ডাইরিতে শেষবারের মতো লিখলেন: '১২-৩০ এর দিকে এক বুড়ি ছাগলের পাল নিয়ে আমাদের ক্যাম্পের কাছে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ে। তাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে অনুরোধ করা হয় যেন সে সৈন্যদের কাছে আমাদের উপস্থিতির কথা না বলে দেয়। তবে সে তার প্রতিশ্রুতি রাখবে বলে মনে হয় না।'

পরের দিন সরকারী রেঞ্জারদের একটি দল ক্যানিয়নের চারদিক দিয়ে গেরিলাদের ঘিরে ফেলে। সামান্য গুলি বিনিময় হয়। গুয়েভারার কারবাইনে লেগে পিছলে এসে একটা বুলেট তার উরুতে আঘাত করে। সাথে সাথে মাটিতে পড়ে যান গুয়েভারা। অকেজো হয়ে যায় তাঁর অস্ত্র। চিৎকার করে সৈন্যদের তিনি বলে উঠলেন, 'আমাকে মেরো না। আমি চে গুয়েভারা। আমাকে না মেরে বাঁচিয়ে রাখলেই তোমাদের সুবিধে।'

একটি স্ট্রেচারে করে সৈন্যরা গুয়েভারাকে হিগুয়েরাস শহরের একটি স্কুলে নিয়ে যায়। জখমের চিকিৎসা করা হয়। সঙ্গে তাঁর তিনজন অনুসারীকেও নিয়ে আসা হয়। গুয়েভারার পরনে ছিলো রুক্ষ পোশাক আর পায়ে হাতে সেলাই করা জুতো। লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে। মুখে অবিন্যস্ত লম্বা দাড়ি। শরীরের ওজন কমে গেছে অনেকখানি। সৈন্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো তিনি মুখ খুলতে রাজি কিনা। গুয়েভারা অস্বীকার করেন।

একজন অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি যেভাবে বলিভিয়া আক্রমণ করেছেন সেভাবে কেউ কিউবা আক্রমণ করলে তার ভাগ্যে কি ঘটতো তা আপনি জানেন?' উত্তরে গুয়েভারা শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'হ্যাঁ।'

পরদিন দুপুরে লাপাজ থেকে বেতার বার্তা এসে পৌছুলো। বলিভিয়ায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই। এদিকে জেলে গুয়েভারাকে আটকে রাখার পরিণতি সম্পর্কেও সরকার সচেতন ছিলেন। রেজি দ্যব্রেকে নিয়ে যে হৈচৈ হয়েছিল সেটা তাঁরা ভুলে যাননি। তাছাড়া এরকম বিপজ্জনক বিপ্লবী যোদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখার ঝুঁকি নিতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। গেরিলাদের সাথে যুদ্ধে নিহত ১৭ জন বলিভিয়ান সৈন্যের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারটা তো ছিলোই, তাই তাঁরা বিচারের ঝামেলায় গেলেন না।

সাব মেশিনগান হাতে নিয়ে একজন সার্জেন্ট ছোট্ট স্কুল ঘরটায় প্রবেশ করলো। গুয়েভারার তিন সাথীকে বুলেটের আঘাতে শুইয়ে দিলো সে। তারপর গুয়েভারার দিকে নল তাক করে ট্রিগার টিপে দিলো।

এভাবেই শেষ হলো এই শতাব্দীর সম্ভবতঃ সব চেয়ে আলোচিত, সব চেয়ে নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী গেরিলার জীবন। ওই দেশেরই কোনো এক অজানা স্থানে রয়েছে তাঁর সমাধি।

(বিদেশী পত্রিকা থেকে)

টাক রহস্য

সিনহা আবুল মনসুর

মাথার টাক নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। নিরন্তর চলছে কাজ। আর যারা ভুক্তভোগী— তাদের মাথার অবশিষ্ট চুলগুলোও পড়বার উপক্রম চিন্তায় চিন্তায়!

মাথায় টাক পড়া নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বিভিন্ন বিজ্ঞানী একে ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে। এব্যাপারে চাঞ্চল্যকর এক তথ্য হাজির করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নামকরা অধ্যাপক, তিনি দাবি করেছেন—যাদের মাথায় বুদ্ধি বেশি তাদের মাথার খুলি আকার আয়তনে বাড়তে থাকে। ফলতঃ খুলির চামড়া জায়গায় জায়গায় টান টান হয়ে যাওয়ায় তা চুলের গোছাকে আর ধরে রাখতে পারে না। ফলে চুল উঠে যায় ও টাক পড়ে।

আয়ুর্বেদ বিশারদরা বলছেন : যে বায়ু আমাদের দেহের সর্বত্র বিচরণশীল তা হচ্ছে সমান বায়ু; এই বায়ু শরীরের লোমকূপের মধ্যে থাকে। লোমকূপের
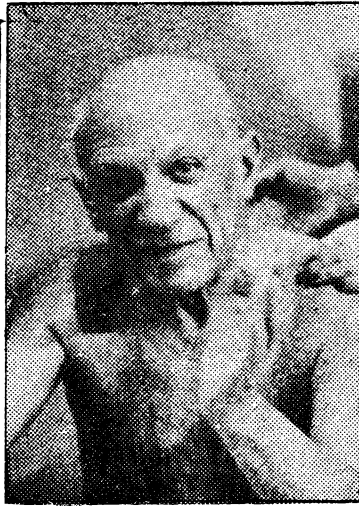
ভিতরে যে পিত্ত থাকে তা এবং এই বায়ু যদি আহার বিহার-এর দোষে দুষ্ট বা দূষিত হয়—এতেই নাকি টাকের উদ্ভব!

আবার অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা—শরীরের বর্জ্য, তৈলাক্ত আবর্জনা মাথায় গিয়ে জমা হবার ফলেই নাকি টাকের উদ্ভব। অবশ্য টাকের ব্যাপারে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমেরিকান ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের চর্মরোগ বিভাগের প্রধান ভ্যান স্কট। তাঁর মতে: টাক পড়া একটি জেনেটিক ব্যাপার। কোনো মানুষের মাথায় টাক পড়বে কি পড়বে না, বা টাকটির আকার আয়তন কি রকম হবে তা নির্ভর করবে তার বংশের কারো কখনো টাক ছিলো কিনা, তার বয়স কতো, তার জীবন যাপন পদ্ধতি কেমন এসব ফ্যাক্টরের উপর।

এগুলো তো গেল টাকের সম্ভাব্য কারণ। এখন টাক পড়লে তার উপায় কি? চিকিৎসাবিজ্ঞান টাকের প্রকৃত ঔষধ এখনও বের করতে পারেনি। তবু কিছু কিছু ঔষধ বাজারে প্রচলিত আছে এবং প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলো দাবি করে যে এগুলো টাকের বিরুদ্ধে কাজ করে।

তবে মূল কথা হলো, যে সব ঔষধ বাজারে প্রচলিত আছে তাদের উপাদানগুলো হচ্ছে: অ্যাসকরবিক এসিড, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, অ্যামাইনো এসিড ও বেনজয়িক এসিড। মাথায় চুল গজাবার ব্যাপারে এগুলোর প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই। যদিও বিজ্ঞাপনের জোরে এগুলো চলছে ভালোই।

উন্নত দেশগুলোতে অবশ্য অন্য ধরনের চেষ্টা চলছে। মাথায় চুল গজাবার ব্যাপারে তারা 'প্লাস্টিক সার্জারি'র সাহায্য নিচ্ছেন। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সার্জনগণ এ ব্যাপারে অগ্রণী। ভূমিকা পালন করছেন মাথার পেছন দিক থেকে চুলশুদ্ধ ছোটো ছোটো চামড়ার টুকরো কেটে এনে তারা বসিয়ে দিচ্ছেন মাথার সামনের দিকের 'টাক এলাকায়'। এরপর মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছেন প্রেশার ব্যাণ্ডেজ। উদ্দেশ্য চুলশুদ্ধ চামড়াগুলো টাকের নিচে ছোটো ছোটো শিরার সাথে 'ফিবরিন ক্লট' দিয়ে যুক্ত হয়ে যাবে। এই পদ্ধতিতে সাফল্য অবশ্য কিছুটা এসেছে। কিন্তু এতে সময় লাগে প্রচুর এবং খরচও বিস্তর।

টাক চিকিৎসায় নতুন দিক নির্দেশনা
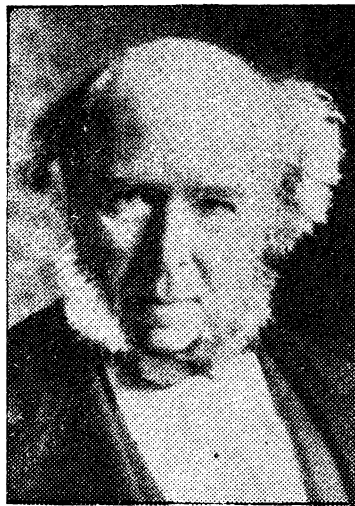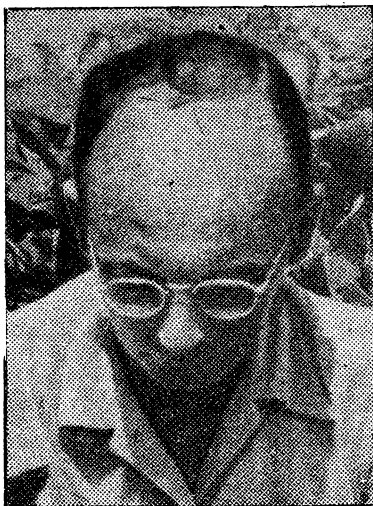
দিতে যাচ্ছে 'মিনক্সিডিল' নামের একটি ঔষধ। কয়েক বছর আগের ঘটনা। আমেরিকায় 'আপজন' নামের ঔষধ কোম্পানী 'লোনিটেন' নামের একটি ঔষধ বাজারে ছাড়ে। ঔষধটি মূলত উচ্চ রক্তচাপ কমানোর। লোনিটেনের উপাদান হচ্ছে মিনক্সিডিল। রক্তনালীর প্রসারণ ঘটিয়ে রক্তচাপ কমানোই ছিলো এর মূল কাজ। কিন্তু এই ঔষধটির একটি চাঞ্চল্যকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সেটি হচ্ছে রোগীর মাথায় ও শরীরে প্রচুর চুল গজানো। চুলপ্রেমিক ও টেকোদের জন্যে এটি অবশ্যই একটি উত্তেজনাকর ব্যাপার। শুরু হয়ে গেল ব্যাপক গবেষণা। উইসকনসিন রিজিওনাল প্রাইমেট রিসার্চ সেন্টার ছোটো আকারের এক ধরনের বিশেষ বানরের উপর মিনক্সিডিলের গুণাগুণ যাচাই করতে শুরু করলেন। 'মেকাকা' জাতের এই বানরের মাথায়ও মানুষের মতো টাক পড়ে। উইসকনসিনের গবেষক হিডিও উনোর মতে—'মিনক্সিডিলের এমন কিছু ক্ষমতা আছে যার জোরে বুড়িয়ে যাওয়া লোমকূপগুলোতে নতুন করে চুল গজায়।'

উইসকনসিন প্রাইমেট রিসার্চ সেন্টার ছাড়াও মিনক্সিডিল নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে ওয়াশিংটন হাসপাতালে। ১৯৮৩ সালে ওয়াশিংটন হাসপাতাল সেখানকার শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোতে একটি বিজ্ঞাপন দেয়—যার ভাষা ছিলো এরকম: 'কেশহীন লোকদের উপর চুল গজাবার ঔষধ প্রয়োগ। ভলান্টিয়ার হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন।'

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাথে সাথে সারা আমেরিকায় সাড়া পড়ে যায়। মোট আবেদন পত্র জমা পড়ে দশ হাজার। শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক নির্বাচনের পরে ২৪০০ জনকে 'ভলান্টিয়ার' হিসেবে নেয়া হয়। এই ২৪০০ জনের ওপর টাক মাথায় চুল গজাবার ঔষধ মিনক্সিডিল প্রয়োগ করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল ছিলো সন্তোষজনক। শতকরা ৭৫ ভাগ রোগীর মাথায় নতুন করে চুল গজিয়েছে।

হয়তো সরকারী ছাড়পত্র নিয়ে অচিরেই এই টাকনাশক ঔষধ বাজারে এসে যাবে। তাই চুলপ্রেমিকদের বলছি—আর একটু অপেক্ষা করুন, আপনাদের দীর্ঘ রজনী বোধ হয় ঊষা হতে চললো।' □

বিয়ে খাওয়া

রুনু হক

১৯৪৭ শের দেশ বিভাগের পর আব্বা মুর্শিদাবাদ থেকে বদলি হয়ে এলেন। চাকুরিতে আব্বার প্রমোশন হয়েছে। বদলিস্থল ঝালকাঠি, বরিশাল জেলার অন্তর্গত। চারিদিক জল বেষ্টিত ছোট্ট শহর ঝালকাঠি। এখনকার শহরের মতো নয়। গ্রামেরই একটু পরিশীলিত সংস্করণ মাত্র। তবু সেখানে বৃটিশ আমলে সাহেব হেডমাস্টার এসে স্কুল চালিয়েছে। বিরাট বড় এলাকায় হেড্‌-মাস্টারের চকচকে সবুজ সিমেন্টের ঝকঝকে সাদা বাংলো, সুনন্দা নদীর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাংলোর সামনে পায়ে চলা পথ। দীঘল তাল গাছ। তার পাশে ছোটো একটা খাল। গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায়। কচুরী পানা শুকিয়ে শুকনো খড়ের রঙ ধারণ করে। তারপাশে একটু বড় একটা খাল। তার মাঝে পানি সারা বছরই ধীর স্থির শান্ত ভাবে বয়ে যায়। জোয়ারের সময় ভরে ওঠে নবীন যৌবনার মতো। ভাঁটায় একটু শীর্ণ দেখালেও যথেষ্ট শ্রীমণ্ডিত থাকে। তার মাঝে কচুরীপানা ভেসে যায়। সবুজ লকলকে কচুরীপানার বুকে রূপসী ললনার মতো বেগুণী ফুল। মাথা উঁচু করে থাকে প্রদীপ্ত অহঙ্কারী ভঙ্গিতে। বড় খালটার প্রান্তে একটা পানের বরজ। পানের দিনে অজস্র পান হয়। এই

পানের বরজের অধিকারীদের দখলে এই ছোট্ট দ্বীপের মতো স্থলটুকু। ছোট্ট এক টুকরো গ্রামের মতো। যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি।

খালের জলে নৌকা চলে। ডিঙ্গি নৌকা। তালের কোষা। কলাপাতার ভ্যালা। বরষার দিনে ইলশে ডিঙ্গি। জোয়ারের সময় আসে বড় বড় নৌকা গুড়, নারিকেল, সুপারী সব মালপত্র নিয়ে। এসব নৌকাগুলো অনেক সময় একেবারে বাংলোর সামনে বেঁধে মাঝিরা বিশ্রাম করে। গোসল করে। রান্না করে। খাওয়া দাওয়া করে। ঘুমায় নৌকার ছই-য়ের মধ্যে। নৌকা খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় বাচ্চাদের দোলনার মতো দুলতে থাকে শান্ত জলের বুকে।

সাহেবদের তখন বিদায় নেবার পালা। আব্বা বদলি হয়ে এসে ওই বাংলোতে উঠলেন। নদীর ধারে বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝে এতো সুন্দর একখানা বাসায় থাকতে পাবো ভেবে আমার আর আনন্দ ধরে না। শোবার ঘরের ধারে ফুলের বাগান মেহেদীর বেড়া দেয়া। মথুরানাথ ভুঞ্জমালী নিত্য দিন তার পরিচর্যা করে অভ্যস্ত হাতে।

কালো কুচকুচে শক্ত কাঠামোর শরীর তার। পরনে সাদা ধুতি। উপরটা প্রায় সময়ই খালি থাকে। শীতকালে মোটা একটা সাদা হাতার গেঞ্জী পরে। মাথার কাঁচা পাকা চুল ছোটো করে ছাটা। হাসি হাসি মুখে উজ্জ্বল চাহনি। মেহেদী পাতার বেড়াগুলো একটু এলোমেলো হওয়ার উপায় নেই। মথুরকে দেখা যায় প্রায়ই লম্বা একটা কাল কাঁচি দু'হাতে ধরে তার পরিচর্যা করছে। কোমর সমান উঁচু এল শেপের বাসায় চারটে বড় বড় ঘর একদিকে। বসবার আর শোবার ঘর। অন্যদিকে এক ধাপ নিচুতে, কল ঘর, রান্নাঘর, স্টোররুম। বাড়ির দু'মানুষ সমান উঁচু বাউণ্ডারীর ভেতর রয়েছে প্রশস্ত জায়গা। তাতে মা রোপণ করে-ছেন গেঁদাগাছ, মরিচ গাছ, সন্ধ্যামলি ফুলের গাছ। একটু দূরে মাচানে লাউ, কুমড়ো, ঝিঙ্গে গাছ। অনতিদূরে এক কোণে টয়লেট। তৎকালীন খাটা পায়-খানা।

বাড়ির বৈঠকখানা দিয়ে একটা বাইরে বের হবার দরজা। আর একটা মস্ত বড় দুই পাল্লার লোহার মতো শক্ত কাঠের লাল টুকটুকে প্রশস্ত গেট ভেতর আঙ্গি-নার প্রান্তে। দরজাটা ছিলো যেমন দেয়াল উঁচু তেমনি চওড়া।

বাবা আমাদের দু'বোনকে সেই প্রথম ঝালকাঠিতে স্কুলে ভর্তি করলেন। আমি ক্লাশ ফোরে, ছোটো বোন টুতে। জীবনে প্রথম স্কুল দেখলাম। প্রথম দিন স্কুলে গিয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। কতো মেয়ে। কতো দিদি মনিরা সব। পুরুষ স্যারও আছেন।

কাউকে চিনি না। একরাশ অচেনা নতুন মুখের মাঝে ভীরু খরগোশের দৃষ্টি দিয়ে সকলের দিকে চাইতে শুরু করলাম। অবশ্য বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগলো না।

টিফিন পিরিয়ডে প্রতিভা, ঊষা, নমিতা আরতির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওরা যদিও বেশ বড়, সকলেই শাড়ি পরিহিতা। এতোটুকুন আমি ফ্রক পরিহিতা, তবুও বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। এর অবশ্য কয়েকটা কারণ ছিলো। প্রথমত আমি হেডমাস্টারের মেয়ে। ছোট্ট মফঃস্বল শহরে প্রচুর সম্মানের অধিকারী তিনি। দ্বিতীয়ত নদীর ধারে ছবির মতো যে বাসাখানি আমাদের জন্যে বরাদ্দ হয়েছে সেখানে আগে দুর্দান্ত প্রতাপশালী সাহেব হেডমাস্টার রাজত্ব করে গেছেন। সেটাও সে শহরের মানুষজনের চোখে কম আশ্চর্যের ঘটনা নয়। তৃতীয়ত আমি নাকি দেখতে ওদের সম্প্রদায়ের মতো। আমাদের মতো আমি নই।

যাক্। এসব ক'টি বিরল গুণের সৌ-ভাগ্য নিয়ে আমি ওদের একজন বান্ধবী হয়ে গেলাম।

ক্লাশ ফোরটায় প্রথম দিকে সইয়ে নিতে একটু কষ্ট হলেও ফাইভে উঠে বেশ সহজ হয়ে গেলাম। ওদের সেই পনেরো ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যেতো। এরকম এক বান্ধবী সাধনার একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা হলো। দিন তারিখ সব ঠিক। বিয়েও হয়ে গেল। সাধনা বিয়ের আগে বারবার আমাদের কয়েক-জনকে, যেমন প্রতিভা, ঊষা, নমিতা, আরতি, শান্তি, সন্ধ্যা আর আমাকে বলেছিল—তোরা আমার বিয়ের পর দিন আমাদের বাড়িতে যাবি। শুধু বলেই ক্ষান্ত হয়নি। কথা আদায় করে ছেড়েছিল।

আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম—কখন? বলেছিলো—সকালের জল খাবার খেয়েই সবাই চলে আসবি। আমার বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

সাধনা আমাদের তারিখও বলেছিল।

আমরা তো খুব খুশি। সবার মাঝে জল্পনা কল্পনা চললো—ওকে কি উপ-হার দেয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এটা সেটা অনেক কিছু সিলেক্ট করেও সবার মনঃ-পূত না হওয়ায় বাতিল করা হলো। অনেক ভাবনা চিন্তা করে ঠিক করা গেল আমরা এ ক'জন চাঁদা তুলে ওকে রূপোর সিঁদুর কৌটা দেবো।

কারণ সাধনারা বেশ ধনী। ওদের অনেক কিছুর ব্যবসা আছে। নারিকেল সুপারী গুড়। আরো কি সব নিয়ে যেন ওর বাবা, দাদারা (বড় ভাই) ব্যবসা করে। কাঠপট্টীতে মস্ত বড় কাঠের দোতলা বাড়ি। উঠোন পুকুর সব আছে। সুতরাং এহেন ধনী পরিবারের মেয়ে সাধনাকে যা'তা জিনিস দেয়া যাবে না। ক্লাশে বসে শুনি মেয়েরা বলাবলি করছে, সাধনাকে প্রচুর গহনা দিচ্ছে ওর মা-বাবা। চুড়ি, অনন্ত, আর্মলেট, বালা, কানবালা, সীতাহার, মুকুট। দশ বারোটা আংটি। এ-ছাড়া শ্বশুর বাড়ি থেকেও এমনই গহনা পাচ্ছে। বিয়ের কথা পাকা-পাকির পর সাধনা আর স্কুলে আসে না।

এদিকে আমাদের নেমন্তন্নে যাওয়ার দিন যতো এগিয়ে আসতে লাগলো সবার মাঝে উত্তেজনাও ততো বেড়ে চললো। সাধনা জল খাবার খাওয়ার পর যেতে বলেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে সে দুপুরে ভুরিভোজের আয়োজন করবেই। এ-ব্যাপারে আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম।

আমাদের প্রতিক্ষীত দিনটি গুটি গুটি পা ফেলে এসে সুপ্রভাত জানালো। ভোরে ঘুম ভেঙে উঠতেই মনে পড়ে গেল—আজ সাধনার বাড়িতে যেতে হবে।

মাকে বললাম, 'ও মা, আজ আমাদের দাওয়াত আছে।'

'কোথায়?'

'একটা মেয়ের বিয়ের দাওয়াত।'

'নাস্তা খেয়ে যাবি তো?'

'হ্যাঁ, মা, অল্প করে খাবো। কারণ ওরা তো খাওয়াবেই। খুব বড়লোক নাকি ওরা।'

সকালে নাস্তা খেয়ে। গোসল করে নিলাম। ইস্তেরের উপরে মায়ের হাতের তৈরি গাঢ় গোলাপী আশ্চর্য স্নিগ্ধ রঙের উপর সবুজ নীল ফুল ছড়ানো ঢেউ খেলা-নো ঘেরের কোমরে বেল্ট বাঁধা ফ্রক পড়-লাম। ববড্ চুলে লাল রিবনের বো করলাম। মুখে পাউডার চোখে ঘরে পাতা কাজল। পায়ে জুতো পরতে হলো না। কারণ বান্ধবীরা জুতো পরলে হাসে। আমি কোনো কারণেই কারও হাসির পাত্রী হতে চাই না। তাই ঝালকাঠি এসে পায়ে জুতো না পরা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মায়ের শত বকুনিতেও

জুতো না পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। সিঁদুরের কৌটোটা আমার কাছেই ছিলো। ওটা নিতে ভুল হয়নি।

তখনকার দিনের মফস্বল শহরের লাল সুরকীর রাস্তা। অল্প স্বল্প পথচারী। ভয়ের কোনো কারণ নেই। নির্ভয়ে পথ চলা যায়।

একাই চলে এলাম প্রতিভাদের বাড়ি-তে। প্রতিভা থাকে কাটপট্টীতেই ঠিক সাধনাদের বাড়ির উল্টো দিকে। প্রতি-ভার বাবারও ব্যবসা। তবে এরা অতো ধনী নয়। টিনের একতলা বাড়ি। ভেত-রে অবশ্য প্রচুর জায়গা, পুকুর সবই আছে।

একে একে আমরা সব ক'জনই প্রতি-ভার বাড়ি মিলিত হলাম। সকলে এক-সঙ্গে হয়ে সাধনাদের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। আমরা ওদের সদর দরজা দিয়ে না গিয়ে উঠোনের টিনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি বিয়ের পর-দিন, তবু বেশ চুপচাপ। অতিথি অভ্যা-গত বিশেষ দেখা গেল না। বাসী বিয়ের দিনেও তো প্রচুর আনন্দ উদ্যোগ থাকে। তার কিছুই চোখে পড়লো না।

আমরা উঠোনে ঢুকে দাঁড়াতেই, সাধ-না সদ্য ভাত খাওয়া একটা এঁটো টিনের থালা হাতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। খোলা। কপালে আর সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে লাল সিঁদুর। পরনে সরু জড়িপাড় হলুদ শাড়ি, সাদা ব্লাউস। সাধনা আমাদের দেখে হেসে বললো, 'ওহ্! তোরা এসেছিস?' পাশে একটা কাঠের দোতলার একতলার ঘরের দিকে আঙুল দিয়ে বললো, 'যা তোরা ওখানে গিয়ে বোস্। আমি পুকুর থেকে আঁচিয়ে আসছি। সোনার চুরি শাখা লোহা পরা এঁটো ডানহাত খানা ঘুরিয়ে দেখিয়ে চলে গেল।

ওদের বাড়িতে ঢুকে এতোখানি নিরাশ হবো ভাবিনি। আমরা ঘরে ঢুকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলাম। সবার চোখে প্রশ্ন—ব্যাপার কি? এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে শেষ হয়ে গেল? প্রতিভা বললো, 'বিয়েতে আমি এসেছিলাম। অনেক আয়োজন দেখেছি। এখন কি জানি কি হয়েছে এদের।'

একটু পরেই সাধনা ফিরে এলে ওর হাতে আমরা সাদা রূপোর উপর নীল সবুজ মীনা করা সিঁদুর কৌটাটা দিলাম।

সাধনা খুব খুশি হলো। কথায় কথায় বললো, ওর বর ওর বড়দার সঙ্গে নদীতে (দস্তার) বেড়াতে গেছে। আসতে দেরি হবে। বর দেখাতে পারলো না বলে দুঃখ প্রকাশ করলো। কিন্তু আমরা তাও কেউ বাসায় ফেরার নাম করছি না। আমাদের সকলেরই ধারণা সাধনা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে লুচি মোহন ভোগ আলুর দম করতে দিয়ে এসেছে।

এতোগুলো বান্ধবী আমরা ওকে ভালোবেসে ওর বর দেখতে এসেছি। ওকে কি সুন্দর একটা উপহার দিয়েছি। ও কি আমাদের কিছু না খাইয়ে ছাড়বে? ঊষা, নমিতা, প্রতিভা খুব জমিয়ে সাধ-নার সঙ্গে গল্প জুড়েছে। মাঝেমাঝে ওরা সাধনার কাছে কি যেন ফিস্‌ফিস করে বলে আর হেসে গড়িয়ে পড়ে। আমাকে শুনতে দেয় না। আমি এগিয়ে গেলে বলে, 'তুই বুঝবি না। ভীষণ ছোটো তুই।'

এ-ভাবে হৈ-চৈয়ে বেশ অনেকখানি সময় কেটে গেল। সূর্য মাথার উপরে গনগনে আগুন ছড়াচ্ছে। কিন্তু আমাদের বহু প্রত্যাশিত বাসী বিয়ের ভোজ আস-বার কোনো লক্ষণ দেখছি না। এবারে ঊষা বললো, 'নারে, অনেক বেলা হলো। চল্ এবার বাড়ি যাই।'

সাধনা বললো, 'যাবি? কিছু খাবি না?' আমরা তো এ-কথাই শুনতে চাইছিলাম। বসে পড়লাম সকলে।

'তোরা বোস্। আমি আসছি,' বলে

সাধনা বেরিয়ে গেল।

আমাদের সকলের পেটের তখন করুণ অবস্থা। দশ পনেরো মিনিট পরে সাধনা একটা কাঁসার থালার উপরে গুটিকতক ছোটো ছোটো কাঁসার বাটি নিয়ে এলো।

আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বাটি ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'নে খা।'

চেয়ে দেখল্যাম বাটিতে মুড়ি আর শুকনো এক টুকরো করে আখের গুড়।

মুড়ি! তার উপরে আবার শুকনো!! ঠিক দুপুরে ভাত খাওয়ার সময়!!!

বান্ধবীরা তাই খাচ্ছিলো। কিন্তু আমার হাঁক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। শুকনো জিনিস আমার গলা দিয়ে একে নামতে চায় না। তার উপর প্রচণ্ড খিদের সময়।

মনে যতোই কান্নার ঢেউ জাগুক, প্রকাশ করবো এমন ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং খালি পেটেই বেরিয়ে এলাম। প্রতিভা নিজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে বললো, 'ভীষণ কিপ্টা কিন্তু ওরা।'

আমি স্বভাবগত ভাবেই একটু শান্ত। তাই প্রতিভার এ-কথার কোনো প্রতিবাদ করলাম না। বাসায় চলে এলাম। টেবিল ঘড়িতে বেলা দু'টো বাজছে।

মা ঠাণ্ডা সিমেন্টের মেঝেতে পাটি পেতে শুয়ে মাসিক বসুমতী পড়ছেন গভীর মনোযোগে। পাশেই তাল পাখা একখানা। মায়ের এ-সময় দ্বিপ্রহারিক বিশ্রামের সময়। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন, 'কিরে খেয়ে এসেছিস তো?'

'হুঁ।'

'কি কি খেলি?'

'লুচি, মোহনভোগ, ঘুগনী, বেগুন ভাজা, রসগোল্লা, আলুর দম।'

'এতো?'

'হ্যাঁ, এতো।' কথাগুলো বলতে গিয়ে আমাকে উদ্গত কান্না বহু কষ্টে চেপে রাখতে হয়েছিল। কারণ পেটে যে তখন প্রচণ্ড ক্ষুধার যাতনা দ্বিপ্রহারিক সূর্যের মতো জ্বলছে। □

চুল ছাঁটার খেসারত

আমিনুল হাসনাত

ঘটনাটা আমার নিজের জীবনের নয়। আমার আব্বার এক কলিগের জীবনে ঘটেছিল। উনি একসময় আমাদের সাতক্ষীরা জেলা (তৎকালীন মহাকুমার) অফিসে চাকুরিরত ছিলেন। এক গল্প বলার আসরে এ বাস্তব অবস্থার কথা বলে তিনি সেকেণ্ড হয়েছিলেন। যাক গল্পটা তার মুখ থেকেই শোনা যাক :

উনিশ শো পঞ্চাশ সালের কথা। আমি তখন কলেজের গণ্ডী পেরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চাকুরির ধান্দায় আছি। এখানে তখন সহজেই চাকুরি মিলতো কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিলো অন্যরকম। সারাজীবন তো দেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছি তাই ভাবলাম এবার বিদেশের হাওয়া গায়ে লাগাবো। তাছাড়া বিদেশে

চাকুরি করে সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভের স্বপ্নও দেখতাম মাঝে মাঝে। যোগাযোগ হয়ে গেল। এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। বি.এ. পাশ করেই তার কাছে চিঠি লিখেছিলাম। উনি সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। নির্দিষ্ট দিন করাচী পৌঁছালাম।

ওখানে আমার আলাদা জীবন। যেহেতু আমি উর্দু জানতাম না তাই উনি আমাকে একা একা কোনো কাজে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। আমি ওনার কথা যথাসাধ্য মেনে চলতাম। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। সব কাজে পরনির্ভরশীল হতে মনে বাঁধলো। আমার মাথার চুলগুলো তখন বেপরোয়া রকম বড় হয়ে গেছে। ছাঁটা দরকার, কিন্তু কাকে বলি সাথে যেতে। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে ঠিক করলাম যে আমি নিজেই দোকান খুঁজে বের করে চুল কাটাবো।

সকালে নাস্তা করার পর কাউকে কিছু না বলে দোকান খুঁজতে বেরুলাম। একটা দরজা খোলা প্রাসাদের মতো সাজানো বিলডিং-এ উঁকি দিয়ে চেয়ার, আয়না সাজানো দেখে বুঝলাম এটা চুল কাটানো সেলুন। যাহোক দুরু দুরু বুকে ঢুকে পডলাম কিছুক্ষণ পর প্রকাণ্ড কলেবর বিশিষ্ট লোক এলো চার্ট নিয়ে। আমি উর্দু না পড়তে পারলেও আরবী পড়তে জানতাম অর্থাৎ খাশেবা শব্দের পাশে টিক চিহ্ন বসালাম। শুনেছি এর মানে নেঁড়া হওয়া। যদিও এটা আমার পছন্দীয় নয় তবুও ভাবলাম, কর্তাকে তো বুঝিয়ে দেয়া যাবে যে আমি একা এখানে চলাফেরা করতে সক্ষম। আবার ভাবলাম খাশেবা মানে খাসি করা নাতো—খুবই চিন্তায় পড়ে গেলাম। একসময় দেখলাম অপর একজন লোক কাঁচি, ক্ষুর এসব রেখে চলে গেল। তৃতীয় একজন বিশালদেহী লোক এসে ক্ষুরটা একটা বিশাল ফিতাকার চামড়ায় প্রচণ্ড শক্তি সহকারে টেনে পরীক্ষা করলো যে ধার কেমন হয়েছে। চতুর্থজন আমার মাথায় জাজ্বল্যমান মুকুটের মতো কি একটা পরালো। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। খ্যাচ খ্যাচ শব্দ হলো। মনে মনে কলেমা জপছি আর কি। একসময় সে মুকুট ওঠালো। আয়না দেখলাম। কি করে যে নেড়া হয়ে গেলাম বুঝতে পারলাম না। যাক মস্তক যে গর্দান থেকে বিছিন্ন হয়নি সেটাই পরম সৌভাগ্য মনে করলাম।

এবার টাকা দেয়ার পালা। পঞ্চমজন এসে মাইকের মতো সশব্দে নবাব অমুক এস্টেট এতো টাকা, তমুক এস্টেট এতো টাকা, এভাবে ডজনখানেক নাম ও টাকার অংক বলে গেল। এসব বলা ফুরালে আমার পকেট সম্বল বিশ টাকা বের করে দিলাম। চারিদিকে শোরগোল পড়ে গেল। যতোই আমি বোঝাতে চেষ্টা করি ততোই দ্রুতগতিতে কি সব বলে ওঠে বোঝা যায় না। এভাবে বহুলোক জড়ো হয়ে গেল। সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলো যেন আমি জেলখানার আসামী। ভাগ্যক্রমে ওখানের সর্বমহলে সুপরিচিত এক বাংলাদেশী পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হট্টগোল শুনে এসে আমাকে এ অবস্থায় দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন। বুঝিয়ে বলতেই উনি অট্টহাসি দিয়ে বললেন, 'আরে, এতো জমিদার পরিবারের জন্য সেলুন, আপনি এখানে এসেছেন কেন?' বললাম, 'চিনি না, বুঝতেই পারছেন।'

এরপর উনি সবাইকে বুঝিয়ে বললেন উর্দুতে। তখন সবার সেকি হাসি। আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করলাম। একাকী চুল ছাঁটার কৃতিত্ব নেয়ার কথা সে মুহূর্তেই বেমালুম ভুলে গেলাম। □

গল্প

ভোজসভা
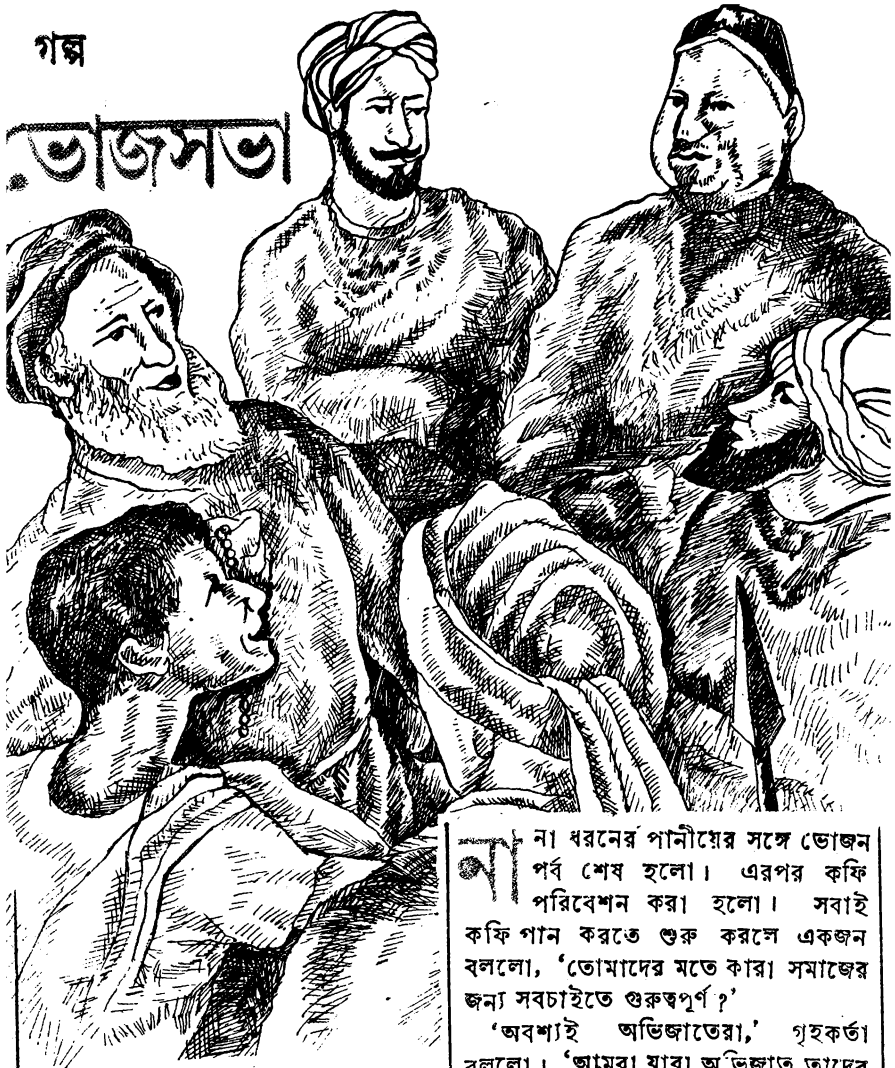
মূল ঃ সুলাইমান সানি আখন্দভ

অনুবাদ ঃ ইকবাল আমিনুল কবীর

না না ধরনের পানীয়ের সঙ্গে ভোজন পর্ব শেষ হলো। এরপর কফি পরিবেশন করা হলো। সবাই কফি পান করতে শুরু করলে একজন বললো, 'তোমাদের মতে কারা সমাজের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ?'

'অবশ্যই অভিজাতেরা,' গৃহকর্তা বললো। 'আমরা যারা অভিজাত তাদের ছাড়া কোনো সমাজ টিকতে পারে না। আমরাই সমাজের স্তম্ভ।'

ব্যবসায়ী উত্তর দিল, ব্যবসা না থাকলে কোনো টাকা থাকতো না। আর টাকা ছাড়া কোনো জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কাজেই ব্যবসায়ীরাই সমাজের

জন্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।'

পণ্ডিত বললো, 'একটি জাতি তার জ্ঞানের জোরেই টিকে থাকে, জ্ঞান ছাড়া কোনো ব্যবস্থাই স্থায়ী হয় না। তা ধ্বংস হবেই। তাই আমরাই সমাজের স্তম্ভ।'

মোল্লা বললো, 'আমরা। আমরা আল্লার সেবা করি এবং জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখি। আমরা না থাকলে নীতিবোধ বলে কিছু থাকতো না। দেশে বিপ্লব হতো। রক্ত ঝরতো আর সরকারের পতন হতো। আমরাই সমাজের স্তম্ভ।'

সেনা বাহিনীর অফিসার বললো, 'আমি আপনাদের সবার সঙ্গেই একমত। কিন্তু দেশ আক্রান্ত হলে কারা এগিয়ে আসে? আমরা। আমরাই সমাজের স্তম্ভ।'

অতিথিরা ধূমপান করার জন্য বারান্দায় এসে বসলো। কেউ চুরুট ধরালো, কেউবা আলবোলা। আলোচনা চলতেই থাকলো। সামনের আঙ্গিনায় একজন বৃদ্ধ কৃষক অন্যদের কাঁধে শস্যের বস্তা তুলে দিচ্ছিলো গোলাঘরে তুলে রাখার জন্য।

গৃহকর্তা বললো, 'ঠিক আছে এই বৃদ্ধ চাষীকে জিজ্ঞেস করে দেখি। ও যেটা বলবে তাই ঠিক।' সবাই রাজি হলো এবং বৃদ্ধ কৃষককে কাজ থেকে ডেকে তাদের আলোচনার বিষয় খুলে বলা হলো।

কৃষক বললো, 'আপনারা যদি সত্য জানতে চান, হুজুর, তাহলে বলি আমরা কৃষকেরা আর এই শ্রমিকেরা যারা বোঝা বইছে, যারা সকাল-সন্ধ্যা ঘাম ঝরাই তারাই সমাজে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি চাষ না করি, ফসল না ফলাই আর শ্রমিকেরা যদি কাজ না করে তাহলে কোনো জাতিরই অস্তিত্ব থাকতো না।' কথাটা বলেই সে তার কাজে ফিরে গেল। □
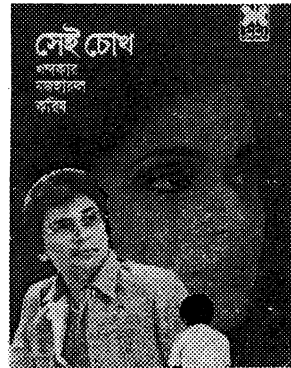
এটা এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ। গরম পড়েছে বেশ। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা ভরা আকাশটাকে দেখছি। রাত বারোটা বাজে। রুমমেটরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ঘুম আসছে না। একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আমাকে। উত্তরটা তৈরির জন্যে এই একটা রাত সময় শুধু।

আমি নীলিমা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী এই প্রশ্নের সম্মুখীন। বাবার মতে উদার আকাশের নীলের মতো অসীম উদারতা আমার মধ্যে, তাই আমি নীলিমা।

সুন্দরী নই কিন্তু মিষ্টিমেয়ে আমি। আমার মনে হয় আমার মতো সুন্দর গভীর দুটো চোখ যার আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষ পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে করতে তাকে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠতে হবে।

ক্লাসের সাহিত্যিক ছেলে জামিল আমাকে নিয়ে সবার সামনেই কাব্য-কৌতুক করে। একদিন বলেছে, 'নীলিমা তুই আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলবি না, আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়।' জামিলের এসব কথায় বন্ধু-বান্ধব সবাই মজা পায়। জামিলের কথায় সবচেয়ে বেশি তাল দেয় শিথিল।

এই শিথিল আমার প্রাণের বন্ধু। ভালো ছাত্র, অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে. সেই ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে পড়ে আসছি আমরা দু'জন। এখানেও একই সাবজেক্টে পড়ি। ওর

তুলনায় ছাত্রী হিসেবে আমি সাদামাটা।

দু'জনের এমন কিছু সুখ বা দুঃখ নেই যাতে দু'জনের সমান ভাগ নেই। আমার জীবনের সেই বিয়োগান্তক নাটকের ফলে কতো সমবেদনা জানিয়েছে, কতো কি বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে তার হিসেব নেই।

আমি খুব দুর্বল মনের মেয়ে। এক-জনকে প্রচণ্ড ভালোবেসেও বাবার অমতে তাকে আমি বিয়ে করতে পারিনি। সেই ছেলে এখন বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি নিজেকে, ও কি সত্যিই ভালোবাসতো আমাকে? শিথিলকে এধরনের কথা বললে ও বলে, 'সারা-জীবন একটা ছেলে তোর জন্যে বিয়ে না করে বসে থাকবে, এটা ভাবিস কি করে?'

আমি এখন আর কিছু ভাবি না। বাবা বিয়ের চেষ্টা করতে বলে দিয়েছি—আমার পছন্দমতো বিয়েতে তোমাদের আপত্তি ছিলো, দাওনি, সেটাকে আমি তোমাদের ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়েছি। কিন্তু আদৌ বিয়ে করা না করাটা আমার ব্যাপার। বাবা সরে গিয়েছেন সামনে থেকে, কথা বলতে পারেননি। পরে শিথিলকে ধরে-ছেন আমাকে বোঝাবার জন্যে। শিথিল আমাকে বোঝাতে এসে ধমক খেয়েছে। ওকে বলেছি, 'দ্বিতীয়বার এরকম কথা শুনলে কথা বন্ধ।' এই একটা ব্যাপার আমার জানা আছে, আমার সঙ্গে কথা না বলে শিথিল থাকতে পারবে না।

আমি বরাবরই একটু গম্ভীর ধরনের মেয়ে। কথা কম বলা আমার অভ্যাস। আর শিথিল চটপটে, আমার বারো বছরের ভাইটির মতো দুরন্ত।

একদিন কি একটা কারণে ওর মা ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে (পাশাপাশি বাস আমাদের)। অমনি এসে বাবা মায়ের সামনে থেকে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। ওর বাড়ির কাছা-কাছি যেতেই টান মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ও বলেছে, 'কি হলো?'

'ভাবছি এরকম একটা ছেলের নাম শিথিল হয় কি করে।'

থতমত খেলো একটু, তারপর বললো, 'আমি ভাবছি এমন একটা কনজারভেটিভ মেয়ের নাম নীলিমা হয় কি করে।'

শুনে রেগে গিয়েছিলাম, হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছে।

এই শিথিল আজ আমাকে প্রশ্ন করেছে, অসীম উদার নীলিমায় শিথিলের একটু জায়গা হবে কি-না?

বলেছে, সকাল সাতটায় গেটে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে, উত্তরটা ওর অনুকূলে হলে ওর হাতে একটা গোলাপ দিয়ে আসতে হবে।

আর বোঝাবার মতো করে কিছু বলতে গেলে, ক্যাম্পাস ছেড়ে বরাবরের মতো চলে যাবে। পরীক্ষা দেবে না। তারপর চেষ্টা করে বিদেশে চলে গিয়ে আর কখ-নও ফিরবে না।

আমি ভাবছি, হ্যাঁ অথবা না। দু'টোই ভাবছি। কিছু ভালো লাগছে না। হলের দারোয়ানটার হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। এদের জন্যে খারাপ লাগে আমার, নিজের বউকে বাড়িতে ফেলে এসে রাতের পর রাত অন্যের ভবিষ্যৎ বউদেরকে পাহারা দিচ্ছে। রাত দুটো বাজে রুমে এসে ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধ হয়।

হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। আশ্চর্য! বাবা হাতে একটা লাল গোলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমাকে দেয়ার জন্যে।

ঘড়িতে এখন পাঁচটা বাজে। দরজা খুলে বাইরে এলাম। আকাশটা আস্তে আস্তে ফর্সা হচ্ছে। কালকের মতো মেঘ নেই আর। নতুন একটা সূর্য উঠবে হয়তো। □

এ যেন চিরন্তন জীবন রহস্যের এক বিচিত্র ইতিহাস—ডুমার সাহিত্যকর্মের চেয়েও অধিক প্রাণবন্ত, বাঙময়, রোমাঞ্চে ভরপুর।

আলেকজাণ্ডার ডুমা

পলাশ চৌধুরী

আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগের কথা। বিশ্ববিখ্যাত নেপোলিয়নের সৈন্য বাহিনীর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল টমাস ডুমা মনে পুঞ্জিভূত ক্রোধ নিয়ে প্যারিস ত্যাগ করলেন। কূটনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে এক সময়ের নেপোলিয়নের প্রিয়পাত্র জেনারেল টমাস সম্রাটের আস্থা হারিয়েছেন। স্বয়ং সম্রাটের কাছ থেকে অমর্যাদাপূর্ণ আচরণ পেয়েছেন তিনি। প্যারিস ত্যাগ করে ভিলে কোৎরে নামক এক গ্রামে আশ্রয় নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ হিসেবে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম

করে যাবেন।

ভিলে কোৎরে গ্রামে ১৮০২ সালের ২৪শে জুলাই টমাসের স্ত্রী মেরীর কোল আলো করে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিলো। টমাস পুত্রের নাম রাখলেন বিশ্ববিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সাথে মিল রেখে। মনে আশা ছিলো, এই পুত্র একদিন আলেকজাণ্ডারের মতো মহা পরাক্রমশালী বীর হয়ে তাঁর প্রতি নেপোলিয়ন কর্তৃক লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবে। অবশ্য তাঁর এ অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। জেনারেল টমাসের এই পুত্রের অসির ঝংকার আলেকজাণ্ডারের মতো বিশ্বজুড়ে আলোড়ন না তুললেও তাঁর মসির খ্যাতি শুধু ফ্রান্সেই নয়, পৃথিবী জুড়ে আপন বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। টমাসের এই বিশ্ববিখ্যাত পুত্রের নাম আলেকজাণ্ডার ডুমা। পৃথিবীর ক্লাসিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীকারদের সম্মুখ সারির এই লেখক প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বিচারেও পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয়।

আলেকজাণ্ডার ডুমা যখন মাত্র চার বছরের শিশু তখন তাঁর বীর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। টমাসের মৃত্যুর পর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে মেরীর চারপাশে। দারিদ্রের কঠিন পীড়নের মাঝে এরপর দিন অতিবাহিত হতে থাকে। শিশুপুত্র ডুমাকে নিয়ে মেরীর ভাবনার অন্ত রইলো না। তবুও জীবন কারো জন্যে থেমে থাকে না, বালক ডুমা কঠোর দারিদ্রের মাঝেও বড় হয়ে ওঠে। অর্থাভাবে তখন স্কুলে পড়তে পারলেন না তিনি। কিন্তু শৈশব থেকেই লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ থাকায় এতোসবের মধ্যেও তাঁর বিদ্যার্জন থেমে থাকেনি। অনাহারে অর্ধাহারে থাকলেও ফাঁক পেলেই তিনি বই পড়তেন। ডুমার হাতের লেখা দেখতে খুব সুন্দর ছিলো। তাঁর এই গুণটি তাঁর জীবনের মোড়কে কিছুটা ঘুরিয়ে দিলো। সুন্দর হস্তাক্ষর দেখে এক অফিসের কর্মকর্তা একটা ছোট্ট কাজ দিলেন তাঁকে। কগজপত্রের কপি করতে হবে, অনেকটা কেরানীর কাজ। সেই সময়ে দারিদ্রের অকূল সাগরে কিছুটা আলোর সন্ধান মিললো যেন। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মিটতেই তাঁর জ্ঞান পিপাসা আবারো প্রবল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত রচনা পড়া হয়ে যায় তাঁর। এসবের মাঝে তিনি এক অনাবিষ্কৃত জগতের স্বাদ পেলেন যেন।

স্বল্প বেতনের কেরানী হয়ে জীবন কাটাবার মতো মানসিকতা তাঁর ছিলো না; একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন প্যারিসে, ১৮২৩ সালে। এই যাত্রা তাঁর জীবনে নুতন মাত্রা যোগ করেছিল।

আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। এই ব্যাপারে সচেতন ছিলেন ডুমা নিজেও; ভেবেছিলেন অভিনেতা হিসেবে নাম-টাম করতে পারবেন। বহুদিন মনের এই ইচ্ছাটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এবার প্যারিসে পা রাখতেই তাঁর সুপ্ত বাসনার তাড়নায় হাজির হলেন তৎকালীন প্যারিসের এক বিখ্যাত অভিনেতার ঠিকানায়। ঐ অভিনেতার কাছ থেকে তেমন কোনো উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেলেন না ডুমা। বিফল মনোরথে ফিরে এলেন তিনি। পরে ঐ অভিনেতা তাঁকে নাটক লিখতে বললেন। প্রস্তাবটা অপছন্দ হলো না তাঁর। অভিনেতা হবার স্বপ্নটা ঝেড়ে ফেলে মনোনিবেশ করলেন লেখায়; বেশ কিছু নাটক লেখা হলো, মঞ্চস্থ হলো। কিন্তু প্রথমে তেমন একটা প্রত্যাশিত নাম-টাম করতে সক্ষম হলেন না তিনি। অন্য কোনো পেশার কথা ভাবছেন এমনি সময় তাঁর লেখা দু'টি নাটক 'হেনরী থার্ড' এবং 'অ্যান্টনী' অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। নাট্যকার হিসেবে প্যারিসে বিখ্যাত হয়ে গেলেন ডুমা। অজস্র ভক্ত জুটে গেল

তাঁর। ফলস্বরূপ অর্থকষ্টও তাঁর আর থাকলো না।

এসময় তিনি একটা গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্ব এই সংগঠনটি ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু তাঁর বিপ্লবী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ডুমা পালিয়ে যান সুইটজারল্যাণ্ডে। ধর্মযাজকের আবরণে আত্মগোপন করে রাখেন নিজেকে। বহুদিন পর আবার ফিরে এলেন ফ্রান্সে। এবার আর নাটক নয়; স্থির করলেন উপন্যাস লিখবেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন ডুমা। স্কট রচিত 'আইভ্যানহো' 'তালিসম্যান' প্রভৃতি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস তাঁর মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবেন বলেই কলম ধরলেন। 'সিয়্যাকল' পত্রিকাতে তাঁর লেখা 'থ্রি মাস্কেটিয়ার' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে সবার প্রশংসা দৃষ্টি কুড়াতে সক্ষম হলো। শেষে ক্রেতাদের লাইন দিতে হলো পত্রিকা সংগ্রহ করতে। উপন্যাসটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

ডি' আরতানাঁ নামের এক সদ্য কৈশোর পেরুনো তরুণ প্যারিসে পৌঁছলো ঘোড়ায় চড়ে। পরনে সৈনিকের পোশাক, হাতে চকচকে তরবারি। তার কাছে একটা চিঠি, রাজার রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি ফ্রান্সের তৃতীয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তি যুবকের পিতৃবন্ধু মঁসিয়ে দ্য ত্রেভিলেকে লেখা। রাজা লুইয়ের মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে ভর্তি হতে চায় যুবক, সে জন্যেই সুপারিশ করা হয়েছে চিঠিতে। তখন রাজার রক্ষীদের বলা হতো মাস্কেটিয়ার। রাজ্যের সেরা বীর যুবকদের নেয়া হতো এই বাহিনীতে। সারা দেশ থেকে বাছাই করে শ্রেষ্ঠ যুবকদের মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে নির্বাচন করা হতো। দেশের লোকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলো তাঁরা, তাঁদের বীরত্বের কাহিনী নিয়ে তৈরি গাঁথা লোকমুখে ফিরতো, দেশের মানুষের মুখে গর্বের সাথে উচ্চারিত হতো তাদের নাম। মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে মনোনীত হওয়াটাও তাই যুবকদের কাছে রঙিন স্বপ্নের মতো ছিলো। ডি' আরতানাঁও তাই প্যারিসে এসেছে জীবনের এই স্বপ্নীল ইচ্ছাকে সার্থক করতে। রাজার রক্ষী বাহিনীর তিন সেরা মাস্কেটিয়ার হলো অ্যাথোস, পর্থোস এবং আরামিস; ডুয়েল লড়তে গিয়ে আশ্চর্যভাবে ওদের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল ডি-আরতানাঁর। মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া হলো তাকে। এরপর একে একে রোমহর্ষক ঘটনাপুঞ্জের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে কাহিনী। তলোয়ারের ঝনঝনানি আর অশ্বখুরের শব্দ 'থ্রি মাস্কেটিয়ার' বইটির প্রায় প্রতি পাতাতেই শোনা যায়। ডি' আরতানাঁর জীবন যেন ডুমারই প্রতিচ্ছবি। দু'জনেই ভাগ্যের অন্বেষণে প্যারিসে এসেছিলেন; এরপরই তিনি ভিডি ভিসি—এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। ফ্রান্সের অখ্যাত গ্রাম থেকে এসে মান-সম্মান, অর্থ প্রতিপত্তি সবই পেয়েছিলেন দু'জনেই। একজন 'অসি' দিয়ে অপরজন 'মসি' দিয়ে। ডুমা তাঁর বীর পিতার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়েছেন 'পর্থোস' চরিত্রের মাঝে।

'থ্রি মাস্কেটিয়ার' ছাড়া আরেক বিখ্যাত রচনা 'কাউণ্ট অভ মন্টিক্রিস্টো' 'জার্নাল দ্য দেবা'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন তোলে। একে একে তিনি আরো অনেকগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন। সেসব উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির সময় একান্ত হয়ে যেতেন এর সাথে, তন্ময় হয়ে পার করে দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখনও সৃষ্ট চরিত্রের সাথে কথোপকথন চলতো তাঁর। এমনি ভাবে এক একটি অবিস্মরণীয় উপন্যাসের জন্ম হতে লাগলো।

(১২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

আমরা তখন ক্লাস নাইনে। একে তো বছরের প্রথম দিক তার উপর অংক ক্লাশ আর তারও উপর নিতান্তই সাদা-সিধে একজন টিচার। কম-বেশি সব ছাত্রীই ফাঁকি দিতাম। ক্লাশেই ঠিকমত অংক করতাম না, হোম টাস্ক করে আনাতো অনেক দূরের কথা। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রীই ফাঁকিবাজদের দলে পড়তো বলে স্যার বড় একটা শাস্তিও দিতে পারতেন না। প্রায় এক ক্লাশ মেয়ে শাস্তি পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে—এটা বোধহয় তাঁর ভাবতে ভালো লাগতো না। কিন্তু এভাবে উনি আমাদের সাথে পেরেও উঠছিলেন না।

একদিন, স্যারের মেজাজ বেশ গরম—কে কে হোম টাস্ক এনেছো দাঁড়াও—বলতে দেখা গেল তেতাল্লিশ জনের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচজন মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি ছিলাম ঐ চার-পাঁচ জনেরই একজন। দুর্ভাগ্যই বটে! কারণ, স্যার সেদিন ভীষণ রেগে গিয়ে নির্দেশ দিলেন—যারা হোম টাস্ক এনেছো, তারাই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকো।

স্বাতী
সাগরপাড়া,
রাজশাহী।

পূর্ব পাকিস্তান

আমার ক্লাসমেট আলীনূরকে নিয়ে এই ঘটনা। আমরা তখন অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। পড়াশোনার চাপ স্বভাবতই একটু বেশি পড়েছিল। আমাদের পড়াশোনার অগ্রগতি কদ্দূর হলো তা নির্ধারণ করার জন্য মাঝেমধ্যেই শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা নেয়া হতো। এমনি একদিন বাংলা স্যার তাঁর বিষয়ের উপর পরীক্ষা নিলেন। পরীক্ষাটি হয়েছিল শুধুমাত্র ব্যাকরণ অর্থাৎ সন্ধি, সমাস, কারক, এক কথায় প্রকাশ প্রভৃতির উপর। দু'দিন পর স্যার যখন ক্লাসে খাতা দিতে এলেন তখন আলীনূরের খাতাখানি আমাদের পড়ে শোনালেন। প্রশ্নে 'যা পূর্বে ছিলো এখন নাই—' বাক্যটিকে এক কথায় প্রকাশ করতে বলা হয়েছিল। আলীনূর উত্তরে লিখেছে '—পূর্ব পাকিস্তান'।

মোঃ মাহবুব কবীর
টঙ্গী, গাজীপুর।

কথাটা বলা উচিত কার, আর বলে কে?

আমার পাঁচ বছরের ভাগনা সানি, মাঝে মাঝে এতো মজার মজার কথা বলে যে হাসতে হাসতে সবার পেটে খিল ধরে যায়।

এই তো সেদিন, আপা দুঃখ করে বললো, 'ইস, আমার ছেলেটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।' সানি চট করে বলে উঠলো, 'ভেবো না, আম্মু, বৃষ্টি হলেই ভিজে যাবো।'

আর একদিনের ঘটনা। বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলাম। এমন সময় সানি এলো আমার সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার জন্য। পড়ার সময় বিরক্ত করাতে ভীষণ রেগে গেলাম। বকা দিতেই সানি ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। তারপর একতরফা মেরেই চললো। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে, উঠে ওর দুই হাত, দুই পা এক সঙ্গে করে ধরে রাখতেই ও চোখ পাকিয়ে বললো, এখন ? 'বিরক্ত করছো কেন ?'

ফারহানা চৌধুরী
'চৌধুরী বাড়ি' দিলালপুর,
পাবনা।

কৈ মাছের প্রাণ

তখন দশম শ্রেণীতে পড়তাম। প্রথম পিরিয়ডেই ছিলো বাংলা দ্বিতীয় পত্র ক্লাস। একদিন আপা ক্লাসে এসেই অনেক-গুলো বাগধারা লিখতে দিলেন। সবাই লিখে খাতা জমা দিয়েছি। আপা একমনে খাতা কারেকশন করছেন। হঠাৎ চোখে পড়লো পেছনের বেঞ্চিতে বসা আমার এক দুষ্টু বান্ধবী পাশের বান্ধবীটির খাতা হাতিয়ে নেয়ার খুব চেষ্টা করছে। আপা ক্লাসে থাকায় কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ঘন্টা শেষে আপা ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতেই দুষ্টু বান্ধবীর কাছে ব্যাপার জানতে চাইলাম। এবারে ও দ্বিগুণ মজা পেয়ে পাশের বান্ধবীটির কাছ থেকে ওর খাতাটা একরকম কেড়ে নিয়েই দৌড়ে কাছে এলো। সবাই মজা পেয়ে ঝুঁকে পড়লাম খাতায় কি আছে দেখার জন্য। কিন্তু খাতায় লেখা বাক্যটার প্রতি চোখ যেতেই সবার আক্কেল গুড়ুম। পর মুহূর্তেই হাসিতে পেটে খিল ধরার দশা। আপার দেয়া অনেকগুলো বাগধারার মধ্যে একটি বিষয় ছিলো 'কৈ মাছের প্রাণ'। আর তাই দিয়ে আমার সেই খাতার মালিক বান্ধবীটি বাক্য রচনা করেছে-'ঐ গাছটির ডাল ভাঙ্গিও না, ডাল ভাঙ্গিলে গাছটি মরিয়া যাইবে। ও যেন কৈ মাছের প্রাণ।'

আফরোজা সুলতানা রুমী
আলমনগর (নূরপুর),
রংপুর।

কাউ ইংরেজী গরু

আমার ভাইয়ার একটিমাত্র ছেলে নাম তৌসিফ। ওর বয়স পৌনে তিন বছর। কিন্তু এই বয়সেই সে দারুণ বুদ্ধিমান। সব বিষয়ের প্রতিই তার খুব কৌতূহল। সব সময়ই সে সবাইকে এটার ইংরেজী কি ওটার ইংরেজী কি জিজ্ঞেস করে এবং প্রশ্নের উত্তরটা ঠিকই মনে রাখে। সেদিন ভাবী ওকে জিজ্ঞেস করলো আচ্ছা তৌসিফ রসুন ইংরেজী কি ? ও বললো গারালিক। তারপর ও নিজে নিজেই আমাকে বললো জানো আদা ইংরেজী কি ? বললাম না আমি জানি না তুমি বলো। বললো জিন-জার। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলো পদ্মফুল ইংরেজী জানো ? বললাম না তুমি বলো। ও বললো লোটাস। ও জিজ্ঞেস করলো তারা ইংরেজী জানো ? বললাম না তো তুমি বলো। ও বললো তারা ইংরেজী স্টার। সবশেষে ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কাউ ইংরেজী জানো ? আমি অবাক হয়ে বললাম না তো তুমি জানো ? সে বললো কাউ ইংরেজী গরু। উত্তর শুনে আমার কি অবস্থা আপ-নারাই বুঝে নিন।

রুবা
বড় মগবাজার,
ঢাকা-১৭।

এইডস ভাইরাস বিতর্ক

'এইডস' রোগের কারণ হিউম্যান ইমমিউনো ডেফিশিয়েনসি ভাইরাস সংক্ষেপে এইচ আই ভি বলে সাধারণ ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কিন্তু বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অণু-জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক পিটার ডুয়েসবার্গ কথাটা মানতে মোটেও রাজি নন। ব্রিটেনের খ্যাতনামা বিজ্ঞান সাপ্তাহিকী নিউ সায়েনটিস্টকে দেয়া এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলে-

ছেন যে, বিশুদ্ধ এইচ আই ভি ভাইরাস পাওয়া গেলে তা ডুয়েসবার্গ নিজের শরীরে প্রবেশ করাতে দ্বিধা করবেন না। এইচ আই ভি দ্বারা সংক্রামিত হতে ডুয়েসবার্গের মোটেও আপত্তি নেই।
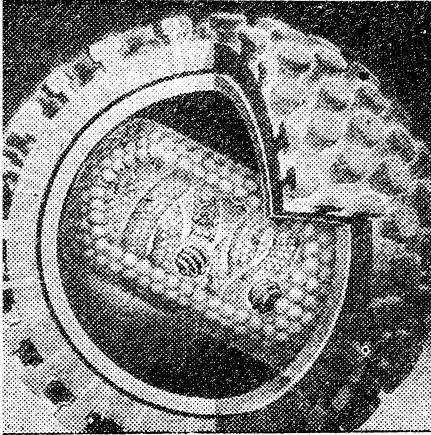
আমাদের দেহ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক গুরু দায়িত্ব পালন করে রক্তের টি-হেলপার সেল। কোনো ক্ষতিকর জীবাণু দেহে ঢোকার সাথে সাথে এই সেল সারা শরীরে সংকেত দিতে থাকে। এই সংকেত পাওয়া মাত্র দেহ বি-সেল নামে ভিন্ন আরেক সেল তৈরি করতে শুরু করে। দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার লড়াকু সৈনিক মূলত বি-সেল। বি-সেল হানাদার জীবাণুর সাথে সরাসরি লড়াইয়ে নামে। এইডস-এর ভাইরাস দেহে ঢোকা মাত্র টি-হেলপারকে নিকেশ করে দেয়। ফলে দেহের প্রতিরক্ষা যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে গোড়াতেই অচল হয়ে পড়ে। বি-সেলের যোদ্ধারা যুদ্ধের কোনো খবরই পায় না, নির্বিবাদে অন্যান্য জীবাণুরা দেহ দখল করে নেয়। ফলে বিরল সংক্রমণ বা ক্যান্সার দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে দেহধারী।

এইচ আই ভিকে রেট্রো ভাইরাস বলে মনে করেন অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক। ডুয়েসবার্গের মতে রেট্রোভাইরাসের স্বভাব-চরিত্রের সাথে এইডস সৃষ্টিকারী এইচ আই ভির মিলের চেয়ে অমিল বেশি। এইচ আই ভি টি-সেল ধ্বংস করে এইডস ঘটায় বলে মনে করা হয়। অন্যান্য ভাইরাসের মতো রেট্রোভাইরাস টি-সেল মেরে ফেলে না। টি-সেল ছাড়া এই জাতের ভাইরাস বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না। কাজেই রেট্রোভাইরাস গোত্রীয় হয়ে এইচ আই ভি একই সাথে টি-সেল ধ্বংস করবে আবার দেহে বংশ বৃদ্ধি করবে তা তো হতে পারে না।

সাধারণভাবে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস জৈবরাসায়নিক দিক থেকে অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়। অন্য ভাবে বলতে গেলে দেহ কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ও সংক্রমণের প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকতে হবে এ জাতীয় ভাইরাসের। এইচ আই ভি জৈবরাসায়নিক দিক থেকে মোটেও সক্রিয় নয় বলে ডুয়েসবার্গ জানান। দশ হাজারের মধ্যে মাত্র একটা টি-সেলকে সংক্রামিত করে এইচ আই ভি ভাইরাস। এ যেন দৈনিক এক

ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত হারানোর মতো ব্যাপার। দশ হাজার বছর ধরে এমনটা চললেও আমার বা আপনার কোনো ক্ষতি হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এইডস কমিশনকে কথাটা বলেছেন ডুয়েসবার্গ।

ভাইরাস দেহে ঢোকার এক দু'মাসের মধ্যেই সাধারণত রোগের উপসর্গ তৈরি করে। কিন্তু এইচ আই ভি পাঁচ থেকে সাত বছর বাদেও উপসর্গ তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হয়। ভাইরাস ক্রিয়াশীল থাকার সময়ে রোগীর সংস্পর্শে আসলেই রোগের বিস্তার ঘটে। এইডসের বেলায় এটা হয় না।

অন্যান্য রোগের বেলায় দেহে এন্টিবডি পাওয়া গেলেই মনে করা হয় দেহ সুস্থ হচ্ছে কিন্তু এই সনাতনী ভাবনা এইডসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। বরং এইচ আই ভির এন্টিবডি পাওয়া গেলে মনে করা হয় যে এইডস হচ্ছে।

কোনো ভাইরাসকে কোনো রোগের আসামী হিশেবে চিহ্নিত করতে গেলে সব সময় 'কক্স-এর চারটা শর্ত' পূরণ করতে হয়। এইচ আই ভি-র বেলায় দেখা যাচ্ছে সে চারটার মধ্যে দুটো শর্তই মানা হচ্ছে না। ডুয়েসবার্গের মতে এইডসে আক্রান্ত সব রোগীর দেহে এইচ আই ভি পাওয়া যায়নি। পরীক্ষাগারে প্রাণী দেহে এইচ আই ভি প্রবেশ করিয়েও সব সময় এইডস তৈরি করা যায়নি।

সমকামী এবং শিরাপথে নেশা গ্রহণ কারীদের মধ্যে এইডস ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়বে বলে কথিত ভবিষ্যদ্বাণীও আশানুরূপ ভাবে ফলেনি, ডুয়েসবার্গ বলেন।

রেট্রো ভাইরাস গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ হ্যারি রবিন সমর্থন করেছেন ডুয়েসবার্গকে। ওর‍্যাল পোলিও ভ্যাকসিন উদ্ভাবক আলবার্ট স্যাবিন মনে করেন ডুয়েসবার্গের কথাবার্তা 'অতিশয় অতিশয়' গুরুত্বপূর্ণ। ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জিন আনকো জিনের সহ আবিষ্কারক হিশেবে ইতিমধ্যে ডুয়েসবার্গ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি মার্কিন জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য।

এইডস গবেষক বিজ্ঞানীদের বেশির ভাগ অবশ্য ডুয়েসবার্গের যুক্তি মেনে নেননি। তাঁরা একে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দাগী মাছ

এক জাতের ঈল মাছের চামড়া থেকে ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক কার্ডের খাপ বানানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই খাপ ব্যবহারকারী হাজার হাজার ক্রেতা নালিশ করেছে যে তাদের ব্যাংক কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের ইলেকট্রনিক সংকেত গড়বড় হয়ে গেছে বা মুছে গেছে।
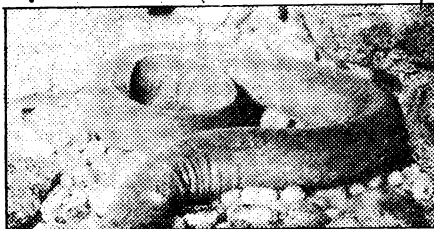
কারো কারো মতে ঈলের স্নায়ুতন্ত্রে চৌম্বক শক্তি থাকে, যেন এই মাছ পৃথিবীর ভূ-চৌম্বকত্ব টের পায়। এই চৌম্বকশক্তির অংশ বিশেষ হয়তো কোনো ভাবে চামড়ায় লেগে থেকে এ জাতীয় বিপত্তি ঘটাচ্ছে। কেউ কেউ মনে করছেন আসলে তা নয় এই মাছের চামড়ায় বিশেষ এক জাতের শ্লেষ্মা থাকে। সঠিক ভাবে চামড়া শুকানো না হলে এটা চামড়ায় থেকে যায়। বিপত্তির পেছনে হয়তো এই শ্লেষ্মার ভূমিকা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত থেকে বোঝা যাচ্ছে কেউ এখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি।

সঙ্গ মহিমা

মর্দা পশুর অনেক প্রজাতি যেমন বাঘ, আফ্রিকান সিংহ, একজাতের ইঁদুর সুযোগ পেলেই শাবক হত্যা করে। আমাদের চোখে ব্যাপারটা নিষ্ঠুর মনে হলেও এর একটা দরকার আছে। শাবক হারানোর ভয়ে মাদী পশু হন্যে থাকে ফলে সে সময়টা মর্দা পশুর সাথে মিলিত হয় না, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভও ধারণ করে না। মাদী পশু শাবকের যথার্থ যত্ন করতে পারে। না হলে শাবক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মরে যেতো। বংশ রক্ষার ক্ষেত্রে এই হিংস্রতা কাজে দেয়।

শাবক থাকা অবস্থায় মাদী পশু হিংস্র হয়ে ওঠে। কাছাকাছি কোনো মর্দা পশু এলে আঁচড়ে খামচে দেয়। শাবক হত্যাকারী হিংস্র মর্দাকে হটানোর জন্য পদ্ধতিটা সব সময় ফল দেয় না।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন গবেষক জুলি ম্যানিলা ও হাওয়ার্ড মোলজ দেখতে পেয়েছেন হিংস্র মর্দাকে শান্ত করার নৈসর্গিক আরেকটা পন্থাও আছে। গর্ভাবস্থায় মাদী পশুর সাথে অন্য একটা 'কুমার' মর্দা পশু বিভিন্ন সময়ে একত্রে রেখে গবেষকদ্বয় দেখতে পেয়েছেন যে একত্রে থাকার সময় যতো দীর্ঘ হয় মর্দা পশুর হিংস্রতা ততোই হ্রাস পায়। এমনকি মর্দাটা ঘাতক থেকে সন্তান বৎসল পিতায় পরিণত হয়।

মাদী দেহের এক জাতের দেহ-সৌরভ (ফেরোমেন) লিউটিনাইজিং হরমোন-রিলিজিং হরমোন (সংক্ষেপে এল এইচ আর এইচ) এ জন্য দায়ী বলে গবেষকদ্বয় মনে করছেন।

মহাকাশ বন্দর

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড সরকার কেপ ইয়র্ক দ্বীপমণ্ডলীতে আন্তর্জাতিক মহাকাশ বন্দর গড়ে তোলার জোর তোড়জোর চালাচ্ছেন। সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগ-

রীয় অঞ্চলের উপগ্রহ নিক্ষেপণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে এ অঞ্চলটা। এছাড়া এশিয়া, প্রশান্ত মহা-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ও অস্ট্রেলিয়াকে ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার সাথে সংযোগকারী নয়া জাতের নভো-বিমান কেন্দ্রও হবে এই মহাকাশ বন্দর।
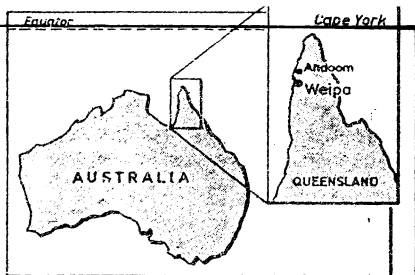
ইতিমধ্যে সোভিয়েত মহাকাশ প্রতিষ্ঠান গ্লাভকসমস, চৈনিক মহাকাশ প্রতিষ্ঠান, মার্কিনী মূল ত্রয়ী মহাকাশ কোম্পানী — জেনারেল ডাইনামিকস, মার্টিন মেরিয়েটা ও ম্যাক ডোনেল ডগলাস সহ জাপানী প্রতিষ্ঠান এই কেন্দ্র ব্যবহারের আগ্রহ দেখিয়েছে।
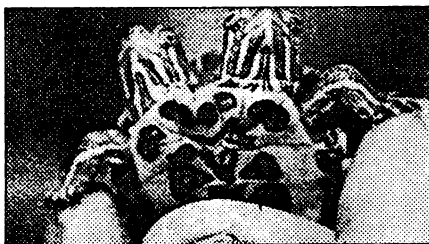
দু'মাথাওয়ালা কচ্ছপ

দু'মাথাওয়ালা কচ্ছপটির দুই মাথার নাম 'মো' ও 'জো' ফ্লোরিডারস্থ পেট শপ 'উইন্টার হেভেনের' মালিক কেন রবার্টসনের সংগ্রহ। প্রাণীটার দাম ১০ হাজার ডলার উঠেছে। রবার্টসন বিক্রি না করে এটাকে নিজের জন্য রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
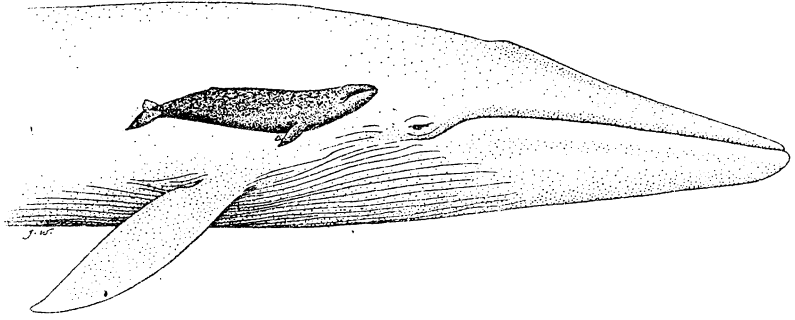
সেন্ট্রাল ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল থেকে অদূরবর্তী দ্বীপে ক্ষুদ্রতম ব্যালিন তিমির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, মনে করা হচ্ছে। ১৩ মিলিয়ন বছর আগে তিমিটা সাগরে বিচরণ করতো, লম্বায় এটি মাত্র ৫ মিটার অর্থাৎ প্রায় বর্তমান কালের একটা বোতলনাসা ডলফিনের সমান।

সাগর বিজ্ঞানের ছাত্র ব্রায়ান ফ্যাডলে হাতী সিলের সাঁতার আচরণ পর্যবেক্ষণের সময় ঘটনাক্রমে জীবাশ্মটি পান। একটা জং ধরা পাইপ দিয়ে খুঁচিয়ে তিমির জীবাশ্মভূত করোটিটি তুলে আনেন ফ্যাডলে।

ব্রায়ান ফিডলে ব্যালিন তিমির জীবাশ্ম হাতে। উপরে বোতলনাসা ডলফিনের সাথে ব্যালিন তিমির আনুপাতিকআকার।

জীবাশ্মটি প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিমির কানের হাড় খুব নরম। সাধারণত জীবাশ্মে এটি পাওয়া যায় না। এই জীবাশ্মে কানের হাড়ও অটুট রয়েছে। ফলে জলজ স্তন্যপায়ীদের শ্রবণ শক্তি কি করে শক্তিশালী হলো তার গবেষণা সহজতর হবে। করোটির অবস্থা দেখে মনে হয় এটি পূর্ণ বয়স্ক ব্যালিন তিমির জীবাশ্ম। বর্তমান কালের ব্যালিন তিমি আকারে এরচেয়ে বড়ো। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো প্রাণী নীল তিমি। □

আমিল বতুল

কিশোর থ্রিলার

ড্রাগন

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

পূর্ব প্রকাশিতের পর

'হুপ।' আতংকিত দৃষ্টিতে ছেঁড়া হাতটার দিকে চেয়ে রয়েছে কিশোর। একেবারে রক্ত-মাংসের মনে হচ্ছে। হাত থেকে ওটা ছেড়ে দিলো সে।

কিশোরের চিৎকারে ফিরে তাকালো অন্য দুই গোয়েন্দা।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'আরি!' বলে উঠলো রবিন। 'একটা হাত!'

কথা ফুটলো কিশোরের, 'এটা···এটা মিস্টার মারটিনের হাত। হ্যাণ্ডশেক করার সময় ছিঁড়ে এসেছে।'

বাড়ির ভেতর থেকে জোর হাসি শোনা গেল। শেষ হলো চাপা কাশির মতো শব্দ দিয়ে, আচমকা গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন।

কিশোরের মুখে রক্ত জমলো। 'গাধা বানিয়েছে আমাকে মারটিন। রসিক লোক সে, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

হাতটা তুলে দুই সহকারীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো সে।

মাথা নাড়লো মুসা।

রবিন নিলো হাতটা। 'এক্কেবারে আসল মনে হয়। ডান হাত নেই আরকি মিস্টার মারটিনের, আরটিফিশিয়াল। জোরে ঝাঁকুনি দিয়েছো, খুলে চলে এসেছে।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'মনে হয় না। হাসলো, শুনলে না। ওর আরেক রসিকতা। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যে উদ্ভট সব কাণ্ডকারখানা করে রেখেছে।'

'হ্যাঁ।' মুখ বাঁকালো মুসা। 'কাজ না থাকলে আর কি করবে? চলো, আর কিছু করে বসার আগেই ভাগি।'

হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো রবিন।

জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলো তিনজনে।

ফুলের জাফরিটার ভেতর দিয়ে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে এলো। থেমে গেল ধাতব গেটটার কাছে এসে।

নিশব্দে খুলে গেল পাল্লা।

পথে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

'যাক, বাঁচা গেল।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো রবিন। 'মানুষকে কামড়ানোর জন্যে গেটটায় যে কোনো ব্যবস্থা রাখেনি, এতেই আমি খুশি।'

'থেমো না, হাঁটো,' হুঁশিয়ার করলো মুসা। 'এখনও বিপদমুক্ত নই আমরা।'

দূরে এসে থামলো ওরা, হাঁপাচ্ছে।

'এবার কি?' রবিনের প্রশ্ন। 'বোরিসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবো?'

'তারচেয়ে চলো রকি বীচের দিকে হাঁটতে থাকি,' প্রস্তাব দিলো মুসা। 'এখানে যে কারবার, তাতে বিশ মাইল হাঁটাও কিছু না, অন্তত নিরাপদ জায়গায় তো গিয়ে পৌছবো।'

নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ছেড়ে দিলো কিশোর। ঘড়ি দেখলো। 'সময় আছে এখনও। নিচে গিয়ে গুহাটা একবার দেখলে কেমন হয়? কি বলো?'

একটা পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকালো মুসা। 'ওই ড্রাগনের গুহা? আমি বলি কি, কিশোর, এই একটা রহস্য তুমি ভুলে যাও। বাদ দাও কেসটা।'

রবিনের দিকে ফিরলো কিশোর। 'তুমি কি বলো?'

'মুসার সংগে আমি একমত। মারটিন কি বললো, মনে নেই? খুব বিপজ্জনক জায়গা। ড্রাগনের কথা না হয় বাদই দিলাম, ভূমিধ্বসও কম খারাপ না।'

পাড়ের কাছে এসে দাঁড়ালো কিশোর। উঁকি দিয়ে নিচে তাকালো একবার। পুরনো কাঠের সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে বললো, 'না দেখে ফিরে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? দেখে গেলে, বাড়ি গিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার একটা বিষয় পাবো। না দেখে গেলে কি বুঝবো?'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলো সে।

রবিনের দিকে তাকালো মুসা। 'আমাদের মতামতের কোনো দামই দিলো না? তার কথা কেন শুনতে যাবো?'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো রবিন। 'জানোই তো, ও গোঁয়ার। যা বলে, করে ছাড়ে। ধরে নাও না, আমরা ওর চেয়ে অনেক বেশি ভদ্রলোক,' হাসলো সে।

মুসাও হাসলো। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো। আমরা ভদ্রলোকই। চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। কে জানে, মারটিন আবার কোনো উড়ুক্কু ঝামেলা ছুঁড়ে মারে। হেরিঙকেও বিশ্বাস নেই। মানুষের ওপর টার্গেট প্র্যাকটিসের শখ চাপলে মরেছি।'

রেলিঙ ধরে নামতে শুরু করলো রবিন।

তার পর মুসা।

খুবই পুরনো সিঁড়ি, সরু, ধাপগুলো বেশি কাছাকাছি, নড়বড়ে। ক্যাঁচম্যাচ করে উঠছে। খাড়াও যথেষ্ট।

ভয়ে ভয়ে নামছে দুজনে। নিচের দিকে তাকাচ্ছে না।

ওপরে তাকালো কিশোর। দুই সহকারী নামছে দেখে মুচকি হাসলো। কিন্তু হাসি মুছে গেল শিগগিরই। পনেরো ফুট ওপরে রয়েছে তখনো, এই সময় ঘটলো অঘটন।

কোনো রকম জানান না দিয়ে মুসার ভারে ভেঙে গেল একটা তক্তা। পিছলে গেল পা। রেলিঙ চেপে ধরে পতন রোধ করার অনেক চেষ্টা করলো সে, পারলো না। জোরাজুরিতে রেলিঙের জোড়াও গেল ছুটে। নিচে পড়তে শুরু করলো সে।

মুসার চিৎকারে চমকে ওপরে তাকালো রবিন। তাড়াতাড়ি নামার চেষ্টা করলো। কিন্তু কয় ধাপ আর নামবে? তার গায়ের ওপর এসে পড়লো মুসা।

রবিনের হাতও ছুটে গেল। সে-ও পড়তে লাগলো।

ময়দার বস্তার মতো এসে কিশোরকে আঘাত করলো যেন দুটো শরীর। ঠেকানোর প্রশ্নই ওঠে না। রেলিঙ ভাঙলো, পায়ের নিচের তক্তা ভাঙলো, ভেঙে সবশুদ্ধ নিয়ে নিচে পড়তে শুরু করলো কিশোরের শরীর।

ধুপ ধুপ করে নিচে পড়লো তিনটে দেহ।

কিশোরের ওপর কে পড়লো দেখার সময় পেলো না সে, তার আগেই মাথা ঠুকে গেল পাথরে।

আঁধার হয়ে গেল সব কিছু।

'কিশোর, তুমি ঠিক আছো?'

মিটমিট করে চোখ মেললো কিশোর। মুসা আর রবিনের চেহারা আবছা দেখতে পেলো, কেমন যেন হিজিবিজি দেখাচ্ছে দুটো মুখই, চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাড়া দিয়ে আবার মেললো সে। উঠে বসলো। চোখের পাতায় লেগে থাকা বালি সরালো, মুখের বালি পরিষ্কার করলো, তারপর বললো, 'হ্যাঁ, ঠিকই আছি। আমার ওপর কে পড়েছিলো?'

লজ্জিত হেসে বললো মুসা, 'আমি।'

'নাকমুখ ভোঁতা করে ফেলেছো। বালিতে দেবে গিয়েছিলো তাই রক্ষা।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। আশপাশে ভাঙা তক্তা পড়ে আছে, তার একটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। না, এটাতে নেই। ফেলে

দিয়ে আরেকটা তুললো। চতুর্থ তক্তাটা এক নজর দেখেই মাথা ঝাঁকালো সে। 'মুসা, তোমার কোনো দোষ নেই। তোমার ভারে ভেঙেছে বটে, তবে কারসাজি করে না রাখলে ভাঙতো না। এমন ভাবে করে রেখেছে, যাতে পায়ের চাপে ভেঙে যায়।'

দুই সহকারীর দিকে কাঠটা বাড়িয়ে দিলো সে। 'ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে। নিচের দিকে কেটেছে, যাতে দেখা না যায়।'

হাতে নিয়ে রবিন আর মুসাও দেখলো।

রবিন বললো, 'ঠিক বোঝা যায় না। ধরলাম, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমরা নামবো, এটা কে জানে?'

'ঠিক,' রবিনের কথায় সায় দিয়ে বললো মুসা। 'কিশোর, এটা তোমার অনুমান। দেখে তো বোঝা যায় না, কাটা হয়েছে। আমরা যে আসবো, কে কে জানে, বলো? নিশ্চয় মিস্টার জোনস, মারটিন কিংবা হেরিঙ কাটেনি? নাকি তাদেরই কাউকে সন্দেহ করছো?'

মাথায় যেখানে বাড়ি খেয়েছে কিশোর, সুপারির মতো ফুলে উঠেছে জায়গাটা, সেখানে হাত বোলাচ্ছে সে, দৃষ্টি দূরের আরেক সিঁড়ির দিকে। 'কি জানি, কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। 'আমারও ভুল হতে পারে। তবে করাতে কাটা বলেই মনে হলো।'

পরস্পরের দিকে তাকালো মুসা আর রবিন। সাধারণত কোনো ব্যাপারে ভুল করে না কিশোর পাশা, আর এতো সহজে ভুল স্বীকার করা তো একটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। 'যা হবার তো হয়েছে, চলো যাই।'

'কোথায়?' জানতে চাইলো মুসা। 'ওই সিঁড়িটা দিয়ে উঠে চলে যাবো?' দূরের সিঁড়িটা দেখালো সে।

'না। অঘটন যা ঘটার তো ঘটেই গেছে। এখন আর ফিরে যাবো কেন? যে কাজে এসেছি, সে কাজ সারবো। সৈকতে, গুহায় ড্রাগনটার চিহ্ন খুঁজবো।'

সাগরের দিকে হাঁটতে শুরু করলো কিশোর। বললো, 'পানির ধার থেকে শুরু করবো। কারণ, সাগর থেকে উঠে ড্রাগনটাকে গুহায় ঢুকতে দেখা গেছে।'

কিশোরকে অনুসরণ করলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। চোখ নিচে বালির দিকে। নির্জন সৈকত। মাথার উপরে কর্কশ চিৎকার করে এলোমেলো ভাবে উড়ছে কয়েকটা সী-গাল।

মাটিতে বসলো একটা পাখি। সেটা দেখিয়ে মুসা বললো, 'চলো না, ওকে জিজ্ঞেস করি, ড্রাগন দেখেছে কিনা? অনেক কষ্ট বাঁচবে তাহলে আমাদের।'

'ভালো বলেছো।' মুসার রসিকতায় হাসলো রবিন। 'ও না বললে ওই টাগ বোটের মাঝিদেরকে জিজ্ঞেস করবো!'

মাইলখানেক দূরে একটা বার্জকে টেনে নিয়ে চলেছে একটা টাগবোট, স্যালভিজ রিগ—জাহাজে কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে উদ্ধার করা ওগুলোর কাজ।

'তাড়াহুড়ো আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' মুসা বললো। 'দেখছো না কি-রকম ধীরে ধীরে চলেছে। ড্রাগন-শিকারে বেরিয়েছে কিনা কে জানে। হাহ্ হাহ্।'

টিটকারিতে কান দিলো না কিশোর। গুহা আর পানির সংগে একটা কল্পিত সরলরেখা বরাবর দৃষ্টি, একবার এপাশে তাকাচ্ছে, একবার ওপাশে। কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। অবশেষে বললো, 'এই এলাকায়ই কোথাও ড্রাগনের পায়ের ছাপ মিলবে। এক সংগে না থেকে ছড়িয়ে পড়ো।'

আলাদা আলাদা হয়ে তিন দিকে ছড়িয়ে হাঁটতে লাগলো ওরা, বালিতে ড্রাগনের চিহ্ন খুঁজছে।

'কি আর দেখবো?' একসময় বললো রবিন। 'খালি আগাছা।'

'আমিও তাই বলি,' মুসা বললো। 'তবে কিছু শামুক আর ভেসে আসা কাঠ আছে। এসব ড্রাগনের পছন্দ কিনা বুঝতে পারছি না।'

খানিকক্ষণ পর মাথা নাড়লো রবিন। 'কিচ্ছু নেই। কিশোর, জোয়ারের পানিতে মুছে যায়নি তো?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। আনমনে বললো, 'হয়তো এখানে, পানির ধারে···না না, ওখানে, শুকনো বালি, গুহামুখ পর্যন্ত রয়েছে। থাকলে ওখানে থাকবে।'

'ধরো,' মুসা বললো, 'ড্রাগনটা গুহায় বসে আছে। কি করবো আমরা তাহলে? লড়াই করবো ওর সংগে? খালি হাতে? আদ্দিকালের রাজকুমারদের কাছে তো তবু যাদুর তলোয়ার থাকতো···'

'কারো সংগে লড়াই করতে আসিনি আমরা, মুসা,' গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর। 'সাবধানে গুহার মুখের কাছে এগিয়ে যাবো। ভেতরে বিপদ নেই এটা বুঝলেই কেবল গুহায় ঢুকবো।'

ভ্রূকুটি করলো মুসা। নিচু হয়ে একটা কাঠ তুলে নিয়ে বললো, 'যতো যা-ই বলো, খালি হাতে ঢুকতে আমি রাজি না। মরি আর বাঁচি, একখান বাড়ি তো মারতে পারবো।'

হেসে ফেললো কিশোর।

রবিন আরেকটা কাঠ তুলে নিলো। নৌকার একটা দাঁড়, আধখানা ভেঙে গেছে। 'ঠিকই বলেছে, মুসা। সেইন্ট জর্জ অ্যাণ্ড দা ড্রাগন ছবিটা দেখেছি। তলোয়ার দিয়ে কিভাবে ড্রাগনকে খোঁচা মেরেছে মনে আছে। আমরা অবশ্য খোঁচা মারতে পারবো না, তবে দু'জনে মিলে পেটালে ভড়কে গিয়ে পালিয়েও যেতে পারে ড্রাগন। পুরনো আমলের জন্তু তো, নতুন আমলের মানুষকে ভয় না পেয়েই যায় না।'

কিশোরের দিকে তাকালো। 'তুমি কিছু নিলে না? ভাঙা রেলিঙটা এনে দেবো? বড় বড় পেরেক বসানো আছে মাথায়, দেখেছি, চোখা কাঁটা বেরিয়ে আছে। ড্রাগনকে আঁচড়ে দিতে পারবে।'

হেসে বললো কিশোর, 'তা মন্দ বলোনি। হাতে করে একটা লাঠিটাটি নিয়েই নাহয় গেলাম। রেলিঙের দরকার নেই।' লম্বা ভেজা একটা তক্তা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেললো সে, যেন তলোয়ার নিয়ে চলেছে গর্বিত রাজকুমার। তারপর হাঁটতে শুরু করলো বন্ধুদের পাশে পাশে।

গুহামুখের দিকে এগিয়ে চলেছে তিন ড্রাগন-শিকারী। মুখে যতোই বলুক, গুহাটার কাছাকাছি এসে কিশোরের বুকের ধুকপুকানিও বাড়লো।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো কিশোর। শুকনো বালির দিকে আঙুল তুলে বললো, 'দেখো দেখো।'

মুসা আর রবিনও দেখলো। নরম বালি আচমকা বসে গেছে এক জায়গায়, গভীর দাগ।

'নতুন প্রজাতির ড্রাগন না কিরে বাবা?' নিচু কণ্ঠে বললো রবিন। 'পায়ের ছাপ তো নয়, যেন গাড়ির চাকা।'

মাথা ঝোঁকালো কিশোর। তারপর তাকালো পানির দিকে, দু'দিকের সৈকতও দেখলো। 'কোনো গাড়ি-টাড়ি তো দেখছি না। তবে চাকার দাগ যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বীচ-বাগি হতে পারে, লাইফ-গার্ডদের। কিংবা তাদের জীপ। পেট্রোলে এসেছিলো এদিকে।'

'হয়তো।' মেনে নিতে পারছে না রবিন। 'কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে তো চাকার দাগ পড়বে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সৈকতের একদিক থেকে আরেক দিকে। অথচ এটা গেছে গুহার দিকে।'

'কারেক্ট।' আঙুলে চুটকি বাজলো কিশোর। 'বুদ্ধি খুলছে।' হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো দাগ পরীক্ষা করার জন্যে।

পানির দিকে ফিরলো রবিন। 'পানির কাছে গিয়ে দেখে এলে কেমন হয়?'

'ওখানে বোধহয় পাবে না,' কিশোর বললো। 'ঢেউয়ের জোর বেশি, জোয়ারে মুছে গিয়ে থাকতে পারে।'

মুসা বললো, 'মিস্টার জোনসের বুড়ো চোখের ওপর ভরসা করা যাচ্ছে না আর। কি দেখতে কি দেখেছেন, কে জানে। জীপের সার্চলাইটকেই হয়তো ড্রাগনের চোখ ভেবেছেন, এঞ্জিনের শব্দকে ড্রাগনের গর্জন।'

'তা-ও হতে পারে। তবে আগে থেকেই এতো অনুমান করে লাভ নেই। গুহায় ঢুকে ভালোমতো দেখা দরকার।'

গুহামুখের গজ দশেক দূরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল দাগ। সামান্যতম চিহ্নও নেই আর।

একে অন্যের দিকে তাকালো ছেলেরা।

'আশ্চর্য!' মুসা বিড়বিড় করলো।
গুহামুখে পৌছে ভেতরে উঁকি দিলো ওরা। শূন্য মনে হচ্ছে।
'ড্রাগন তো ড্রাগন', আস্ত বাস ঢুকে যেতে পারবে এই মুখ দিয়ে,' ওপর দিকে চেয়ে বললো রবিন। 'ভেতরে ঢুকে দেখি, কতো বড় সুড়ঙ্গ?'
'যাও,' কিশোর বললো। 'তবে কাছাকাছি থেকো, ডাকলে যাতে শুনতে পাও। আমি আর মুসা আশপাশটা ভালোমতো দেখে আসছি।'
দাঁড়টা বল্লমের মতো বাগিয়ে ধরে ভেতরে ঢুকে গেল রবিন।
'হঠাৎ এতো সাহসী হয়ে উঠলো কিভাবে?' মুসা বললো।
'ওই যে,' হেসে বললো কিশোর, 'মানুষের তৈরি চাকা দেখলাম। তাতেই অনেকখানি দূর হয়ে গেছে ড্রাগনের ভয়।'
কান খাড়া করলো সে। 'দেখি তো ডেকে, রবিনের সাড়া আসে কিনা। ওর কথার প্রতিধ্বনি শুনলেই আন্দাজ করতে পারবো, গুহাটা কতো বড়।' চেঁচিয়ে ডাকলো, 'রবিন? কি দেখছো?'
মুসাও কান খাড়া করে ফেলেছে।
শব্দটা শুনতে পেলো দু'জনেই। বিচিত্র একটা শব্দ, কিসের বোঝা গেল না।
পরক্ষণেই ভেসে এলো রবিনের চিৎকার, তীক্ষ্ণ, আতংকিত। তারপর একটি মাত্র কথা: বাঁচাও!

চোখ বড় বড় করে আবছা অন্ধকার গুহার ভেতরে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর মুসা, কি করবে বুঝতে পারছে না। এই সময় আবার শোনা গেল রবিনের চিৎকার।
'বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!'
'বিপদে পড়েছে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'এসো।' ছুটে ঢুকে গেল সে সুড়ঙ্গের ভেতরে।
তাকে অনুসরণ করতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আরেকটু আস্তে, মুসা। ও বেশি দূরে নয়, হুঁশিয়ার থাকা দরকার...'
কথা শেষ করতে পারলো না কিশোর, মুসার গায়ে এসে পড়লো। বাড়ি খেয়ে হুঁক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল তার ফুসফুস থেকে। পড়তে পড়তে কোনোমতে সামলে নিলো।
কানে এলো মুসার গলা, 'সরো কিশোর, সরে যাও। ও এখানেই।'
'কোথায়? কই, আমি তো কিছুই দেখছি না।'
চোখ মিটমিট করলো কিশোর। চোখে সয়ে এলো আবছা আলো। তার সামনেই চার হাত-পায়ে ভর রেখে উপুড় হয়ে রয়েছে মুসা।
'আরেকটু হলেই গেছিলাম গর্তে পড়ে,' বললো সে। 'রবিন ওতেই পড়েছে।'
'কই?' মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো কিশোর। 'রবিন, কোথায় তুমি?'
এতো কাছে থেকে শোনা গেল রবিনের কণ্ঠ, যে চমকে উঠলো কিশোর। 'এই যে, এখানে। চটচটে কিছু। খালি নিচে টানছে।'
'ইয়াল্লা!' চেঁচালো মুসা। 'চোরাকাদা।'
'অসম্ভব!' এই জরুরী মুহূর্তেও যুক্তির বাইরে গেল না গোয়েন্দাপ্রধান। 'সাধারণত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল ছাড়া চোরাকাদা দেখা যায় না।' মুসার পাশ দিয়ে ঘুরে এসে কিনারে বসলো, সাবধানে হাত নামিয়ে দিলো নিচে। 'কই, দেখছি তো

না। রবিন, আমাদের দেখছো?'

'হ্যাঁ। এই তো, তোমাদের নিচেই।'

নিচু হয়ে হাত আরেকটু নামালো কিশোর। 'আমি দেখছি না। রবিন, ধরো, আমার হাতটা ধরো। আমি আর মুসা টেনে তুলবো।'

নিচে অ ঠালো তরলে নড়াচড়ার ফলে চপ চপ শব্দ হলো। 'পা-আরছি না।... নড়লেই ডুবে যাচ্ছি আরও। নাগাল পাচ্ছি না।'

'হাতের ডাণ্ডাটা আছে তোমার?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'ওই দাঁড়ভাঙাটা? থাকলে ওপরে তোলো...'

'নেই!' প্রায় ককিয়ে উঠলো রবিন। 'পড়ে গেছে।'

নিজের হাতের কাঠটায় মুঠোর চাপ শক্ত হলো মুসার। 'আমারটাও এতো শক্ত না। ভার সইবে না, ভেঙে যাবে।' গোঙানির মতো একটা শব্দ করলো।

শুঁয়াপোকার মতো কিলবিল করে গর্তের ধারে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলো কিশোর। 'রবিন, চুপ করে থাকো, নড়ো না। গর্তটা কতো বড়, বুঝে নিই।'

'জলদি করো!' কেঁদেই ফেলবে যেন রবিন। 'তোলো আমাকে। গর্ত মাপার সময় নয় এটা।'

খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে কিশোর। 'মাপতেই হবে। এছাড়া তোমাকে তুলে আনার আর কোনো উপায় দেখছি না।'

অন্ধকারে খুব সাবধানে গর্তটার চার ধারে ঘুরলো কিশোর, হুঁশিয়ার থাকা সত্ত্বেও কিনারের মাটি ভেঙে ঝুরঝুর করে পড়লো ভেতরে।

'আরে করছো কি!' নিচে থেকে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'ভূমিধ্বস নামাবে নাকি?'

'সরি। কিনারে আলগা মাটি, হাত লাগলেই পড়ছে।'

মুসার গায়ে হাত পড়তেই বুঝলো কিশোর, গর্ত ঘোরা শেষ হয়েছে। থামলো। 'মুসা, মনে হয় পারবো। রবিন, তোমার পা-কি তলায় ঠেকেছে? বুঝতে পারছো?'

আরেকবার চপচপ করে উঠলো আঠালো তরল। 'না,' তিক্ত শোনালো রবিনের কণ্ঠ। 'একটু নড়াচড়ায়ই আরও অনেকখানি তলিয়ে গেছি। দোহাই তোমাদের, কিছু একটা করো। তোলো আমাকে। তোমার হিসেবনিকেশ পরে করো।'

'কিশোর,' মুসা বললো, 'আমার পা শক্ত করে ধরতে পারবে? আমি গর্তের ভেতর পেট পর্যন্ত ঢোকাতে পারলেই ওকে তুলে আনতে পারবো।'

মাথা নাড়লো কিশোর, অন্ধকারে মুসা সেটা দেখতে পেলো না। 'আমার কাঠটা ব্যবহার করতে পারি,' কিশোর বললো। 'টেনে তোলা যাবে না। গর্তের কিনারে আলগা নরম বালি, ভার রাখতে পারবে না. চাপাচাপি করলে দেবে যাবে। তবে, কাঠটা আড়াআড়ি গর্তের ওপর রাখা

যায়, দু'মাথা কিনারে মোটামুটি ভালোই আটকাবে।'

'তাতে লাভটা কি? রবিন তো নাগাল পাবে না।'

'মনে হয় পাবে, যদি কোণাকুণি ঢুকিয়ে দিই। কি করবো, বুঝতে পারছো তো? একমাথা গর্তের ভেতরে কোণাকুণি ঢুকিয়ে ঠেসে ঢোকাবো দেয়ালে। নরম, ঢুকে যাবে সহজেই। আরেক মাথা থাকবে ওপরে, কিনারে শক্ত করে চেপে ধরবো। সিঁড়ি তৈরি হয়ে যাবে ···।'

'ইয়াল্লা! ঠিক বলেছো! জলদি করো, জলদি ··।'

বেশি আশা করলো না কিশোর, মাথা ঝোঁকালো। 'পাতলা কাঠ। ভার সইতে পারলে হয়। তবু, দেখা যাক চেষ্টা করে।···রবিন, তোমার মাথার কাছে দেয়ালে ঢোকানোর চেষ্টা করছি। খুব সাবধানে উঠবে। পিছলালে কিন্তু মরবে। কাঠটা ভেঙে গেলে ···খুব সাবধান।'

'জলদি কারো! আরও ডুবেছি,' গলা কাঁপছে রবিনের।

দ্রুত গর্তের অন্য ধারে চলে এলো কিশোর, মুসা যেখানে রয়েছে তার উল্টো দিকে। লম্বা হয়ে শুয়ে কাঠটা ঠেলে দিলো গর্তের ভেতরে। আস্তে আস্তে, এক ফুট এক ফুট করে।

হঠাৎ নিচে থেকে রবিনের চিৎকার শোনা গেল, 'আরেকটু, আরেকটু ঠেলে দাও, ধরতে পারছি না।'

আরও, কয়েক ইঞ্চি ঠেলে দিলো কিশোর।

'আরও একটু,' নিচে থেকে বললো রবিন। 'আর এই কয়েক ইঞ্চি।'

কাঠটা আরেকটু আসার অপেক্ষা করছে রবিন। এলো না। তার বদলে শুনলো ওপরে কিশোরের চাপা গলা, অস্ফুট একটা শব্দ। 'কি হলো, কিশোর?'

'কাঠের ভারে পিছলে যাচ্ছি, ব্যালান্স রাখতে পারছি না। কাঠ না ছাড়লে আমিও পড়বো গর্তে। সাংঘাতিক নরম বালি···'

আর কিছু শোনার অপেক্ষা করলো না মুসা। লাফিয়ে উঠে বিপজ্জনক কিনার ধরে প্রায় ছুটে চলে এলো কিশোরের কাছে। ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। উপুড় হয়ে শুয়ে কিশোরের পা ধরে টেনে সরিয়ে আনলো খানিকটা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'এবার পারবে?'

'থ্যাংক ইউ,' কিশোরের কণ্ঠও কাঁপছে। 'পা ছেড়ো না। কাঠটা আবার ঢোকাচ্ছি আমি।' ভাবলো, বড় বাঁচা বেঁচেছি। আরেকটু হলেই আমিও গিয়েছিলাম··· কাঠটা আবার ঠেলে দিলো সে। গর্তের দেয়ালে ঠেকতেই হ্যাঁচকা ঠেলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো কয়েক ইঞ্চি। জোরে জোরে শ্বাস নিলো কয়েকবার।

মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'কি হলো, পারছো না?'

'হ্যাঁ, দেয়ালে ঠেকেছে।'

'আমি ধরে আছি, ছাড়বো না। তুমি ঠেলো।'

জোরে জোরে কয়েকটা হ্যাঁচকা ঠেলা দিয়েকাঠের মাথা অনেকখানি ঢুকিয়ে দিলো গর্তের দেয়ালে, ডেকে বললো কিশোর, 'রবিন, দেখো এবার। ঝুলে ঝুলে আসবে, আস্তে হাত সরাবে, একটুও তাড়াহুড়ো করবে না। কাঠ ভাঙলে সর্বনাশ?'

উঠে আসছে রবিন, কাঠের মৃদু কড়মড় প্রতিবাদ শুনেই বোঝা যাচ্ছে। কতোক্ষণ সইতে পারবে কে জানে।

'আসছে, না?' জানতে চাইলো মুসা।

'হ্যাঁ,' বললো কিশোর। 'পা ছেড়ো না আমার। কখন কি হয় বোঝা যাচ্ছে না।' গর্তের ভেতরে হাত আর মাথা ঢুকিয়ে দিলো সে, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলে পড়লো ভেতরে, রবিন নাগালের মধ্যে এলেই যাতে টেনে তুলতে পারে।'

গুঙিয়ে উঠলো রবিন। 'কিশোর, আর

পারছি না। ইস্, এতো পিছলা। খালি হাত পিছলে যায়।'

'আমার হাত দেখতে পাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর?

'পাচ্ছি। আর তিন-চার ফুট উঠতে পারলেই ধরতে পারবো। কিন্তু পারছি না তো।'

'চুপ! তাড়াহুড়ো করো না।' জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর। আনমনে বললো, 'ইস্, একটা দড়ি যদি পেতাম।'

'দড়ি পাবে কোথায়?' পেছন থেকে বললো মুসা।

'কিশোর, আর পারছি না!' নিচে ককিয়ে উঠলো রবিন। 'হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

'আরেকটু ধরে থাকো। পেয়েছি। মুসা, আরও শক্ত করে ধরো।'

অনেক কায়দা কসরত করে কোমর থেকে বেল্টটা খুলে ফেললো কিশোর। বাকল্সের ভেতর বেল্ট ঢুকিয়ে ছোট একটা ফাঁস বানালো। তারপর বেল্টের মাথা ধরে ঝুলিয়ে দিলো নিচে। 'রবিন, দেখতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পাচ্ছি।'

'ফাঁসের মধ্যে হাত ঢোকাও।'

আস্তে করে কাঠ থেকে একটা হাত সরিয়ে ফাঁসের মধ্যে ঢোকালো রবিন। আরেক হাতে অনেক কষ্টে ঝুলে রইলো। পিছলে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

টান দিয়ে তার হাতে ফাঁসটা আটকে দিলো কিশোর। 'মুসা, টানো। টেনে টেনে পেছনে সরাও আমাকে।'

'ব্যথা পাবে তো।'

'আরে রাখো তোমার ব্যথা। টানো।'

টানতে শুরু করলো মুসা। দু' হাতে বেল্টের একমাথা ধরে রেখেছে কিশোর। ঘামে ভিজে পিছল হয়ে গেছে হাতের তালু, বেল্টটা না ছুটলেই হয়।

অবশেষে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এলো রবিনের হাত। মাথা বেরোলো। উঠে এলো সে।

থামলো না মুসা। টেনে আরও সরিয়ে আনলো কিশোরকে, সেই সংগে রবিনকে। যখন বুঝলো আর ভয় নেই, কিশোরের পা ছেড়ে দিয়ে ধপ করে বসে পড়লো। 'আরিব্বাপরে! কি একখান টাগ অভ ওয়ার গেল।'

হাঁপাচ্ছে কিশোর আর রবিন, ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গলা থেকে।

রবিনের গায়ে হাত রাখলো কিশোর, 'ইস্, এতো পিছলা! কাদায় গড়িয়ে ওঠা শুয়োরও তো এতো পিচ্ছিল না।'

তিনজনেই হাসলো।

বন্ধুদেরকে বার বার ধন্যবাদ জানালো রবিন। মুখের কাদা মুছে বললো, 'কিশোর, ঠিকই বলো তুমি। বিপদে মাথা গরম করতে নেই। তোমার ঠাণ্ডা মাথাই আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

'সব ভালো যার শেষ ভালো,' মুসা বললো। 'তো, এখন কি করবো?'

'বাড়ি ফিরবো,' সংগে সংগে বললো কিশোর। 'গোসল করে কাপড় বদলানো দরকার, বিশেষ করে রবিনের। নিশ্চয় খুব অসুবিধে হচ্ছে ওর। সব দোষ আমার। টর্চ না নিয়ে অন্ধকারে গুহা দেখতে এসেছি, গর্দভের মতো কাজ করেছি।'

'আমারই দোষ,' রবিন বললো। 'তুমি তো হুঁশিয়ার থাকতে বলেইছিলে। আমি গাধার মতো ছুটে গিয়ে পড়েছি গুহায়। এতো তাড়াহুড়ো না করলেই তো পড়তাম না।'

উঠে দাঁড়ালো কিশোর। চিন্তিত কণ্ঠে বললো, 'গুহামুখের অতো কাছে এমন একটা গর্ত। কৌতূহলী লোককে ঠেকানোর ভালোই ব্যবস্থা। 'বাইরে রাখবে।'

'আমার মতো গাধামী করলে ভেতরে ঢোকাবে,' হেসে বললো রবিন।

'খাইছে,' হঠাৎ বললো মুসা। 'হয়তো কুত্তাগুলো সব গিয়ে পড়েছে ওই গর্তে, চোরাকাদায় ডুবে মরেছে।'

কিশোর বললো, 'হতে পারে। কিন্তু ঢোকার আগেই ভালোমতো দেখেছি আমি। কুকুরের পায়ের ছাপ তো চোখে পড়লো না।'

'হুঁ! যাকগে, ওসব পরে ভাবা যাবে। চলো, বেরোই। জায়গাটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার। ভয় ভয় করছে।'

তিনজনেই একমত হলো এ-ব্যাপারে।

গর্তের কাছ থেকে সরে এলো ওরা।

তখন উত্তেজনা আর তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি কিশোর, এখন দেখলো, গুহামুখের উল্টো দিকে বড় বড় পাথরের চাঁই। আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে। 'কদ্দূর গেছে কে জানে,' আপনমনে বিড়বিড় করলো সে। 'চোর-ডাকাত আর চোরাচালানীর আখড়া ছিলো তো শুনলাম।'

'সে-তো ছিলোই,' জোর দিয়ে বললো মুসা। 'কিন্তু তাতে কি?'

'দেখেশুনে সেটা মনে হয় না। এতোবেশি খোলামেলা, ঢোকা আর বেরোনো সহজ, একটু সাবধানে চললেই বিপদ এড়ানো সম্ভব।'

'আরও সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ আছে হয়তো,' রবিন বললো। 'নরম মাটিকে ক্ষয় করে ফেলে পানির স্রোত, ধুয়ে নিয়ে যায়, অনেক সুড়ঙ্গ তৈরি হয়। তবে তাতে সময় লাগে, অনেক ক্ষেত্রে লাখ লাখ বছর। মনে হচ্ছে, অনেক আগে এই জায়গাটাও পানির তলায় ছিলো। যদি তাই হয়, আরও অনেক সুড়ঙ্গ আছে এখানে।'

'হয়তো।' স্বীকার করলো কিশোর। 'তবে সেগুলো খুঁজতে পারবো না এখন। বাড়ি যাওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, সেই ভালো,' মুসা বললো।

গুহামুখের কাছে চলে এসেছে, সাগরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। তার গায়ের ওপর এসে পড়লো অন্য দু'জন।

'কি হলো?' মুসার প্রশ্ন।

নিরবে হাত তুলে দেখালো কিশোর।

তার পাশে দাঁড়িয়ে অন্য দু'জনও তাকালো। চোখ মিটমিট করলো।

হাত দিয়ে চোখ ডলে আবার তাকালো মুসা। বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ইয়াল্লা!' বিড়বিড় করলো সে।

কালো, চকচকে কিছু একটা মাথা তুলছে পানির ওপরে।

'কি ওটা!' ফিসফিস করলো রবিন।

কম্পিত কণ্ঠে মুসা বললো, 'ড্রাগনের মাথার মতোই তো লাগছে!'

গড়িয়ে এলো মস্ত এক ঢেউ, ঢেকে দিলে কালো জিনিসটা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। চোখ সরাচ্ছে না।

প্রচণ্ড শব্দে সৈকতে আছড়ে পড়ে ভাঙলো ঢেউ। তার পেছনে এলো আরেকটা ছোটো ঢেউ, ওটাও ভাঙলো, শাদা ফেনার নাচানাচি চললো কয়েক মুহূর্ত, তারপর সরতে শুরু করলো পানি।

ঢেউ সরে যেতেই আবার দেখা গেল কালো জীবটা। নড়ছে। সাগর থেকে উঠে এলো টলোমলো পায়ে। (চলবে)

আলেকজাণ্ডার ডুমাঃ

(১০৫ পৃষ্ঠার পর)

পাঠকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার মুখে প্রতিদিনের অর্ধেক সময় লিখেও প্রকাশকদের অনেককেই ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। এসময় বিভিন্ন লেখকের লেখা তাঁর নাম দিয়ে ছাপা হতে লাগলো। তাঁর নামের খ্যাতি এমন ছিলো যে লেখার সাথে তাঁর নাম দেখলেই মানুষ তা কিনে নিতো। ডুমার আপন লেখা বইয়ের সংখ্যা অসংখ্য হলেও তাঁর নামে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এর অন্ততঃ দ্বিগুণ।

বলা হয়ে থাকে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা বিচারে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। তাঁর সব লেখার সংবাদ তিনি নিজেও রাখতে পারতেন না। এ নিয়ে একটা মজার গল্প প্রচলিত আছে। একবার তিনি ছেলেকে তাঁর একটা লেখা পড়েছে কিনা প্রশ্ন করলে পুত্র উত্তর দিলো পাল্টা জিজ্ঞাসা করে—'তুমি নিজে পড়েছো তো?' এ থেকেই তাঁর লেখার পরিমাণগত দিকটি সহজেই অনুমেয়।

পূর্বোল্লেখিত 'কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো' ও 'থ্রি মাস্কেটিয়ার' ছাড়া আলেকজাণ্ডার ডুমার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাস হলো, 'দ্য ব্ল্যাক টিউলিস,' 'ম্যান ইন দ্য আয়রণ মাস্ক,' 'টুয়েন্টি ইয়ারস্ আফটার,' 'দ্য ভাইকাউন্ট অভ ব্রোসেলোনে' প্রভৃতি। এছাড়া আরো অসংখ্য গল্প, নাটক, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী লিখে অতুলনীয় কল্পনাশক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি। তাঁর অধিকাংশ বিখ্যাত কাহিনীর ভিত্তি ইতিহাস হলেও তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো'তে ইতিহাস বিশেষ ঠাঁই পায়নি।

অনেক লিখেছেন ডুমা। তাঁর বিশাল সৃষ্টির মাঝে তিনটি মাস্টার পীস্ 'কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো,' 'থ্রি মাস্কেটিয়ার', এবং 'ম্যান ইন দ্য আয়রণ মাস্ক' চিত্রায়িত হয়ে পৃথিবীর ক্লাসিক চলচ্চিত্রের মর্যাদা পেয়েছে।

ডুমার সাহিত্য কর্মের অনেকগুলো বীরত্বব্যঞ্জক চরিত্রের মূলে ছিলেন তিনি নিজে। অনিন্দ্যসুন্দর চেহারা আর আকর্ষণীয় দৈহিক গড়নের অধিকারী ছিলেন তিনি। চিরতারুণ্যে ভরা উচ্ছল এক মানুষের প্রতিমূর্তি ছিলেন ডুমা আজীবন। বিশ্রাম নেয়াটা তাঁর কাছে অকর্মন্যতার নামান্তর বলে প্রতীয়মান হতো। যোদ্ধা হিসেবেও তিনি উপযুক্ত ছিলেন। গ্রীক বিদ্রোহে তিনি যখন যোগদান করেন তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। খেলোয়াড় হিসেবেও সুনাম ছিলো তাঁর। একবার বিলিয়ার্ড খেলাতে এক দুর্ধর্ষ জুয়ারীকে হারিয়ে দেন তিনি, ফল স্বরূপ প্রচুর অর্থ জিতেছিলেন।

শুধু একটাই দোষ ছিলো তাঁর। অতিরিক্ত সৌখিনতা এবং অর্থব্যয়ে অমিত্যব্যয়ীতা। গ্রন্থকার হিসেবে যে বিপুল অর্থের মালিক হলেন তা তিনি সঞ্চিত করে রাখতে পারেননি। তাঁর জীবনের লক্ষ্যই যেন আনন্দ উপভোগ। জীবন ও সাহিত্যে তিনি সে আনন্দকেই মূর্তরূপ দিয়েছেন। সৌখিনতার পূজারী ডুমা বিপুল অর্থব্যয়ে রাজ প্রাসাদের মতো সুবিশাল এক অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নামানুসারে এর নাম রাখেন 'মন্টিক্রিস্টো'। এই প্রাসাদে বিলাসী সম্রাটের মতোই দিন অতিবাহিত হতে থাকে তাঁর। শৈশবে দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করে টিকে ছিলেন, পরিণত কালে ঐশ্বর্যের স্বর্গ সুখই তাঁর পতন ডেকে আনলো।

অর্থব্যয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়ীতা আকণ্ঠ ঋণের দায়ে ডুবাতে লাগলো ডুমাকে। শেষ জীবনে এ ঋণের বোঝাই আবার শৈশবের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। আনক সাধের প্রাসাদ 'মন্টিক্রিস্টো' তাঁর চোখের সামনে দিয়েই পাওনাদারদের হাতে চলে গেল। অবশেষে এক এক করে সব কিছুই ঋণ শোধ করতে নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগলো। সুসময়ের বন্ধুরা উধাও হলো, শত্রু বাড়তে লাগলো তাঁর। পুত্রের সাথেও সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে।

শেষ জীবনের এই অপরিমেয় তিক্ততা-লাঞ্ছনা আর দারিদ্রের গরলটুকু পান করতে করতে একে বারে কপর্দকশূন্য হয়ে '৮৭' খ্রীষ্টাদের ৫ই ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন একসময়ের বিলাসী সম্রাট আলেকজাণ্ডার ডুমা।

ডুমার জীবন শুরু হয়েছিল অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট দারিদ্র, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার দীর্ঘ রজনীর মধ্য দিয়ে, মাঝের জীবনটা আনন্দ আর উপভোগের মাঝে কাটিয়ে পুনরায় সেই অন্ধকার বঞ্চনা আর তিক্ততা ভরা রাত্রীতে প্রত্যাবর্তন—এ যেন চিরন্তন জীবন রহস্যের এক বিচিত্র ইতিহাস—ডুমার সাহিত্যকর্মের চেয়েও অধিক প্রাণবন্ত, বাঙ্ময়, রোমাঞ্চে ভরপুর। □

মৃত্যু পুতুল

(৭৭ পৃষ্ঠার পর)

দৌড়ঝাঁপ করতে পারবে?

স্কুলে অন্য মেয়েরা কিভাবে তাকাবে ওর দিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মিতা। পায়ে সামান্য ব্যথা লাগছে এখন। বাসায় ফিরে যাবে কি?

শিউলির চেহারাটা দেখতে পেলো মনের পর্দায়। মনকে শক্ত করলো মিতা। কারো সাথে কথা বলবে না সে। দরকার হলে একা একাই থাকবে। জুলেখার কথা মনে পড়লো। নিয়ে এলে ভালো হতো না?

'কি, তোর পা সারেনি?' রূপালি আপা জিজ্ঞেস করলেন ক্লাশে।

'সেরেছে।'

'তো খুঁড়িয়ে হাঁটছিলি যে?'

অনেক কষ্টে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবার চেষ্টা করেছে মিতা। কিন্তু পারেনি। চম্পা আর শিউলির দিকে তাকালো। ওরা আজ একসাথে বসেছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে ওরা। ওর দিকে চেয়ে হাসলো চম্পা।

মিতাও চেষ্টা করলো হাসতে। কিন্তু পারলো না। কান্না পাচ্ছে ওর। শেলীকে খুঁজলো বার কয়েক। আসেনি ও।

টিফিনের সময় শিউলিকে ক্লাশ রুমের কোণায় স্কিপিং করতে দেখলো মিতা। চম্পা এসে জিজ্ঞেস করলো, 'স্কিপিং করতে পারবে? তাহলে এসো।'

মিতার খুব রাগ হলো। কোনো সন্দেহ নেই শিউলিই পাঠিয়েছে চম্পাকে ইচ্ছা করেই। ওকে অপমান করতে চায়।

'আমি খেলবো না। তুমি খেলো গে।'

'পারলে তো খেলবে। তোমার তো পা খোড়া,' শিউলি বললো রুমের কোণা থেকে।

'খোঁড়া!' মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল মিতার। মনে হলো শিউলিকে খামচে রক্তাক্ত করে দিলে ওর ভালো লাগতো।

অন্য আরেকটা মেয়ে বোধহয় উপরের ক্লাশের, ধমক দিলো শিউলিকে। মিতা আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না সেখানে। অভিমানে, দুঃখে চোখে পানি এসে গেল। বইখাতা হাতে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো ও।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উঁচু রাস্তা। মিতা একা হাঁটছে। মার কথা মনে পড়লো। বার বার সাবধান করে দিয়েছেন মা। 'কিনার দিয়ে হাঁটবি না। সামনে ডাইনে বাঁয়ে দেখেশুনে চলবি।' চোখ ঝাপসা হয়ে এলো আবার।

অস্বচ্ছ হয়ে গেল চারদিক। রোদের আলো তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে হারিয়ে গেল হঠাৎ। ঘন কুয়াশায় আটকা পড়লো মিতা।

এবার আর ভুল করলো না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। একটা ছায়া নড়ে উঠলো ওর সামনে। ছোটো একটা মেয়ে। কালো ফ্রক পরা। মাথায় কালো কাপড়ের কুঁচি দেয়া বনেট।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল মিতা। দশ বারো বছরের একটা মেয়ে। ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। ইচ্ছে করলেই ছুঁতে পারে মিতা। ইচ্ছে করলেই।

দুর্বল একটা কণ্ঠ শোনা গেল। মিতার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। মনে হলো ওকে কেউ জোর করে ধরে রেখেছে। এখন ইচ্ছা করলেও আর হাঁটতে পারবে না ও।

'ওরা কেউ তোমাকে দেখতে পারে না।' ফিসফিস করে বললো মেয়েটা। বাতাসে কাঁপছে ওর শরীর। 'তুমি আমার বন্ধু হও। আমরা দুজনে বেড়াবো। খেলবো।'

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলো মিতার চোখে মুখে। পুরনো গন্ধটা আবার পাচ্ছে। কর্পূরের গন্ধ।

'কে তুমি?'

'তোমার বন্ধু।'

'কেউ আমার বন্ধু না। সবাই শিউলির মতো,' বিড়বিড় করলো মিতা।

'শিউলিকে আমি দেখে নেবো। তোমাকে আর খোঁড়া বলার সাহস পাবে না,' হিস হিস করে উঠলো কণ্ঠস্বর।

মিতার মনে হলো সে এখন স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে। শরীরটা

হালকা লাগছে। বাড়ির দিকে রওনা হলো মিতা। সত্যিই সে হাঁটতে পারছে।

কুয়াশা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। রোদের আলোর ঝলকানিতে মিতা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সমুদ্র, পাহাড়, গ্রাম, সবকিছু।

টুনু খেলছে আম বাগানে। মিতার খুব ইচ্ছা করছে ওর সাথে দোলনায় দুলতে।

একটু আগে দেখা মেয়েটাকে হঠাৎ চিনে ফেললো মিতা। একেই দেখেছে সেদিন স্বপ্নে।

গোরস্তানের কাছাকাছি আসতেই আবার খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলো মিতা। ভেতরে ঢোকার একটা অদম্য আগ্রহ বোধ করলো! নিজের অজান্তেই হাঁটতে শুরু করলো সেদিকে।

দোলনায় ঝোলা বন্ধ করে টুনু একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে মিতাকে। গোরস্তানের দিকে কেন যাচ্ছে মেয়েটা?

সরু কাঁচা রাস্তার দুপাশে সারি সারি কবর। কেমন যেন নেশার মতো লাগছে। সেই কবরটার সামনে এসে দাঁড়ালো। দুহাত দিয়ে সরিয়ে দিলো ঝোঁপঝাড়। ছোট একটা নাম। জুলেখা। মিতা তাকিয়ে রইলো সেদিকে। ওর পুতুলের নাম।

রান্না ঘরে অনেকক্ষণ বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠলেন মাজেদা বেগম। খোলা বিশাল জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। ডানদিকে দিগন্ত ভেদ করে উঠেছে সারি সারি পাহাড়।

বাতাস শিরশির করে ঢুকছে রান্না-ঘরে। মাজেদা বেগম উদাসভাবে তাকিয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে।

আরে! কে ওটা? চমকে উঠলেন মাজেদা বেগম। গোরস্তানের ভাঙা দেয়ালের ওপাশে ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা খুঁজছে মিতা। কি করছে ওখানে?

স্কুলে যায়নি? অজানা আশঙ্কার বুকটা কেঁপে উঠলো। অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। একা একা ভর দুপুর-বেলা গোরস্তানে কি করছে?

মিতা দাঁড়িয়েই আছে। নড়ছে না। মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য নিজেই বাড়ি থেকে বের হয়ে এলেন তিনি। জোরে হাঁটতে লাগলেন। ভারী শরীর, হাঁস-ফাস করছেন ক্লান্তিতে। জোরে হাঁটার উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় করছে। ঘাম ঝরছে শরীর বেয়ে।

প্রায় সাত মিনিট হেঁটে গোরস্তানের সামনে এসে পড়লেন মাজেদা বেগম। হাবুর মা বাড়িতে থাকলে তাকে এই কষ্টটা করতে হতো না।

'এই মিতা, এখানে কি করছিস?'

মায়ের গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো মিতা।

'এমনি, আম্মু। জুলেখার কবর দেখ-ছিলাম।'

'কার কবর?'

'জুলেখার।' হাত তুলে দেখালো মিতা।

'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? স্কুলে যাসনি?'

'চলে এসেছি।'

'বাসায় চল্।' মেয়ের হাত ধরে টান-লেন মাজেদা বেগম।

'জুলেখার কবরটা দেখবে না, মা?'

মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন মা। শান্ত সমাহিত মুখ। কি মনে করে ঝুঁকে পড়লেন তিনি হেডস্টোনটার দিকে। লেখাটা চোখে পড়লো। 'জুলেখা।' অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

পাশের কবরটার দিকে নজর গেল। সাদা সিমেন্টের ওপর কালো অক্ষরে লেখা।

'গুলবাহার বেগম।
পাপে মৃত্যু
১৮৭০ সাল।'

এটা কি ধরনের লেখা? এর মানে কি?

কুসুমপুর এলাকাটাই যেন কেমন রহস্যময়। চিন্তাগ্রস্ত মনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলেন মাজেদা বেগম। হঠাৎ তীব্র ব্যথায় অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। কোমরের কাছটায় লক্ষ লক্ষ সূঁচ ফোটাচ্ছে কেউ।

মায়ের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল মিতা। দাতে দাত চেপে বললেন মাজেদা বেগম, 'জলদি দৌড়ে যা ফার্মেসীতে। তোর আব্বাকে খবর দে,' বলেই বসে পড়লেন মাটিতে।

সময় হয়ে গেছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়াচ্ছে মিতা। পিছন থেকে আধা শোয়া অবস্থায় অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন মাজেদা বেগম।

শেষ পর্যন্ত তার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে যাচ্ছে এইখানে। এই গোরস্তানে। হায় খোদা!

তুলতুলে পেঁজা তুলোর মতো একটা শিশু। আহাদ সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। ঠিক মায়ের আদল পেয়েছে। চুমু দিলেন মেয়ের লালচে গালে। দাড়ির খোঁচায় কেঁদে উঠলো অবোধ শিশু।

'আবার তুমি কাঁদাচ্ছো ওকে?' মাজেদা বেগম কৃত্রিম রোষে বললেন।

মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন আহাদ সাহেব বাচ্চাটাকে। কান্না থামাবার কোনো লক্ষণ নেই পিচ্চিটার।

'মিতা কোথায়?'

'কি জানি। সকাল থেকেই তো দেখছি না ওকে। স্কুলেও গেল না আজকে।'

মিতাকে পাওয়া গেল তার রুমে। জুলেখাকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

উদ্বিগ্ন হলেন আহাদ সাহেব। এই সময় কখনো ঘুমায় না মেয়েটা। অসুখ বিসুখ করলো নাকি?

চোখের কোনায় সামান্য চকচক করছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে মিতা।

সকাল থেকে একটু দূরে দূরে ছিলো মিতা। ব্যাপারটা মাজেদা বেগমকে বলতেই উত্তর দিলেন, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, মিতার ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থাকা দরকার। কোনোভাবেই ও যাতে মনে না করে যে ওকে আমরা অবহেলা করছি।'

'আমি তো খুব কেয়ারফুলই থাকি।'

'সকাল থেকে একবারও মিতার সাথে কথা বলেছো তুমি?'

আমতা আমতা করলেন আহাদ সাহেব। সত্যিই খেয়াল করেননি ব্যাপারটা।

উঠোনের কোনায় একটা ছোটো ঘর। লাল ইঁটের তৈরি। টালির ছাদ। দেখলেই বোঝা যায় বহুকাল ধরে ব্যবহার করা হয়নি ওটা।

হাবুর মা সকাল থেকেই পরিষ্কার করছিলো ঘরটা। মাকড়সা, তেলাপোকা আর ইঁদুরের মচ্ছব ভিতরে। ধুলায়, ময়লায় কাশতে কাশতে হার্টফেল হবার দশা বুড়ির।

ভেতরটা খারাপ নয়। অদ্ভুত কিছু জিনিস পাওয়া গেল সেখানে। কয়েকটা পেইন্টেড আর কয়েকটা খালি ক্যানভাস। ছবি আঁকতো চৌধুরীদের কেউ।

মেঝেটা দেখে অবাক হলেন মাজেদা বেগম। পুরোটাই মোজাইক করা। জবরজং ছোট্ট ঘরটার এতো সুন্দর মেঝে ভাবাই যায় না।

ঝেড়েমুছে ঝকঝকে করে ফেললো রুমটা হাবুর মা। চিমসে বুড়িটার গায়ে শক্তি আছে বটে। কালো একটা লম্বা

দাগ কিছুতেই উঠছে না। প্রায় দেড় ফুট লম্বা বিচিত্র ধরনের একটা দাগ।

কিছু একটা পড়েছিলো মেঝেয়। এখনও উঁচু হয়ে আছে। কিসের দাগ?

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন মাজেদা বেগম। কোনো সন্দেহ নেই।

রক্তের দাগ।

এখানে রক্তের দাগ কেন? দ্রুত হেঁটে গিয়ে আহাদ সাহেবকে ডেকে নিয়ে এলেন তিনি।

'এই দেখো, এটা কিসের দাগ? কিছুতেই উঠছে না।'

'কতো কিছুর দাগ হতে পারে। কি করে বলি।'

'আমার মনে হয় রক্তের দাগ,' ফিসফিস করে বললেন মাজেদা বেগম।

'এরকম মনে হলো কেন তোমার?'

'এই বাড়িটায় ভূতুড়ে কিছু একটা আছে। পুরনো জমিদারবাড়ি। এখানে রক্তের দাগ থাকতেই পারে।'

আহাদ সাহেবের গাঁ ঘেঁষে দাঁড়ালেন মাজেদা বেগম।

ফিক করে হেসে বললেন আহাদ সাহেব। এই রকম অবস্থায় বয়স্কা মেয়েরাও কেমন শিশুর মতো আচরণ করে।

'খুঁচিয়ে তুলে ফেলো দাগটা, হাবুর মা। দা, ছুরি কিছু একটা দিয়ে খোঁচাও।'

স্কুলে আবার শিউলির সাথে ঝগড়া হয়ে গেল মিতার। সবার আগে এসে সামনে বসেছিল মিতা। লাল স্যুটকেসটা রেখে বাইরে গিয়েছিল।

দশ মিনিট পরে এসে দেখলো আগের জায়গায় নেই স্যুটকেসটা। কেউ ওটাকে দ্বিতীয় বেঞ্চে নিয়ে রেখেছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মিতার।

শিউলির কথাই মনে পড়লো প্রথম। তাই হবে। ওর ব্যাগটা রয়েছে সামনের বেঞ্চে।

'আমার স্যুটকেস সরিয়েছ কেন?'

'আমার বয়েই গেছে তোমার স্যুটকেস ধরতে,' ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো শিউলি।

'আমি সরিয়েছি ওটা, মিতা। আমরা একসঙ্গে বসবো।' পিছন থেকে বললো শেলী।

'আন্দাজী কথা বলো কেন তুমি? আমি আপাকে বলে দেবো।' খেপে উঠলো শিউলি।

'বলো গে।'

'বলবোই তো। বেশি ডাঁট হয়েছে না? ল্যাংড়া মেয়ের এতো ডাঁট ভালো না,' খোঁচা দেবার জন্যেই বললো শিউলি।

কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো মিতার। আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না সে। অস্পষ্ট কয়েকটা কথা কানে গেল।

'ঢং কতো, ধাড়ি মেয়ে পুতুল নিয়ে স্কুলে আসে।'

মিতাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল শেলী। ইচ্ছা করছিল খামচে রক্তাক্ত করে দেয় শিউলির মুখচোখ।

টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা পানি পড়লো মিতার চোখ বেয়ে।

'শিউলিটা না ভারি পাজি। তুমি কিছু মনে করো না, কেমন?' সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো শেলী।

'কেন, ওর কি দোষ? না জেনে শিউলিকে বলতে গেল কেন মিতা?' পেছন থেকে বললো আরেকটা মেয়ে।

রাগে দুঃখে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলো মিতা। পায়ের ব্যথাটা বাড়ছে দ্রুত। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলো। স্যুটকেসটাও ভারী মনে হচ্ছে খুব।

জুলেখার দিকে চোখ পড়লো মিতার। দুধ সাদা চোখ দুটো ভাবলেশহীন চেয়ে আছে। মনে হচ্ছে খুব দুঃখ পেয়েছে সেও।

সমুদ্রের ধারে আসতেই বাতাসের ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগলো শরীরে। হঠাৎ কেঁপে উঠলো সূর্যের আলো। দেখতে দেখতে ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল চারপাশ।

বাতাসে ভাসছে সেই পুরনো গন্ধ।
কালো ফ্রক পরা ছায়াটাকে আবার দেখতে পেলো মিতা। বাতাসে তির তির করে কাঁপছে।
'বাড়ি যেও না, মিতা। বসে থাকো ওই গাছের আড়ালে।' আদেশের সুরে বললো মেয়েটা।
জুলেখাকে আরো জোরে বুকের সাথে চেপে ধরলো মিতা। পায়ের ব্যথাটা একদম সেরে গেছে।
মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাজ করলো সে। হেঁটে গিয়ে বিশাল বটগাছটার আড়ালে শিকড়ের ওপর বসে রইলো।
ঘন কুয়াশার চাদর ঢেকে দিয়েছে সব কিছু। ঘুম পাচ্ছে এখন ওর। মিনিট, ঘণ্টা কিভাবে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না কিছু। ঘোর লেগে গেছে।
কালো বনেট পরা ছায়াটাকে দেখা যাচ্ছে ন কোথাও।
হঠাৎ দূরে হাসির শব্দ শোনা গেল। বারো-তেরো বছরের কয়েকটা মেয়ে হাসছে। আসছে ওরা এদিকে।
কান খাড়া করে রইলো মিতা। পরিচিত কণ্ঠটা শুনতেই রাগে হাত পা জ্বলতে লাগলো ওর, ফ্রক পরা ছায়াটাকেও দেখা গেল হঠাৎ।
কোনো কিছু বোঝার আগেই পা টিপে টিপে উঠে এলো মিতা। হিস হিস করে উঠলো একটা মিহি কণ্ঠ, 'আসছে। এইই সুযোগ।'
কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলো মিতা। চুম্বকের মতো টানছে ওকে ফ্রক পরা মেয়েটা।
'আমি তোমার বন্ধু। ওরা তোমাকে ভালোবাসে না। এসো আমার সঙ্গে।'
দুই দিকে বেণী ঝোলানো একটা মেয়েকে আবছা মতো দেখতে পেলো মিতা। কাঁদে ঝুলছে দামী স্কুল ব্যাগ। একা।
কেমন সতর্ক পায়ে এগুচ্ছে মেয়েটা। এখনো ওর মুখোমুখি যায়নি মিতা।

সমুদ্রের ধার দিয়ে উঁচু ঢাল। প্রায় পঁচিশ তিরিশ ফুট নিচে চিকচিক করছে বালু আর পাথর। ঢালের ওপর দিয়ে হাঁটছে মেয়েটা।

মিতাকে দেখেই চমকে উঠলো। দু'হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল মিতার। নিজেও চমকে উঠলো সে।

এতো শক্তি সে পেলো কোথায়? ওর আর মেয়েটার মাঝখানে কালো ফ্রক পরা ছায়াটাকে মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলো মিতা। সাদা চোখ দুটো পাথরের মতো নিষ্প্রাণ।

মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল কুয়াশার মেঘ। ঝলমল করে উঠলো রোদেলা দুপুর। বিশাল ঢালের ওপর একা দাঁড়িয়ে আছে মিতা।

পায়ে ভীষণ ব্যথা। নিজের কপালে হাত দিয়ে নিজেই চমকে উঠলো। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। স্যুটকেস হাতে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো সে।

যে কোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে। খুব দুর্বল লাগছে।

এদিকে বোবা বিলু তখন আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে মিতার দিকে। কয়েক-শো গজ দূরে আমবাগানে খেলতে খেলতে খুব খারাপ কিছু একটা দেখেছে সে। খুব খারাপ।

স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছিলেন হাশেম সাহেব। সমুদ্রের পাশে পাশে অনেকদূরে যেতে হয় তাকে। সাইকেল চেপেই যাতায়াত করেন প্রতিদিন। শাহবাজপুর প্রায় আড়াই মাইল দূরে এখান থেকে।

রোদ এখনও চড়া। ঘামে ভিজে উঠছে সার্ট। কুসুমপুর গ্রামে মসজিদের গম্বুজে ঠিকরে পড়ছে রোদ। খুব ধীরে প্যাডেল করছেন হাশেম সাহেব।

সামনে বড় একটা বাঁক। বাঁকের মাথায় বুড়ো বটগাছটা ঝিরঝির করে বাতাস ছাড়ছে। নিচে ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচছে সমুদ্র।

আরে! কি ওটা?

জোরে প্যাডেল করে কাছে চলে এলেন হাশেম সাহেব। ভালো করে দেখে চমকে উঠলেন ভীষণভাবে।

তিরিশ হাত নিচে বড় পাথরগুলির মাঝ-খানে চার হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে কাজেম সওদাগরের ছোটো মেয়ে শিউলি।

জোয়ারের পানি প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে ওর পা। দেখলেই বোঝা যায় প্রাণহীন দেহটা অনুভব করতে পারছে না কিছুই। তাড়াতাড়ি সাইকেল থেকে নেমে ঢালের নিচের দিকে রওনা হলেন হাশেম সাহেব।

আর দশ মিনিট দেরি হলে পানিতে ভেসে যেতে পারে লাশটা। আগে তুলে আনতে হবে ওকে। পরে খবর দেয়া যাবে লোকজনকে।

জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে মিতা। ডাক্তার বলেছেন চিন্তার কিছু নেই। কড়া রোদে অনেকক্ষণ বসেছিল বোধ হয়। তাই জ্বর উঠেছে।

বিলুর কাছ থেকে জানতে পেরেছেন মাজেদা বেগম দুপুরের রোদে সমুদ্রের ধারে বটগাছের কাছে বসেছিল মিতা। আরো কি কি যেন বলতে চাইছিল মেয়েটা। তিনি বুঝতে পারেননি।

মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন মাজেদা বেগম। বিড়বিড় করে জুলেখার নাম বলছে মিতা। 'ওই পুতুলটাই যতো নষ্টে মূল,' মনে মনে বললেন তিনি।

রশীদ চেয়ারম্যানের বউ অনেকভাবে চেষ্টা করলেন! কিন্তু বিলুর কথা বুঝতে পারছেন না কিছুতেই। বোবা মেয়েটা হাত নেড়ে মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে কিছু একটা বলতে চাইছে।

শুধু বুঝতে পারলেন শিউলির মৃত্যুর সাথে মিতার একটা সম্পর্ক আছে।

কি সেটা?

সকালবেলা উঠোনের ধার ঘেঁষে লাগানো ফুলের চারাগুলোতে পানি দিচ্ছিলেন মাজেদা বেগম। মৌসুমী ফুলের চাষ করা তার পুরনো অভ্যাস।

টালির ঘরটাকে স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহারের ইচ্ছা আছে তার। টুকিটাকি-জিনিসপত্র রাখা যাবে ওখানটায়।

দরোজা ঠেলে ঘরটার ভেতরে ঢুকলেন মাজেদা বেগম। ঝকঝক করছে ঘরটা।

মেঝের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেলেন সাথে সাথে। মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল।

লম্বা কালচে দাগটা তেমনি আছে।

দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মুহূর্তের মধ্যে। সমস্ত শরীর কাঁপছে তার।

স্পষ্ট মনে আছে গতকাল খন্তা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পুরো দাগটা তুলে ফেলেছিলো হাবুর মা।

তখনো ফার্মেসীতে যাননি আহাদ সাহেব। সব শুনে থ হয়ে গেলেন। নিজে এসে দেখলেন বিদঘুটে দাগটা। কোনো কথা সরলো না মুখে।

এই ঘরটা ব্যবহার না করাই ভালো। 'বন্ধ করে রাখো এটা। দরকার নেই স্টোর রুম।'

এই বাড়িটায় যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে এতদিন পর সেটা স্বীকার করলেন আহাদ সাহেব।

আরো দেখে শুনে কেনা উচিত ছিলো বাড়িটা।

স্কুলে মিতাকে এড়িয়ে চলতে লাগলো ওরা। একমাত্র শেলি ছাড়া ওর আর কোনো বন্ধু নেই। চম্পা ওকে দেখলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়।

কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে ভেতরে ভেতরে। মিতার পুতুলটার কথাও জানে ওরা। হেডমাস্টারকে সব কথা খুলে বলেছেন আহাদ সাহেব।

'হয় এ রকম। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে,' আশ্বাস দিয়েছেন উনি।

পিছনের বেঞ্চে চুপচাপ বসে থাকে মিতা। কখনো খেলতে যায় না। শেলির সাথে কথা বলে মাঝে মাঝে।

শুক্রবার সকালেই হাঁটতে হাঁটতে আমবাগানের কাছে চলে এলো মিতা। খুব অস্থির লাগছে ওর। জুলেখার সাথে কথা বলেছে রাতে।

ঘুমুতে যাবার পরপরই একটু শীত শীত লাগছিল ওর। বাতাসে একটা গন্ধ ভেসে এলো হঠাৎ। টেবিলের ওপর রাখা জুলেখার দিকে চাইলো মিতা।

ভুল দেখলো কি?

আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে ওটা। এক সময় হাওয়ায় ভাসতে লাগলো যেন।

বিছানায় সেঁটে গেল মিতা। মেঝেতে নাক ডাকাচ্ছে হাবুর মা। মিহি একটা অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল।

'তোমাকে খুব পছন্দ করি আমি। কিন্তু তোমার আব্বু-আম্মু তোমাকে ভালবাসে না।'

প্রতিবাদ করতে চাইলো মিতা। কিন্তু গলায় জোর পেলো না।

'তুমি ওদের মেয়ে নও, রীতা ওদের মেয়ে। রীতাকে আদর করে ওরা। ও থাকলে তোমাকে কেউ ভালবাসবে না।'

একঘেয়ে সুরে বলে যাচ্ছে কেউ।

'কই উঠে পড়ো। এখনই সময়।'

চিন্তা করবার শক্তি হারিয়ে ফেললো মিতা। স্বপ্ন দেখছে বলে মনে হলো।

হঠাৎ পাশের রুম থেকে কেঁদে উঠলো রীতা। অবুঝ শিশুর আতঙ্কিত কান্না।

মাঝখানের দরোজা খোলাই ছিলো।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো মিতা। কখন যে বিছানা থেকে উঠে পড়েছে খেয়াল নেই। রীতার বিছানার কাছে চলে এলো নিঃশব্দে।

আহাদ সাহেব, মাজেদা বেগম কেউ নেই। এখনও শুতে আসেননি ওরা। ড্রয়িং রুমে রয়েছেন।

ছোট্ট মশারীটা গুটিয়ে তুলতুলে ফর্সা শিশুটিকে কোলে তুলে নিলো মিতা। আরো জোরে কাঁদতে শুরু করলো রীতা। বুকের সাথে জোরে ঠেসে ধরলো ওকে।

ইস কি সুন্দর। গালে একটা চুমো দিলো মিতা। কিন্তু নিজের হাতে দুটোকে কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছে না ও, আরো জোরে পিচ্চিটাকে ঠেসে ধরলো দুহাতে দিয়ে।

কর্পূরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এ ঘরেও। ভয় পেলো মিতা। নীল হয়ে উঠেছে বাচ্চাটার ফর্সা মুখ। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হাত থেকে ছেড়ে দিতে চেষ্টা করলো ওকে। কিন্তু পারছে না।

প্রাণপণে চেঁচাতে গিয়ে খুক খুক করে কাশছে রীতা।

'কি রে মিতা কি হয়েছে।' তীক্ষ্ণ গলা মাজেদা বেগমের। কান্নার শব্দে উঠে এসেছেন ওপরে।

'কাঁদছে মা। রীতা কাঁদছে। ঘোর কেটে গেছে মিতার।

'আমাকে ডাকিসনি কেন। দেখি দেখি। ইস। এতো ঠেসে ধরে কোলে নেয় কেউ। আরেকটু হলেই তো দম বন্ধ হয়ে যেতো,' কড়া গলায় ধমক দিলেন মাজেদা বেগম। রীতাকে কোলে নিয়ে আদর করছেন। 'শুয়ে পড়গে যা।'

চোখে জল এসে গেল মিতার। অভিমানে কোনো কথা বললো না। চুপচাপ এসে শুয়ে রইলো বিছানায়। আজ রাতে আবার ওই স্বপ্নটা দেখলো।

কালো ফ্রক পরা একটা অন্ধ মেয়েকে সবাই মিলে খেপিয়ে, খুঁচিয়ে উত্যক্ত করে তুলছে। শেষ পর্যন্ত উঁচু ঢাল থেকে নিচে পড়ে গেল অসহায় মেয়েটা।

ছোট্ট মেয়েটার চোখে মুখে কি অসহ্য বেদনা, ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন। ঢাল বেয়ে উঠে আসছে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে। সাদা দৃষ্টিহীন চোখ জুড়ে প্রচণ্ড আক্রোশ।

ঘামে বালিশ ভিজে গেল মিতার। শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে। মার কাছে গিয়ে শুতে ইচ্ছে করলো খুব। কিন্তু রীতা আছে ওখানে। অন্ধকারে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো মিতা।

'শুনছো, মিতার ভাবসাব খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না।'

'কি করেছে।'

'একটু আগে রীতার কান্না শুনে ওপরে উঠে দেখি ওকে ধরে চাপ দিচ্ছে মিতা। দম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নীল হয়ে গিয়েছিল চেহারা। আমি সময়মত না গেলে হয়তো মরেই যেতো।'

'কি যা তা বলছো?' উষ্মা প্রকাশ করলেন আহাদ সাহেব।

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় কিছু একটা আছে ওর সঙ্গে। কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে হাসি খুশি মেয়েটা।'

'ওসব কিছু না। পা টা নরমাল হচ্ছে না বলে খুব আপসেট হয়ে আছে ও।'

'ঢাকায় নিয়ে দেখানো দরকার। মেয়েমানুষ। আল্লা না করুক কিছু একটা হয়ে গেলে, তখন?' মাজেদা বেগমের গলা দুশ্চিন্তায় কেঁপে উঠলো।

'প্রফেসর শরীফকে দেখিয়েছি না? উনি তো বললেন আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।'

দোলনায় দুলছিল বিলু। পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে টুনু। সুন্দর ছেলেটাকে দেখে ওর দিকে এগিয়ে গেল মিতা। এই ছেলেটা খুব ভালো। কি সুন্দর করে হাসে।

'তুমি খেলবে?' আগ্রহের সঙ্গে বললো টুনু।

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করলো মিতা।

মিতাকে দোলনার দিকে আসতে দেখে নেমে পড়লো বিলু। মিতা ধাক্কা দিক এটা চায় না সে। শিউলি মারা যাবার সময় ঢালের ওপরে ওর সাথে মিতাকেও দেখেছে সে। ঠিক বুঝতে পারেনি কি ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ করে দেখলো আচমকা ঢালের ওপর থেকে নেই হয়ে গেছে শিউলি।

কিন্তু টুনু নাছোড়বান্দা। মিতাকে খেলতে নেবেই সে। বেশ কয়েকবার ওকে দোলনায় তুলে ধাক্কা দিলো টুনু। খুব ভালো লাগছে।

এবার উঠলো বিলু। দুজনে মিলে খুব জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। প্রায় সাত-আট ফিট উঠে যাচ্ছে দোলন। খিল খিল করে হাসছে বোবা মেয়েটা।

এখন থামা দরকার। দম হারিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু থামছে না মিতা। ব্যা ব্যা করে কিছু একটা বললো বিলু। বুঝতে পারছে না মিতা। আরো জোরে ধাক্ক দিলো এবার।

ভয় পাচ্ছে বিলু। প্রায় দশ-এগারো ফিট উঠে আসছে দোলনা। আর্তনাদ করছে সে। কিন্তু কিছুতেই থামছে না মিতা।

মিতার চারপাশে তখন ঘোর কুয়াশা। কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে কেউ, 'এই মেয়েটা তোমার শত্রু। তোমাকে খেলায় নিতে চায়নি। তোমাকে

পছন্দ করে না। এই সুযোগ।'

নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছে না মিতা। সবাই তার শত্রু, শুধু জুলেখা তার একমাত্র বন্ধু। 'কোথায় তুমি জুলেখা।'

'এই যে আমি। তোমার পিছনে।'

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে এক ধাক্কা মারলো মিতা। প্রায় চোদ্দ ফুট উপরে উঠে গেল বিলু। হাত থেকে ছুটে গেল মোটা দড়ি।

হাওয়ায় উড়ে এলো যেন মেয়েটা। মাথাটা আগে পড়লো শক্ত মাটিতে। ধড়াস করে পুরো শরীরটা বাড়ি খেলো প্রচণ্ড ভাবে।

প্রাণঘাতী আর্তনাদ করে উঠলো বিলু। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো টুনু। হাত পা মাটিতে ছড়িয়ে নিথর হয়ে গেল বোবা মেয়েটা।

তখনও অনবরত দুলছে দোলনাটা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মিতা। বিলুর নাক দিয়ে দু ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়লো। পায়ের ব্যথাটা আবার বাড়ছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দৌড়াতে লাগলো মিতা। চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছে।

মিতার কাছে খবর পেয়েই সবাই জানতে পারলো কি ঘটেছে। টুনু একটানা কাঁদছে তো কাঁদছেই। মিতাকে দেখাচ্ছে আর বলছে, 'ধাক্কা দিছে এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা।'

গলা শুকিয়ে গেল মিতার। কোনমতে ওকে বাসায় নিয়ে এলেন আহাদ সাহেব। বিলুর মায়ের গালাগালি আর আহাজারিতে পাগল হবার দশা তার।

সবাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মিতার দিকে। রশীদ চেয়ারম্যান বলেই ফেললেন, 'মেয়েটাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন, আহাদ সাহেব। এখানে থাকাটা ওর নিজের জন্যেই খারাপ।'

মাজেদা বেগম এই প্রথম মারলেন মেয়েকে। চড় খেয়ে কোনো কথা বললো না মিতা। কাঁদলো না পর্যন্ত। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

চুপে চুপে নিজের ঘরে এলো সে। সেই কর্পূরের গন্ধটা নাকে এলো। হিসহিস করে উঠলো পরিচিত কণ্ঠ। 'আমি ছাড়া আর কেউ তোমার বন্ধু নয়। শত বছর ধরে তোমার অপেক্ষায় ছিলাম আমি।'

'তুমিও আমার বন্ধু নও। তুমি আমার ক্ষতি করতে চাও,' ক্ষুব্ধ স্বরে বললো মিতা।

'না-না।' আর্তনাদ করে উঠলো কণ্ঠটা। 'তোমার চোখেই আমি দেখছি সব। কাউকে আমি ছাড়বো না।'

'কি চাও তুমি?' কান্না কান্না সুরে বললো মিতা।

'আমার মায়ের কি হয়েছিল দেখতে চাই। দেখাও আমাকে।'

'কি দেখাবো?'

'উঠানে চলো, ওঠো।'

দরোজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো মিতা। খালি পায়ে নিঃশব্দে হাঁটছে। বুকে শক্ত করে ধরে রেখেছে জুলেখাকে। উঠানে নেমে স্টোররুমের কাছে এলো মিতা।

'ভেতরে ঢোকো।'

'কি করে ঢুকবো? তালা দেয়া যে।' অসহায় শোনালো ওর গলা।

'ভাঙো তালা। ভাঙো,' কর্কশ শোনাচ্ছে কণ্ঠ।

ছোট্ট টিপ তালাটায় প্রচণ্ড জোরে চাপ দিলো মিতা। কখন যে কেটে গেছে নরম হাত বুঝতেও পারলো না। কিন্তু খুলে গেল তালা।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব। কাঁচের জানালা দিয়ে চুইয়ে পড়ছে আলো। অদ্ভুত আলো-আঁধারীর খেলা ঘরটাতে। এক কোনায় কিছু জিনিসপত্র স্তূপ করা। 'দেখো কি হচ্ছে এখানে। দেখো। বলো আমাকে।' প্রাচীন, খস খসে গলায় বললো সে।

এতক্ষণে কালো ফ্রক পরা মেয়েটাকে দেখতে পেলো মিতা। দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশেই। কড়া গন্ধে ভরে গেল ঘরটা।

মিতার চোখের সামনে ধোঁয়াটে আবছায়া। মনে হচ্ছে কোনো এক অজানা পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কয়েকবার কেঁপে উঠলো ওর সামনের কুয়াশার চাদর। স্পষ্ট দেখতে পেলো সে খুব সুন্দর চেহারার একটা মেয়ে শুয়ে আছে দামী চাদরে ঢাকা বিছানায়। অদ্ভুত এক মায়াবী হাসি ওর মুখে।

পাশেই বসে আছে লম্বা একহারা একটা লোক। পুরু গোঁফ আর ঝাঁকড়া চুল লোকটার। সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েটার মাথা হাঁটুর ওপর নিয়ে বসে আছে সে। মাথাটা ঝুঁকিয়ে কিছু একটা বলছে।

'বলো কি দেখছো। বলো আমাকে,' তীব্র কঠিন কণ্ঠে বললো কালো ফ্রক পরা মেয়েটা।

হুবহু বর্ণনা করলো মিতা যা দেখছে তাই। এবার হাসছে ওরা। পকেট থেকে দামী একটা নেকলেস বের করলো লোকটা। খুব যত্ন করে পরিয়ে দিলো মেয়েটার গলায়। চোখে চোখে তাকিয়ে হাসলো ওরা।

এই পর্যন্ত শুনেই করুণ, তীক্ষ্ণ স্বরে বললো কালো ফ্রক পরা মেয়েটা, 'হায় হায়। আমাকে যারা খেলাচ্ছিল, ওরা তাহলে মিথ্যে বলেনি।

হিংস্র দেখাচ্ছে কালো ফ্রক পরা মেয়েটাকে। ঘৃণায়, কষ্টে বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখ। হঠাৎ চমকে উঠলো গোঁফঅলা লোকটা।

দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে আরেকজন লোক। জমিদারী কেতায় শেরওয়ানী পরে আছে। দু চোখ ঠিকরে আগুন বেরোচ্ছে ওর। দাঁতে দাঁত চাপছে রাগে।

আচমকা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে এক প্রচণ্ড ধাক্কায় শেরওয়ানী পরা লোকটাকে ঘরের কোনায় পাঠিয়ে দিলো গোঁফঅলা। তারপর এক দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

সেদিকে ফিরেও তাকালো না নতুন লোকটা। ওর হাতে ততক্ষণে চলে এসেছে লম্বা একটা ছুরি। ছুপা সামনে এগিয়ে এলো সে।

ভয়ে, আতঙ্কে বিছানার সাথে কুঁকড়ে গেছে মেয়েটা। করুণ সুরে মিনতি করছে।

ম্লান আলোয় ভরে গেছে ঘর। নির্মমভাবে পুরো ছুরিটা খ্যাচ করে মেয়েটার বুকে বসিয়ে দিলো লোকটা। রক্ত পানি করা স্বরে আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটা। আর্তনাদ করে উঠলো মিতাও। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা, মেঝে। দুহাতে চোখ ঢাকলো সাথে সাথে।

মিলিয়ে যাবার আগে কঠোর কণ্ঠে বললো কালো ফ্রক পরা মেয়েটা, 'উচিত শিক্ষা হয়েছে তোমার গুল বাহার বেগম।'

ঘোর কেটে গেল মিতার। নিজেকে আবিষ্কার করলো সে উঠোনের ছোট্ট ঘরের ভেতর একা। সারা। শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়।

একটা আর্তচিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল মাজেদা বেগমের। কি ব্যাপার? চোর ডাকাত? নাকি অন্য কিছু? স্বামীকে ডেকে তুললেন তিনি। দরোজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন কি ব্যাপার বোঝার আশায়। উঠানের দিক থেকেই

এসেছে চিৎকারটা।

এদিক ওদিক কিছুক্ষণ তাকিয়েই ছোট্ট ঘরটার দিকে দৃষ্টি গেল মাজেদা বেগমের। দরোজা খোলা কেন? 'এই দেখছো? ওই ঘরের দরজা খোলা কেন?

'চোর নাকি?' ফিসফিস করে বললেন আহাদ সাহেব।

হঠাৎ একটা হার্টবিট মিস হয়ে গেল তাঁর। মাজেদা বেগমেরও রক্ত হিম হয়ে গেল ভয়ে।

খোলা ঘরের ভেতর থেকে জুলেখাকে কোলে নিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে বেরিয়ে আসছে মিতা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন আহাদ সাহেব। হাতের টর্চটার কথা মনে হলো তার। সরাসরি মেয়ের মুখের উপর ফেললেন আলো।

'ওখানে কি করছো, মা? এতো রাতে?'

চমকে বারান্দার দিকে চাইলো মিতা। ভিড়মি খাবার যোগাড় হলো আহাদ সাহেবের। সারামুখে রক্তের দাগ মিতার।

'ও মাগো।' বলেই জ্ঞান হারালেন মাজেদা বেগম। খপ করে তার পড়ন্ত শরীরটাকে ধরে ফেললেন আহাদ সাহেব। আস্তে করে শুইয়ে দিলেন বারান্দার ওপর।

মিতা উঠে আসছে ওপরে। সিঁড়িতে হালকা পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।
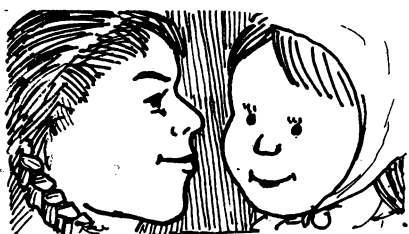
বাড়িটা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন আহাদ সাহেব। এখানে থাকলে মাজেদা বেগম হয়তো পাগল হয়ে যাবেন। মিতাকেও হারাতে হতে পারে।

এরিমধ্যে সবার আতঙ্কের বস্তুতে পরিণত হয়েছে মেয়েটা। স্কুলে যাওয়া বন্ধ। কেউ খেলতে চায় না ওর সাথে। মাথা খারাপ হতে দেরি নেই ওরও।

ওদিকে রশীদ গিন্নী বাড়ি বাড়ি বলে বেড়াচ্ছেন মিতা ইচ্ছা করেই বিলুকে মেরে ফেলেছে। শিউলিকেও ওই ফেলে দিয়েছে ঢাল থেকে।

এখানে আর না। কেউ বাড়িটা না কিনলে এটাকে ফেলে রেখেই চলে যাবেন কুসুমপুর ছেড়ে।

মিতাকে আলাদা ঘরে শুতে দিলেন না মাজেদা বেগম। জুলেখাকেও আনতে দিলেন না এ ঘরে। বড় খাটের ওপর ঠাসাঠাসি করে শুয়ে রইলেন সবাই মিলে।

বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছে মিতা। সুন্দর মুখটা ক্লান্ত লাগছে। এই ক'মাসে অনেক শুকিয়ে গেছে মিতা। সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা।

আহাদ সাহেবের বুকে মমতা উথলে উঠলো। মিতার মুখটা একটু একটু নড়ছে। হঠাৎ চোখ খুলে চাইলো সে। কিন্তু আহাদ সাহেবকে দেখতে পেলো বলে মনে হলো না।

বিছানা থেকে আলতো ভাবে নেমে পড়লো মিতা। কাঠ হয়ে শুয়ে রইলেন আহাদ সাহেব।

কোথায় যাচ্ছে মেয়েটা? সতর্কভাবে রুমের বাইরে বেরিয়ে এলো মিতা। চুপি চুপি হাঁটছে নিজের ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে জুলেখাকে হাতে নিলো সে। কান খাড়া করে রইলেন আহাদ সাহেব। তিনি নিজেও সন্তর্পণে উঠে এসেছেন।

মিতার দুর্বল গলা শোনা গেল, 'তুমি চলে যাও। তোমার জন্যে আমার খুব

কষ্ট হচ্ছে।'

চমকে উঠলেন আহাদ সাহেব। কি বলছে মেয়েটা? হঠাৎ দ্বিতীয় আরেকটা কণ্ঠ শুনে ঘাবড়ে গেলেন তিনি।

'যাবো না আমি। কিছুতেই না। সব কিছু দেখতে চাই আমি।'

'তুমি চলে যাও। দোহাই তোমার।'

'কিছুতেই না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেও ছাড়বো না,' হিংস্রভাবে হিস হিস করে উঠলো মিহি কণ্ঠটা।

ধাক্কা দিয়ে দরোজা খুলে মিতার রুমে ঢুকে পড়লেন আহাদ সাহেব।

মেঝেতে জুলেখাকে রেখে তার সামনে স্থির বসে আছে মিতা। পাতলা ঠোঁট দুটো রাগে, হতাশায় মৃদু কাঁপছে।

ঘরে আর কেউ নেই।

'কার সঙ্গে কথা বলছো?'

চমকে উঠলো মিতা। বাপের দিকে তাকিয়ে বললো, 'জুলেখার সঙ্গে।'

মেয়েকে আদর করে বুকে টেনে নিলেন আহাদ সাহেব। হয়তো ভুল শুনেছেন। 'জুলেখা একটা পুতুল, মা। এত রাতে ওর সাথে কথা না বললেও ও রাগ করবে না।'

মিতা কোনো কথা বললো না। শুধু বাপের বুকে মুখ ঘষতে লাগলো।

সকালবেলা মিতার চেহারায় একটা প্রসন্নতা লক্ষ্য করলেন আহাদ সাহেব।

'দেখেছো, মিতাকে একটু খুশি খুশি লাগছে আজ।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন মাজেদা বেগম। 'মনমরা ভাবটা কেটে গেছে।'

হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলো মিতা। 'এই পুতুলটা ভালো না, আব্বু। আমার সাথে শুধু ঝগড়া করে।'

'তাই নাকি? খুব পাজী তো।'

'পুড়িয়ে ফেল্ ওটাকে।' পুতুলটাকে শেষ করে দেবার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না মাজেদা বেগম।

'তাই করবো,' বলেই হন হন করে রান্নাঘরের দিকে হাঁটতে লাগলো মিতা।

স্বামীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন মাজেদা বেগম। কোলে হাত পা নাড়ছে অবোধ রীতা।

'আপদ বিদেয় করাই ভালো।'

হাবুর মা নাস্তা বানাচ্ছিল রান্নাঘরে। মিতাকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

'এইহানে কি আপামনি?'

'জুলেখাকে পুড়িয়ে ফেলবো,' গম্ভীরভাবে বললো মিতা।

'হেইডাই বালো। খুব খারাপ জিনিস এইডা।'

গনগনে আগুন বেরুচ্ছে বড় চুলার মুখ থেকে। একটু ইতস্ততঃ করলো মিতা। তারপর জুলেখার মাথাটা ঢুকিয়ে দিলো চুলোর ভিতরে।

প্রচণ্ড উত্তাপে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল মাথাটা। মিতার মনে হলো ব্যথায় আর্তনাদ করছে জুলেখা। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে গলে যাওয়া পুতুলটার দিকে। খেয়াল করলো না কখন একফাঁকে—আগুনের একটা হালকা শিখা আলতোভাবে ছুঁয়ে গেল তার জর্জেটের জামাটাকে।

প্রথমে হাবুর মার চোখেই পড়লো জামার ঝুলের কোনার ছোট্ট আগুনটা।

'আগুন। ইয়া আল্লা। আগুন। আপা!'

লাফিয়ে এলো বুড়ি মিতার দিকে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। চমৎকার ডিজাইন করা জর্জেটের জামাটাকে মুহূর্তের মধ্যে গ্রাস করলো লেলিহান শিখা, ভয়ে আতঙ্কে মরণ চিৎকার জুড়ে দিলো হাবুর মা। □

কোলেস্টেরল বিরোধী বিধিব্যবস্থা

আহমদ রফিক

কোলেস্টেরলের ইতিকথায় আপনি ইতোমধ্যেই জেনে গেছেন যে দেহের ভেতরে সবচেয়ে করিতকর্মা যন্ত্র লিভার বা যকৃতে কোলেস্টেরলের হরবখ্‌ত তৈরি চালু রয়েছে; আর সেখানে আমাদের শাসন বা কর্তৃত্ব একেবারে শূন্যের কোঠায়। তাই শাসন ও নিয়ন্ত্রণের কাঁটাতার বেড়া দিয়ে খাবার-দাবারের মাধ্যমে কোলেস্টেরলের অবাধ অনুপ্রবেশ না রুখে উপায় নেই। আর সেক্ষেত্রে আমাদের জানতেই হয় কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণ কোলেস্টেরল ও সম্পৃক্ত চর্বি সঞ্চিত রয়েছে।

গরু-খাসির কলিজা বা লিভার নিশ্চয়ই আপনার খুব পছন্দ, বিশেষ করে ভাজা বা ভুনা। বিদেশীদের মতো চর্বিতে ভাজার রেওয়াজ এদেশে না থাকলেও কোলেস্টেরল তৈরির কারখানা কলিজায় যে প্রচুর পরিমাণে কোলেস্টেরল জমা থাকবে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মাত্র দেড় ছটাক ওজনের কলিজায় কোলেস্টেরলের পরিমাণ ৩৭০ মিলিগ্রামেরও বেশি। আর একটি ডিমে এই পরিমাণ ২৭০ মিলিগ্রাম। অর্থাৎ এর যে কোনো একটি উপাদান আপনার দৈনিক বরাদ্দ কোলেস্টেরলের জন্যে যথেষ্ট, দ্বিতীয়টি খাওয়া চলবে না।

আপাতদৃষ্টিতে চর্বিহীন কচি গরুর মাংসে কোলেস্টেরলের পরিমাণ আশি মিলিগ্রামের বেশি, খাসিতে আরো বেশি; মুরগীতে অবশ্য খুবই কম। এক কাপ আইসক্রীমে সম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ যেখানে প্রায় নয় গ্রাম, সমপরিমাণ দুধে তা পাঁচ গ্রাম, এবং এক বড় চামচ মাখনে এই মাত্রা সাত গ্রামেরও বেশি। কিন্তু ঘোলে মাত্র পৌনে দুই গ্রাম।

অবশ্য তুলনামূলক হিসেবে কচি মাংস, কলিজা বা ডিমে এই সম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। যেমন প্রতি তিন ছটাক কলিজায় পাঁচ গ্রাম, কচি গরুর মাংসে আট গ্রাম, একটি ডিমে প্রায় পৌনে দুই গ্রাম এবং একটি হৃষ্টপুষ্ট বিদেশী মোরগে এক গ্রাম। আমাদের দেশী মোরগে চর্বির মাত্রা অত্যন্ত কম।

অনেকেই জানেন না যে তেল মানেই সম্পৃক্ত চর্বি নয়, তাই এদেশীয় পদ্ধতিতে রান্নার তেল ব্যবহারেও ভয় পান। ব্যাপারটি কিন্তু ঠিক বিপরীত। আমাদের রান্নাঘরে ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জ তেল যেমন সরিষা বা সয়াবীন তেলে কোলেস্টেরল যেমন অনুপস্থিত, তেমনি প্রায় অনুপস্থিত সম্পৃক্ত চর্বি; যা আছে তা হলো অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড, যা রক্তে ঘাতক-

চর্বি ও কোলেস্টেরলের বিরুদ্ধে দেহের পক্ষে এক সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকে ; যে সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এদিক থেকে সরিষা ও সয়াবীনের তেল আদর্শ স্থানীয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ঘি বা ডালডা সম্পৃক্ত চর্বিতে ভরপুর, কাজেই চর্বি বর্জনের প্রশ্ন যেখানে রয়েছে, সেখানে এই দুটো খাদ্য-সহায়ক উপাদান অবশ্য বর্জনীয়ের তালিকায় পড়ে।

তেল-চর্বি প্রসঙ্গে খাদ্যদ্রব্য নির্বাচনে একটি ভুল ধারণা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়, বিশেষ করে তৈলাক্ত মাছের বিষয়ে। এদেশে প্রোটিনের একদা জনপ্রিয় উৎস মাছ যতো তেলালোই হোক না কেন, তা নিয়ে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। কারণ মাছের তেলে রয়েছে প্রধানতঃ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড, যা রক্তের সম্পৃক্ত চর্বি-কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে থাকে।

উদ্ভিজ্জ তেল প্রসঙ্গে অবশ্য আরো একটি ছোট্ট তথ্য মনে রাখা দরকার যে এদের সবগুলোই আদর্শস্থানীয় নয়। যেমন বাদাম তেল, পাম তেল, নারকেল তেল, এমনকি জলপাই তেলেও সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের মাত্রা তুলনামূলক হিসাবে বেশি। তাই এসব তেল রান্নার মাধ্যমে ব্যবহার করার বদলে মাঝে মধ্যে সুগন্ধী ও সুস্বাদু গাওয়া-ঘি ব্যবহার করাই ভালো। এতে একসাথে জিভের ও মনের তৃপ্তির ব্যবস্থা হবে। সূর্যমুখী বীজের তেল এদেশে বড় একটা আসে না বা পাওয়া যায় না ; তবু জেনে রাখা ভালো যে এর গুণাগুণ অনেকটা সয়াবীন তেলের মতোই।

এই হলো আমাদের দৈনন্দিন খাবার দাবারে ঘাতক উপাদান ও তার প্রতিপক্ষের উপস্থিতির খতিয়ান। স্বভাবতঃই এই হিসাব নিকাশের উপর নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের খাদ্যদ্রব্য নির্বাচন করতে হবে, আর শরীরের প্রয়োজনে এই চর্বি কোলেস্টেরলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হলে ঐ সম্পৃক্ত চর্বি ও নিম্ন ঘনত্বের লাইপো-প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে। তাই একটু আগে উল্লিখিত খাদ্যে চর্বির হিসাব জানাটা জরুরী।

আর এই প্রসঙ্গেই জানা জরুরী যে আমাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কোন্ পর্যন্ত স্বাভাবিক এবং কোন্ মাত্রার উপরে কোলেস্টেরলের আরোহন অবাঞ্ছিত। আমাদের দেশে তো এসব হিসাব নিকাশের কোনো বালাই নেই, তা বিদেশী হিসাব মেনে নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়, যদিও নৃতাত্ত্বিক-শারীরতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত নানা কারণে পশ্চিম দেশের মানদণ্ডের সাথে আমাদের আদর্শ মনের তফাৎ নিশ্চিত।

সাম্প্রতিক মার্কিনী হিসাব মতে তাদের প্রমাণ সাইজ পুরুষের জন্যে খাদ্যে কোলেস্টেরলের দৈনিক বরাদ্দ ২৫০ থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম এবং মহিলাদের জন্যে এই বরাদ্দ ২০০ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম। দৈনিক খাবার-দাবারের মোট হিসাবে ২০ থেকে ৩০ শতকরার বেশি তেলচর্বি জাতীয় উপাদান থাকবে না। আর এই হিসাব অনুযায়ী আশা করা হয় যে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রতি একশত মিলিমিটারে ২০০ মিলিগ্রামের উপরে যাবে না। অর্থাৎ একে নিরাপদ হিসাবে ধরা হয়েছে। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট নিরাপদ মান এ দেশের মানুষের জন্যে নিরাপদ মানের চেয়ে কিছুটা যে বেশি হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ আমাদের জন্যে কোলেস্টেরলের বাঞ্ছিত মাত্রা ২০০ থেকে কিছুটা কম হওয়াই স্বাভাবিক।

তাই রক্তের কোলেস্টেরল মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়ে ঘরে-বাইরে দুদিকেই সতর্ক থাকতে হয়। যেমন বাজারে গিয়ে এই বাছাইয়ের প্রয়োজনে জিভের চেয়ে মস্তিষ্কের উপর বেশি নির্ভর করতে হয় তেমনি

ঘরে রান্নাবান্নার সময় একই ধরনের নিয়ন্ত্রণ দরকার। ভাজাভুজির কাজে সেখানে ডালডার চেয়ে সর্ষে বা সয়াবীন তেলই উপযোগী মনে করতে হবে। আর যেখানে ডালডা বা ঘিয়ের প্রয়োজন সেখানে খাঁটি-ঘি ব্যবহারই বরং ভালো।

আর বাজারে কেনাকাটার ব্যাপারে লাল টকটকে চর্বি চকচকে মাংসের বদলে বরং লালচে-বুক মাছের পেটি কিংবা তৈলাক্ত ইলিশ রুই বা তুইসনী কই নির্বাচনই সঠিক। এর কারণ আগেই বলা হয়েছে, মাছের তেলের অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বরং দেহের পক্ষে উপকারী।

তবে একটি কথা ঠিক যে চর্বি-সুস্বাদু খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দিয়ে কোলেস্টেরল সম্পর্কিত জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথে কিছুদূর যাওয়া চলে, কিন্তু বেশিদূর নয়। কারণ দেহে কোলেস্টেরল তৈরির কারখানা লিভারে দিন রাত কাজ চলছে। ওখানে ছাড় পাবার তো সুযোগ নেই। তাই সাবধানতা কিছুটা সুফল আনলেও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিঃসন্দেহে 'ফুল প্রুফ গ্যারান্টি' নয়। তবে ডায়াবেটিস কিংবা প্রেসারের রোগীদের পক্ষে অথবা একবার হৃদযন্ত্রের স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। তেমন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ মেনে চলাই সমীচীন।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমরা বেশিদূর যেতে পারি না বলেই সিগারেট ধূমপান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা দরকার। দরকার আরো এই জন্যে যে, আজকাল মনে করা হয়ে থাকে যে, সিগারেট ধূম নিম্নঘনত্ব লাইপোপ্রোটিন নামক শয়তানকে সক্রিয় হতে উদ্দীপ্ত করে এবং সেই সঙ্গে উচ্চ ঘনত্ব লাইপ্রোটিনের মাত্রা কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। এই জন্যেই করোনারি হৃদরোগ তৈরিতে সিগারেট এক নম্বর ঝুঁকি হিসাবে গণ্য।

একদিকে সিগারেট নিয়ন্ত্রণ অন্যদিকে শরীর চর্চা বা ব্যায়াম রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে বলে সকলেই একমত। অর্থাৎ সিগারেট যে অন্যায় কাজটি করে, ব্যায়ামের ফলাফল তার ঠিক বিপরীত। গবেষকদের বিশ্বাস, টেনশান রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে থাকে। আর একথাও কম বেশি সত্য যে শরীরচর্চা পরোক্ষভাবে হলেও কম বেশি টেনশান কমাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ সবদিক থেকে বিবেচনা করেই শরীরচর্চা কোলেস্টেরল ঘটিত সমস্যার জট খুলতে অন্ততঃ পক্ষে একটি পথের সন্ধান দেয়। কারণ, বিরূপ ক্রিয়া বিহীন এমন কোনো ওষুধ নেই যা রক্তের কোলেস্টেরল সহজ ভাবে কমিয়ে আনবে।

নাগরিক সভ্যতার দ্রুত ধাবমান জীবনযাত্রায় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি,

ডায়াবেটিস রোগীর জন্য সুখবর

ডায়াবেটিস রোগী সম্পর্কে নানা দিক থেকে গবেষণা চলছে। বিশেষ করে জীন-প্রযুক্তির দিক থেকে চেষ্টা চলছে ইনসুলিন তৈরির নতুন কলা কৌশল আয়ত্ত করার। এমনকি প্যানক্রিয়াসের সংযোজনের চেষ্টাও চলছে। এবার নতুন চিন্তা। অর্থাৎ ইনসুলিন উৎপাদক কোষ সংযোজন। পরীক্ষাধীন প্রাণীর মধ্যেই এই পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে। এখন সাতাশ জন ডায়াবেটিস রোগী নিয়ে কাজ চলছে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সার্জনের মতে 'পাঁচ বছরের মধ্যেই জানা যাবে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবহারিক ফলাফল ও সাফল্য।' এতে করে ডায়াবেটিস চিকিৎসায় একটি নতুন পথ খুলে যেতে পারে। ততদিন আমাদের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা। □

টেকনোক্র্যাট বা এক্সিকিউটিভ কারো-পক্ষেই হেঁটে চলার বা শরীর চর্চার কোনো অবকাশ নেই। আবার পার্টিতে বা হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়াটাও অনেকটা অপরিহার্য পর্যায়ে এসে যায়, তবু তার মধ্যে যতোটুকু সম্ভব হিসাব নিকাশ করে চর্বি পিচ্ছিলতা বর্জন করাটাই হবে বিচক্ষণ কাজ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোলেস্টেরল সংক্রান্ত সমস্যায় প্রধানতঃ নির্ভর করতে হচ্ছে শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের উপর, যা এক নম্বর সূত্র হিসাবে গণ্য হবার উপযুক্ত। দুই নম্বর করণীয় হলো সিগারেট-ধূমপান বর্জন। এরপর আসছে খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ লাল মাংস, শাদা হলুদ চর্বিশোভন মাংস, সুস্বাদু যকৃত ইত্যাদির স্বাদ ভোজ কিছুটা কমিয়ে আনা।

কোলেস্টেরল কমানোর কার্যকরী ওষুধের বিকল্প হিসাবে অনেকেই লৌকিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী ; যেমন নিয়মিত রসুন খাওয়া অথবা পাকা তেঁতুলের সরবত নিয়মিত প্রতিদিন খাওয়া।

পাঠকের প্রশ্ন ও সমাধান

সমস্যা ঃ কয়েক মাস ধরিয়া লক্ষ করিতেছি যে আমার ডান অণ্ডকোষটি ধীরে ধীরে ফুলিয়ে উঠিতেছে। দয়া করিয়া এর প্রতিকার জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিবো।

ঝিনুক
রাজশাহী।

সমাধান ঃ কোনো সার্জনের সাথে পরামর্শ করুন।

সমস্যা ঃ আমার প্রায়ই মাথা ব্যথা করে। সকাল সন্ধ্যা দুপুর রাতের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। মাথা ব্যথা শুরু হলে সহ্য করতে না পেরে আমি ডিসপ্রিন খাই অথবা বিদেশী বাম ব্যবহার করি। কিন্তু এই করে আমার কতদিন চলবে?

রবিউল আলম
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

সমাধান ঃ ভালো চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুন। খালিপেটে কখনো ডিসপ্রিন খাবেন না।

সমস্যা ঃ আমার বয়স ১৯ বছর। বসে থাকা অবস্থা থেকে হঠাৎ উঠলে মাথা ঘুরে ওঠে। চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়। এর প্রতিকার কি হতে পারে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

অজয় সেন চাকমা
রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

সমাধান ঃ প্রেশার সংক্রান্ত অসুবিধাও হতে পারে। ভালো কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সমস্যা ঃ আমার বয়স সতের বছর। প্রতি বছর শীতকাল আসলে আমার সমস্ত শরীরে চুলকানি হয়। এবারও হয়েছে। আমি প্রতিদিন গোসল করি এবং একদিন পর পর সাবান লাগাই। এসকাবিয়ল ব্যবহার করছি কিন্তু তাতেও কিছু হচ্ছে না। কি করলে এ চুলকানি ভালো হবে।

মোঃ মইনুল হক
খলিলগঞ্জ, কুড়িগ্রাম।

সমাধান ঃ সাবান ব্যবহারও অনেক সময় চুলকানির কারণ। নিজের চিকিৎসা নিজে না করে ভালো কোনো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। তাতেই বরং কাজ হতে পারে।

সমস্যা ঃ আমি একজন সুস্থ সবল বিশ বছরের যুবক। নিজের দেহের আকৃতি নিয়ে বলতে গেলে সব সময়ই আমি নিজেকে আড়াল করে রাখি। আমার উচ্চতা মাত্র ৫´ ৩ ১/২´´ স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো। কিভাবে আমার উচ্চতা বৃদ্ধি করতে পারি ?

শ্যামল
কর্নেল জিয়া ছাত্রাবাস।
সিলেট মেডিকেল কলেজ, সিলেট ৩১০০।

সমাধান ঃ উচ্চতা নির্ধারণের জীন নিয়ন্ত্রণের কোনো পদ্ধতি যদি আমাদের জানা থাকতো, আপনাকে নাহয় জানিয়ে দিতাম। আপাতত সেটি সম্ভব হচ্ছে না। তবে একটা কথা বলি, উচ্চতার জন্য মানসিক অশান্তিতে ভুগবেন না। অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখারও প্রয়োজন নেই। মানুষ বাস্তবে গুণের কদরই করে, সেটাই বড় কথা। দেহসৌষ্ঠব অনেকটা উপরি-পাওনার মতো। পেলে ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই।

সমস্যা ঃ আমার বয়স চব্বিশ বৎসর। গত নয় বৎসর ধরে আমি কানে একটু কম শুনি। অনেক হোমিওপ্যাথি এবং এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু কোনো ভালো ফল পাইনি। সন্ধ্যের দিকে সাধারণত মানুষের মুখের দিকে না তাকিয়ে তাদের কথা ঠিকমত বুঝতে পারি না। অবশ্য মোটামুটি ট্রেনে-বাসে, মোট কথা কোনো কোলাহল পূর্ণ স্থানে ভালই শুনতে পাই। ডাক্তার কান পরীক্ষা করে দেখে বলেছেন কানের পর্দায় কোনো ছিদ্র হয়নি। বর্তমানে ডাক্তারের পরামর্শে হিয়ারিং এইড ব্যবহার করছি। আমি এই ব্যাপারে জানতে চাই এর কোনো ভালো চিকিৎসা আছে কি ?

এ. টি. এম. নাসিম
নতুন উপশহর, যশোর।

সমাধান ঃ আপনার কানের রোগ সম্পর্কে ভালো কান-স্পেশালিস্টের পরামর্শ নিন। ঢাকায় অনেকেই আছেন। তাদের কাউকে দেখানো ভালো।

সমস্যা ঃ বেশ কিছু দিন যাবত আমার চোখের নিচে কালি পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমি কখনও রাত জাগি না চশমাও পড়ি না, এমনকি কোনো রকম টেনশনেও ভুগছি না। নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করি এবং ঘুমাই। তবুও কোনো ফল পাচ্ছি না।

শাহানা সুলতানা
কাঁঠাল বাগান
ঢাকা ১২০৫।

সমাধান ঃ আপনার সমস্যার জন্য ভালো কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং অনুসন্ধানী পরীক্ষায় নিশ্চিত হোন যে কোনো প্রকার কিডনি বা লিভারের মৃদু রোগ বা অসুবিধা আপনার রয়েছে কিনা। আর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে কলা, দুধ, পাকা বেলের সরবত, ইসবগুলের ভুষির সরবত খেয়ে তা দূর করুন।

সমস্যা ঃ চোখে কাঠির খোঁচা লেগেছিল। কিছুদিন পর মনির ওপর ঘোলা একটা আবরণ পড়তে শুরু করে। আঘাত লাগার কারণেই কি এমনটি হয়েছে ? চোখের এই আবরণটি অপারেশন করে কেটে ফেলা যাবে ?

পরাগ
শেখ পাড়া, জয়পুরহাট।

সমাধান ঃ হ্যাঁ, 'কর্ণিয়াতে সম্ভবতঃ আঘাতের ফলে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং অস্বচ্ছ আবরণ পড়েছে। আপনি অবিলম্বে চক্ষু-সার্জনকে দেখান। অপারেশানে কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা ভালো হয়ে যায়, তবে পদ্ধতিটির সঙ্গে আনুষঙ্গিক জটিলতা রয়েছে।

রহস্যময় পৃথিবী—আনোয়ার করিম খান। প্রকাশকঃ চিত্তরঞ্জণ সাহা, মুক্তধারা ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০। পৃষ্ঠা—১১৭ (সাদা কাগজ, শক্ত মলাট)। দাম—৬০ টাকা।

'রহস্যময় পৃথিবী' আনোয়ার করিম খানের লেখা কিশোর উপযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক বই। বইটার প্রকাশক মুক্তধারা।

বইটির ভূমিকায় আনোয়ার করিম খান অকপটে অনেক কথা স্বীকার করেছেন। এই ভূমিকা থেকে জানা যায়, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সার্গাই দুর্গে বন্দী থাকা অবস্থায় সময় কাটানোর জন্য লেখার সূচনা করেন। দুর্গে প্রায় পাঁচশত অফিসার ও ক্যাডেট ছিলেন। সময় কাটানোর জন্য কেউ তাস এবং দাবায় হাত পাকালো। কেউ আঁকলো ছবি। কেউ আবার গাছের ডাল কেটে তৈরি করলো সুন্দর উড়োজাহাজের মডেল। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করলো ক'জন অফিসার। সাধারণ কাঠ থেকে পকেট নাইফের সাহায্যে তৈরি করলো চমৎকার গীটার। অপূর্ব এ গীটার দোকানের কেনা গীটারের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না। ওরা ওই গীটারে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে দুর্গের সহবন্দীদের মুগ্ধ করেছিল। ভূমিকায় অন্যের গুণের কথা বলতে যেয়ে নিজের কথা খুব অল্প বলেছেন আনোয়ার করিম খান। বন্দী অবস্থায় বিমান বাহিনীর একজন অফিসারের লেখকে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপাররটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।

'একটি দ্বীপের জন্ম কথা' 'একটি দ্বীপের মর্মান্তিক মৃত্যু' 'মহাদেশগুলো কি সরে যাচ্ছে' 'বাতাসের যাদু' সহ আরো ২৬টি চমকপ্রদ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রয়েছে 'রহস্যময় পৃথিবী'তে। প্রতিটি প্রবন্ধই সুখপাঠ্য। বইটার চমৎকার অঙ্গসজ্জা ও ঝলমলে প্রচ্ছদ এঁকেছেন রফিকুন নবী। বইটার দাম ষাট টাকা বেশি মনে হয়নি।

দ্য সাইন অভ ফোর—মূলঃ স্যার আর্থার কোনান ডয়েল। রূপান্তরঃ জি এইচ. হাবীব। প্রকাশকঃ সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০। পৃষ্ঠা—২১৪ (নিউজপ্রিন্ট)। দাম—উনিশ টাকা।

অনুবাদ সিরিজের ষাট নম্বর বই দ্য সাইন অভ ফোর। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের বইটি রূপান্তর করেছেন জি. এইচ. হাবীব।

মহাধুমধামে শার্লক হোমসের জন্ম শতবার্ষিকী পালন হলো গতবার বৃটেনে। অথচ এ নামের লোক আদপেই জন্মায়নি। কোনান ডয়েলের কলমী চরিত্র জনাব হোমস। শত শত বছর ধরেই মাতিয়ে রেখেছে বিশ্বজোড়া অগনন পাঠককে।

'দ্য সাইন অভ ফোর' রহস্য-উন্মোচন এক গল্প, এক নিঃশ্বাসেই যা পড়া যায়। পর্যবেক্ষণ থেকে কি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় সে সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ের অংশটি চমকপ্রদ। মিস মর্সটান ঘরে ঢোকার পর থেকে 'দ্য সাইন অভ

ফোরের' কাহিনীর সত্যিকার শুরু। চমক লাগানো কিছু চরিত্র রয়েছে বইটিতে। টবির মালিক শোরম্যান এমনই এক চরিত্র। ক্যাপ্টেন মর্সটান বেমালুম গায়েব হওয়া মেজর শোল্টো হত্যাকাণ্ড এবং গুপ্তধন উদ্ধারের হোমসীয় প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গল্প এগিয়ে গেছে সাবলীল বেগে।

জি. এইচ. হাবীবের অনুবাদ জ্ঞান ভালো। লাগসই ভাবে সুকুমারীর পদ্য বা 'গেলি'র মতো বাংলা স্ল্যাং ব্যবহারের ফলে ভাষা গতি পেয়েছে। গল্পের গা থেকে অনুবাদের গন্ধ মুছে গেছে। শার্লক হোমসের বাকি রচনা অনুবাদের প্রতীক্ষায় থাকবে বঙ্গবাসী পাঠক।

শিল্পী আসাদুজ্জামানের প্রচ্ছদ চমৎকার। বইটার দাম যথার্থ।

পিটকেয়ার্ন'স আইল্যাণ্ড—মূল : চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল। রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ। প্রকাশক : সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০। পৃষ্ঠা—৩৪০ (নিউজপ্রিন্ট)। দাম—আঠাশ টাকা।

বাউন্টি-ত্রয়ী উপন্যাসের শেষাংশ 'পিটকেয়ার্ন'স আইল্যাণ্ড'। রূপান্তর করেছেন নিয়াজ মোরশেদ।

গল্প শেষ হয়ে গেলেও অনেক পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে তারপর কি হলো? এই তারপর কি হলোর খেই ধরে 'বাউন্টিতে বিদ্রোহের' পরে এলো 'ম্যান এগেইনস্ট দ্য সী' এবং সর্বশেষ সংযোজন বর্তমান বইটি।

ক্যাপ্টেন ব্লাইয়ের চোখ দিয়ে দেখলে ফ্লেচার ক্রিশ্চিয়ান দুর্বৃত্ত, আইন বিরোধী কিন্তু আসলে লোকটা পরিস্থিতির শিকার। ব্লাইয়ের বর্বর ব্যবহার চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য করে তাকে। আইনের হাত থেকে বাঁচার জন্য আটজন বিদ্রোহী আর আঠারো জন পলিনেশীয় নিয়ে পিটকেয়ার্ন দ্বীপে নয়া বসতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে ক্রিশ্চিয়ান।

জন-মানবহীন দ্বীপে বিচিত্র ধর্মী কিছু লোক নিয়ে বসত গড়ার চেষ্টার কাহিনী এটা। টুকরো-কথার মধ্য দিয়ে ক্রিশ্চিয়ানের স্বভাবের মানবিক দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ব্লাই ইংল্যাণ্ডে পৌঁছুতে পারবে বলে ভাবছেন না নিশ্চয়ই?' এক প্রসঙ্গে নাবিক মার্টিন জানতে চাইলে ক্রিশ্চিয়ান জবাব দেয়।

'যে সব নিরপরাধ মানুষ ওর সঙ্গে গেছে অন্তত তাদের স্বার্থে আমি তাই কামনা করি।...'

ম্যাককয়ের মদ তৈরির গোপন প্রয়াস, আদিবাসীদের সাথে ভূমি দখল নিয়ে ভয়ঙ্কর রক্তারক্তি শেষ পর্যন্ত সাদাদের টিকে যাওয়া। দ্বীপে 'টোপাযে'র আগমন এমন সব নাটকীয় ঘটনার মধ্যে পাঠকের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মাইমিতি। এই মহিয়ষী নারীর কারণেই পিটকেয়ার্ন'স মানব জীবনের ধারা নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

বিশাল এই উপন্যাস পড়তে ভালো লাগবে সব পাঠকের। প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় শিল্পী আসাদুজ্জামান সার্থক।

পারভেজ নূরী

দক্ষিণ আমেরিকা বনাম ইউরোপঃ ফুটবলে কারা শ্রেষ্ঠ?

মাহমুদুন নবী

মিশেল প্লাটিনি :
ফুটবলে ইউরোপের গর্ব

আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল বলতে মূলত আমরা ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলকেই বুঝি। ফুটবলে দুই পরাশক্তি ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকা। এদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ? বহু বিতর্কিত এবং বহু আলোচিত এই প্রশ্নের উত্তর এক-কথায় দেয়া সম্ভব না। এবং দেয়া বোধ-হয় উচিতও নয়।

ফুটবলের জন্মভূমি ইউরোপ। তা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বকাপ জিতে নেয় দক্ষিণ আমেরিকার দেশ উরুগুয়ে। শুধু কি তাই? রানার্স-আপ হয়েছিল আর্জেন্টিনা—দক্ষিণ আমেরিকার আরেক দেশ।

তবে পরবর্তী দু'টি বিশ্বকাপে ইউরোপ যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে চ্যাম্পিয়ন-শীপ ছিনিয়ে নেয়। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত এই দুই বিশ্বকাপের ফাই-

ডিয়েগো ম্যারাডোনা

নালে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি ছিলো ইউরোপের এবং দু'বারই চ্যাম্পিয়ন হয় ইতালী।

সার্বিক হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে পাল্লা একটু বেশি ভারি। আজ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা বিশ্বকাপ জয় করেছে সাতবার, এবং ইউরোপ ছ'বার। দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষে ব্রাজিল তিনবার (১৯৫৮, ১৯৬২, এবং ১৯৭০), উরুগুয়ে দু'বার (১৯৩০ এবং ১৯৫০) এবং আর্জেন্টিনা দু'বার (১৯৭৮ এবং ১৯৮৬)। ইউরোপের পক্ষে ইতালী জিতেছে তিনবার

দক্ষিণ আমেরিকা বনাম ইউরোপ : ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার বুরুচাগা পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয় সূচক গোলটি করছেন।

(১৯৩৪, ১৯ ৮, এবং ১৯৮২), দু'বার জিতেছে পশ্চিম জার্মানী (১৯৫৪, ১৯৭৪) এবং ইংল্যাণ্ড একবার ১৯৬৬ সালে।

দক্ষিণ আমেরিকা খেলে আক্রমণাত্মক ফুটবল। তাদের খেলা দর্শকদের বেশি পছন্দ। এই কারণে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সমর্থক ছড়িয়ে আছে গোটা বিশ্বজুড়ে। এমনকি খোদ ইউরোপেও দক্ষিণ আমেরিকার সমর্থকের অভাব নেই। অথচ দক্ষিণ আমেরিকায় ইউরোপীয় ফুটবলের সমর্থক সেই তুলনায় নগণ্য।

১৯৮৬ সালে মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ বিশ্বকাপেও দক্ষিণ আমেরিকা গোল করার দক্ষতায় পেছনে ফেলেছে ইউরোপকে। দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলোর প্রতিটি খেলায় গোল করার হার ১.৪৪ (২৫ খেলায় ৩৬টি গোল), পক্ষান্তরে ইউরোপীয় দলের গোল করার হার ১.৩৮ (৬৩ খেলায় ৮৭টি গোল)।

ইউরোপীয় দলগুলো খেলার শুরুতে গোল না খাওয়ার কথা চিন্তা করে। তবে পাল্টা আক্রমণ হানার ব্যাপারে তারা দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলোর চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ এবং সচেতন। সুযোগসন্ধানী গোলদাতার অভাব ইউরোপে নেই। সুযোগ পেয়েও গোল করতে না পারার দুর্নাম বেশি দক্ষিণ আমেরিকার খেলোয়াড়দের। তবে গত বিশ্বকাপে সেই

দুর্নাম অনেকটা ঘুচিয়ে দিয়েছেন ম্যারা-ডোনা একাই, যদিও সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছেন ইউরোপের খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডের গ্যারী লিনেকার। ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপেও নিখুঁত পজিশনজ্ঞান এবং সুযোগ-সন্ধানী চরিত্র কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন ইতালীর পাওলো রোসি। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলায় মাত্র তিনটি সুযোগ পেয়ে রোসি সদ্ব্যবহার করেছিলেন সবগুলোই। অথচ সাক্রিনো ইতালীর বিরুদ্ধে বার-চারেক পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ঢুকে গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন।

সর্বশেষ বিশ্বকাপে গোল করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন দল। চারটি খেলায় তারা গোল করেছে মোট বারোটি (গোলের গড় প্রতি খেলায় ৩.০০)। সমান সংখ্যক খেলায় ডেনমার্ক করেছে দশটি গোল (গড় ২.৫)। পাঁচ খেলায় এগারোটি গোল করেছে স্পেন (গড় ২.২)। আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল উভয় দলই প্রতি খেলায় গড়ে দু'টি করে গোল করেছে (যথাক্রমে ৭ খেলায় ১৪টি এবং ৫ খেলায় ১০টি)।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরোপের ফুটবল অনেক বেশি পরিকল্পিত। সংঘবদ্ধ খেলায় ঝোঁক বেশি তাদের। তাই ব্যক্তিগত স্কিল প্রদর্শনের সুযোগ সেখানে কম। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে ব্যক্তিগত স্কিলের দিকে বেশি নজর দেয়া হয়। যার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের খেলা হয়ে গড়ে একব্যক্তি-নির্ভর অথবা একব্যক্তি-কেন্দ্রিক। তবু এই ওয়ান-ম্যান শো দিয়েও বিশ্বকাপ জয় করা যায়, এটা একাধিকবার প্রমাণ করেছে দক্ষিণ আমেরিকা।

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দক্ষিণ আমেরিকায় ইউরোপীয় ফুটবলের সমর্থকের কমতি থাকলেও কদর কম নেই। ইউরোপে খেলতে আসা দক্ষিণ আমেরিকার বাঘা বাঘা ফুটবলারদের সংখ্যাই প্রমাণ করে দেয় সে কথা।

আমাদের এশিয়ার ফুটবল বিশ্বমানের ধারে-কাছে পৌঁছুতে পারেনি এখনও। বিশ্ব ফুটবলের এই দুই পরাশক্তির কাছে হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেনি এশীয় ফুটবল। দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপের পাশাপাশি তৃতীয় শক্তি হিসেবে কবে হবে আমাদের অভ্যুদয়?

এমনও ঘটে!

ঈগল পাখি পাছে ধরে

খেলা চলছিলো বলিভিয়ার রাজধানী লা-পাজে। মাঠের ওপরে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল অসংখ্য ঈগল। কেউ অবাক হয়নি এতে। এটা তো নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য। আর কে না জানে, লা-পাস শহরটি অবস্থিত সমুদ্র-সমতলের অনেক ওপরে —বলা যায়, ঈগলের রাজত্ব সেখানে। হঠাৎ শাঁ করে নিচে নেমে

এলো একটা ঈগল, দু'পায়ের নখরে বলটা খামচে ধরে উড়াল দিলো আকাশে। বিস্ময়ের সীমা রইলো না খেলোয়াড় এবং দর্শকদের। নতুন বল দিয়ে খেলা পরিচালনা শুরু করলেন রেফারী। পুনরাবৃত্তি হলো একই ঘটনার—আরেকটি ঈগল নেমে এসে নতুন বলটি নিজের আয়ত্তে নিয়ে উড়ে গেল নাগালের বাইরে। খেলা স্থগিত রাখতে হলো।

আইনের ফাঁক

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ দু'দলের কোনোটিতে সাত জনের কম খেলোয়াড় মাঠে থাকলে খেলা চলতে পারে না—সেটাই নিয়ম। ভাবতে অবাক লাগে, প্রথম শ্রেণীর একটি খেলায় একই দলের পাঁচ-পাঁচজন খেলোয়াড় লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হতে পারে। তবু এমনও ঘটে। আর্জেন্টিনাতেই এই ঘটনা ঘটেছে দু'বার। শেষবার এই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল 'এস্‌টে' এবং 'সান লরেন্‌সো' দলের মধ্যেকার খেলায়। ঘটনাটি ছিলো একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত। এই খেলার দিন পর্যন্ত আর্জেন্টিনা লীগে একশোরও বেশি বার লাল কার্ড দেখানো হলেও 'এস্‌টে' ছিলো একমাত্র দল, যে দলের একজন খেলোয়াড়ও মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হয়নি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি—খেলার আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাল কার্ড পেয়ে মাঠ ত্যাগ করলো 'এস্‌টে' দলের পঞ্চম খেলোয়াড়। ছয় জন নিয়ে খেলা চলতে পারে না। খেলা মুলতবী রাখা হলো। আর্জেন্টিনার ফুটবল বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকরা খেলার পরে মন্তব্য করেছিলেন যে লাল কার্ডটি পঞ্চম খেলোয়াড় অর্জন করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে। তাঁদের মতে বিরতির সময় 'এস্‌টে' দলের খেলোয়াড়েরা আলোচনার মাধ্যম এই সিদ্ধান্তে আসে যে, গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজয় বরণ করার চেয়ে খেলা ভণ্ডুল করা অনেক শ্রেয় তাদের জন্যে। খেলায় তখন ১-২ গোলে পিছিয়ে আছে 'এস্‌টে'। বিরতির অব্যবহিত পরে তাদের একজন খেলোয়াড় গুরুতর ফাউল করে বসলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। 'এস্‌টে'র খেলোয়াড়দের সামনে একটা দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যে ছিলো—তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী 'সান লরেন্‌সো' দলও একবার এ-রকম ভূমিকাই নিয়েছিলো 'ওল্ড বয়েজ' দলের সাথে খেলার সময়।

আক্রোশ

ঘটনাটি ঘটেছিলো ফ্রান্সে, ১৯৭১ সালে। 'বেতুন' ক্লাবের প্যাট্রিস বার্গ খেলা শুরু হবার আগে লক্ষ্য করলেন, বিপক্ষ দলের গোলবারের ঠিক পেছনে চকচকে প্লাস্টিকের তৈরি সাইনবোর্ডে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। রেফারীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে তিনি বললেন যে প্রতিফলিত এই উজ্জ্বল আলো খেলায় অসুবিধের সৃষ্টি করবে। রেফারী আমল দিলেন না প্যাট্রিসের কথায়, অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'কোনো অসুবিধে হবে না।' খেলা শুরু হবার পর প্রথমবার বল পেয়ে ক্রোধান্ধ প্যাট্রিস বার্গ মাঝ মাঠ থেকে প্রচণ্ড শার্ট নিলেন সেই সাইনবোর্ড লক্ষ্য করে। শটে এতো জোর ছিলো যে হতভম্ব গোলরক্ষক দেখলো, বলটি জড়িয়ে আছে নেটে। খেলায় 'বেতুন' জিতলো ১-০ গোলে।

দ্রুততম গোল

ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী মাইকেল ডোবিন ব্যক্তিগত জীবনে একজন পরিসংখ্যানবিদ। অফিসিয়াল ম্যাচগুলোর দ্রুততম গোলের একটি খতিয়ান তাঁর আছে। ১৯৮১ সালে 'কুইনজ পার্ক' এবং 'বোল্টন' দলের মধ্যকার খেলায় টমি লেংগ্লি গোল

করেন খেলা শুরু হবার ছয় সেকেণ্ড পরে। 'ব্রেডফোর্ড সিটি' দলের জিম ফ্রেইড ১৯৬৪ সালে গোল করেছিলেন চতুর্থ সেকেণ্ডে। আর ব্রাজিলের বিখ্যাত খেলোয়াড় রিভেলিনো একবার গোল করতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র তিন সেকেণ্ড।

তিষ্ঠ ক্ষণকাল

খেলোয়াড়ের সাসপেনশনের মেয়াদ বিভিন্ন হতে পারে। তবে ইংল্যাণ্ডের 'ওয়ার্ল্ড সকার' পত্রিকার মতে ত্রিনিদাদের ফুটবল ফেডারেশন খেলোয়াড় সাসপেনশনের মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। রেফারীকে আক্রমণের অভিযোগে ফ্লয়েড ডেভিডকে ফেডারেশন সাসপেণ্ড করেছে ৯৯ বছরের জন্যে। তবে পত্রিকাটির মতে, ডেভিডের অতোটা হতাশ কিংবা নিরাশ হবার কারণ নেই—আশা আছে কিঞ্চিৎ। ত্রিনিদাদ ফুটবল ফেডারেশনের নিয়ম অনুযায়ী 'শাস্তিপ্রাপ্ত কোনো খেলোয়াড় তাহার শাস্তি মওকুফের জন্য ফেডারেশনের নিকট বারংবার সনির্বন্ধ মিনতি করিলে তাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তির মেয়াদ অর্ধেক হ্রাস করা যাইতে পারে।' সে ক্ষেত্রে ডেভিডকে অপেক্ষা করতে হবে মাত্র ৫০ বছর।

ফুটবল-বোদ্ধা

সুইডেনের মাল্‌মে শহরের স্টেডিয়ামে খেলা চলার সময়ে কোত্থেকে যেন আবির্ভাব হলো একটি খরগোসের। সবাই অবাক হয়ে দেখলো, লোকজনকে সে ভয় পাচ্ছে না মোটেও। বরং গোল বার থেকে একটু দূরে বসে খেলা দেখতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে। কয়েকদিন পরে অনুষ্ঠিত খেলার সময়েও দেখা গেল খরগোসটিকে। ফুটবল মৌসুমের শেষের দিকে স্টেডিয়ামের একজন নিয়মিত দর্শক হয়ে গেল সে। মনে হলো, ফুটবল জয় করে নিয়েছে খরগোসের হৃদয়। মৌসুমের সর্বশেষ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ডেনমার্ক ও সুইডেনের মধ্যে। সেই খেলাতেও হাজিরা দিতে ভোলেনি সে। কিন্তু পরবর্তী মৌসুমের প্রথম বেশ কয়েকটি খেলায় তাকে দেখা গেল না। অভ্যস্ত দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো খরগোসের। কিন্তু স্থানীয় দলগুলোর কোনো খেলাই দেখতে এলো না সে। মেলমোর একটি ক্লাবদল এবং জার্মানীর লেপসিস শহরের একটি ক্লাবদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ম্যাচে আবার আবির্ভাব হলো খরগোসের। বোঝা গেল, রীতিমতো একজন ফুটবল-বোদ্ধা বনে গেছে সে। যেমন-তেমন খেলা দেখে আর সময় নষ্ট করতে চায় না সে। (চলবে)

একদিন পাগলা গারদের এক পাগল ধবধবে সাদা কাপড় পরে ওড়ার ভঙ্গিতে দু'-হাত মেলে দিয়ে হেঁটে এসে অন্যান্য পাগলদের গম্ভীর গলায় বলতে লাগলো, 'হে মানুষ, তোমাদের কাছে আমি আল্লাহর প্রেরিত দূত।'
দোতলার ওপর থেকে আরেক পাগল চিৎকার করে বলে উঠলো, 'না না আমি তোমাকে কক্ষনো পাঠাইনি।'

সংগ্রহ : কে. এম. আনিসুর রহমান
গনকপাড়া, ঘোড়ামাড়া,
রাজশাহী।

মমতাজ বিলকিস বানু

আশা চিরন্তনী

সাত বছরের বালক স্বপন। প্রচণ্ড গরমে সেদিন দুপুরে তৃষ্ণার্ত হয়ে সাত-পাঁচ না ভেবেই তরমুজ ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এবং একটা তরমুজ ভেঙে খেতে শুরু করে। কিন্তু স্বপন তখনও জানতো না প্রাণ দিয়ে তাকে এই তরমুজের দাম পরিশোধ করতে হবে। সম্প্রতি পাবনা জেলার একটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। ক্ষেতের মালিকের ছেলে স্বপনকে এমন নির্মমভাবে প্রহার করে যে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে। ছোটো ছেলেটির তৃষ্ণার্ত শুকনো করুণ মুখখানা ঘাতকের মনে এককোঁটা দয়ার উদ্রেক করতে পারেনি।

এমন ঘটনা এদেশে নতুন নয়। মাত্র কিছু-দিন আগেই খবরের কাগজের পাতায় এমন আর একটি করুণ ঘটনা পড়েছিলাম। ক্ষেতে পড়ে থাকা ধান কুড়োতে গিয়ে কিশোরী প্রহৃতা হয়ে মারা গিয়েছিল। হিংস্রতা, উন্মোত্ততা আর অসহিষ্ণুতার চিত্র আজ সমাজের সর্বত্র। এরই ভিতর ঘুরে আসে রমজান মাস। কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকাই কি এর উদ্দেশ্য?—প্রকৃত সিয়াম সাধনা হচ্ছে আত্মসংযম, রিপুকে জয় করে অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি, লোভ, লালসা থেকে বিরত থাকা। মাহে রমজানের সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হোক। পরিপূর্ণ কল্যাণ হোক আমাদের লক্ষ্য। ত্যাগের শিক্ষাই হোক আমাদের পথ নির্দেশ। রমজানের শিক্ষা আমাদের সমাজের অস্থিরতা আর সকল কলঙ্ক দূর করে তাকে সুন্দর ও গৌরবোজ্জ্বল করুক।

রূপচর্চা

গরম পড়ে গেছে। ঘাম, রোদে পোড়া চেহারা, ঘামাচি এগুলো সবই গ্রীষ্মের অঙ্গ বিশেষ। এসময় কি করে তরতাজা থাকতে হবে, কিভাবেই বা পোড়া চেহারায় সৌন্দর্য আনবেন?

ত্বকের যত্ন

আমাদের দেশে রোদ বেশ কড়া ফলে ঘাম হয়। ত্বক তেলতেলে দেখায়। অবশ্যই ত্বক অনুযায়ী এর যত্ন নিতে হবে। ত্বক যেমনই হোক না কেন গ্রীষ্মে দু'বেলা গোসল করতে পারলে ভালো। হালকা সাবান (গ্লিসারিন যুক্ত হলে ভালো)

মাখতে পারেন। তবে গরমেও ময়শ্চারাইজার লাগানো যেতে পারে। ঠাণ্ডা পানিতে যাদের অসুবিধা হয় তারা একটু গরম পানি মিশিয়ে নিতে পারেন। যতোটা সম্ভব রোদ থেকে দূরে থাকতে হবে। ছাতা ব্যবহার এ সময় জরুরী। অথবা সান ব্লক কোনো ক্রীম লাগিয়েও নিতে পারেন। সঙ্গে সান গ্লাস। রোদে তাকালে চোখ কুঁচকানোর প্রবণতা হয়। এতে চোখের নিচে বা আশে পাশে বলি রেখার সৃষ্টি হতে পারে।

চুলের পরিচর্যা

চুলের শত্রু প্রখর রোদ। গরমের সময় চুল বেশি খসখসে হয়ে যায়, লালচে হয়ে যায়। অনেকের চুল আবার ফেটেও যায়। যাদের চুল বেশ তেলতেলে তাদের চুলের সজীবভাব এ সময় চলে যেতে পারে। তাই এ সময় চুলের বিশেষ যত্ন করতে ভুলবেন না। সপ্তাহে দুবার অন্ততঃ হালকা শ্যাম্পু বা সাবান দিয়ে চুল ধোবেন। আগের রাতে চুলের গোড়ায় ঘষে ঘষে তেল মাখবেন। রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকালে চুলের আর্দ্রতা নষ্ট হয়ে যায় ফলে চুল রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। আবার গোসলের সাথে সাথে ড্রায়ার ব্যবহার করলে চুল ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাঝে মাঝে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলি কেটে ঘরের মধ্যে বা ছায়ায় কিংবা ফ্যানের বাতাসে চুল শুকাতে পারেন। রুক্ষ চুলে অবশ্যই হেয়ার ক্রীম অথবা নারিকেল তেল ব্যবহার করবেন।

গ্রীষ্মকালের খাবার

এ সময় সর্বাগ্রে প্রয়োজন শরীর ঠাণ্ডা রাখা। প্রচুর পানি খাবেন আর পাতি লেবুর সরবত, তরমুজের রস কিংবা তরমুজ। শসা, শকালু, দই, ঘোল ইত্যাদি খেলে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে ত্বকেরও সজীবতা বাড়বে। হালকা খাবার খাওয়াই উত্তম। মাংস, ডিম ও ভাজা পোড়া গরমে কম খাওয়াই ভালো।

রান্না

আম-পটলের আচার

উপকরণঃ ২ কেজি মাঝারি সাইজের সবুজ পটল, ½ কেজি কাঁচা আম, ½ কেজি সরিষার তেল, ৫০ গ্রাম ভাজা ধনের গুঁড়ো, ৫০ গ্রাম বা পছন্দমত শুকনো মরিচের গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ হলুদ, ৩ টেবিল চামচ লবণ, ৫০ গ্রাম কালোজিরে (আধবাটা), ১০ গ্রাম আস্ত কালোজিরে।

পদ্ধতিঃ প্রথমে পটলের খোসা পাতলা করে ছাড়িয়ে অথবা ছুরি দিয়ে ভালো করে চেঁছে নিন। খোসা ছাড়ানো পটল ভালো করে ধুয়ে নেবেন। পটলের গায়ে যেন পানি লেগে না থাকে। প্রয়োজনে কাপড় দিয়ে মুছে নিতে পারেন।

এবারে পটলগুলো মাঝামাঝি ভাবে চিরে বিচি এবং শাঁস বার করে খোলের মতো করে নিন এবং ২ মিনিট গরম পানিতে রেখে উঠিয়ে রোদে দিন।

আমের খোসা ছাড়িয়ে কুরে নিন। নুন, হলুদ, ধনে কালোজিরে মরিচ ইত্যাদি একসঙ্গে তেলে মিশিয়ে পটলের খোলে ভরুন। প্রতিটি পটলে একটি করে টুথ পিক লাগান। বয়ামে ভরে ওপর থেকে তেল ছড়িয়ে দিন। ১ সপ্তাহ রোদে রাখার পর আচার তৈরি শেষ হবে।

সেলাই

পোশাকটি তৈরির জন্য লাল (একরঙা) কাপড় নিন। ডিজাইন করার জন্য কালো ও গাঢ় আকাশী রঙের কাপড় লাগবে।
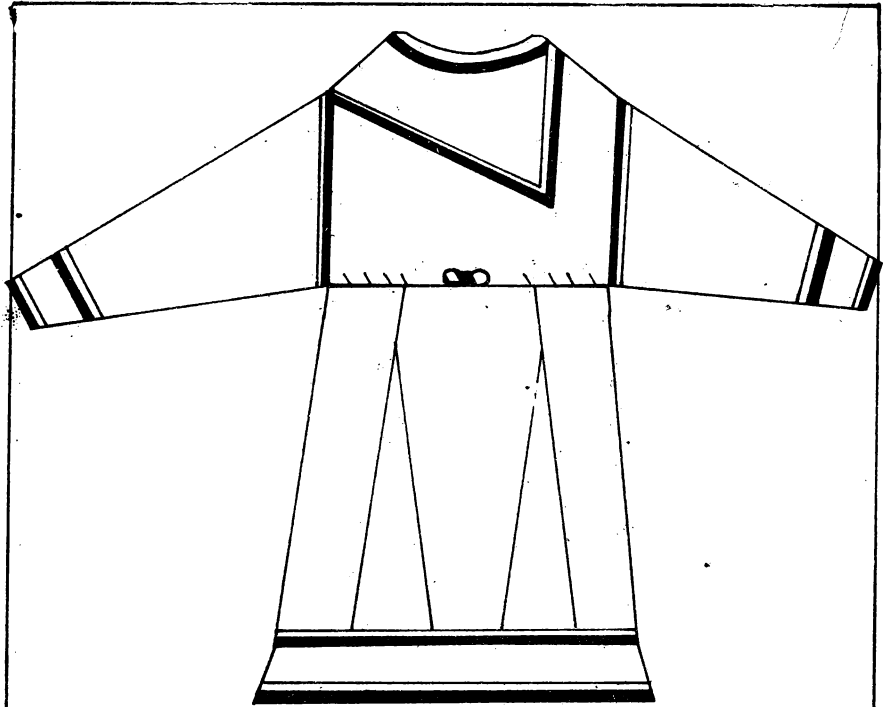
পোশাকটি ক' বছরের শিশু বা কিশোরীর জন্য তৈরি করবেন তার ভিত্তিতেই প্রয়োজনানুযায়ী কাপড় কিনবেন।

প্রথমে বুকের বা উপরের অংশ কাটতে হবে। হাতের বগল কাটা গতানুগতিক পদ্ধতি থেকে আলাদা হবে। অর্থাৎ বগল কাঁধ থেকে (ছবিতে দেখুন) বুক পর্যন্ত লম্বায় কেটে নিন। গলা গোল। চিত্রানুযায়ী সামনের দিকের গলায় কালো কাপড়ের কলার দেবেন। বুকের উপরের অংশে কয়েকটা কুচি হবে। নিচের অংশ ফিটিং হবে ভাঁজের মাধ্যমে। বুকের নিচের অংশের জোড়ার মাঝামাঝি ৪ ইঞ্চি করে দু'টো ভাঁজ হবে। ছবি অনুযায়ী একপার্শে ৪ ইঞ্চি কাপড় ভাঁজ দিয়ে লম্বায় ৫ ইঞ্চি ভাঁজের মাঝামাঝি সেলাই দিন। এভাবে অপর পাশের ভাঁজটিও সেলাই করুন। পেছনের দিকেও একই রকম হবে। বুকের উপরের অংশের পেছনেও কুচি হবে। বুকের নিচের অংশ উপরের অংশের সঙ্গে সেলাই বা জোড়া দেয়ার সময় মাঝের দু'টো ভাঁজের ১টি ভাঁজের মাঝখানটা ভেঙে সমান করে জোড়া লাগান। অপর ভাঁজটিও একইভাবে হবে। বুকের জোড়ার মাঝামাঝি চামড়ার বেল্ট হবে। হাতা কব্জি পর্যন্ত হবে। হাতের মুখে ৩ ইঞ্চি কালো কাপড়ের বর্ডার হবে। হাতা চিত্রানুযায়ী বগলের কাছে সমান কাটা হবে। এবং শেষদিকে চাপা হবে।

বুকের নিচের কাপড়েও ৩ ইঞ্চি কালো কাপড়ের বর্ডার হবে। ছবির

মোটা দাগগুলো আকাশী রঙের কাপড়ের পাইপিং হবে। ইচ্ছে করলে পোশাকটি তরুণীরাও পরতে পারেন। সেলাই শেষে পোশাকটি ধুয়ে ইস্ত্রি করে পরে বা পরিয়ে দেখুন, ভালো লাগবে।

পাঠিয়েছেনঃ রিফাইনারী কলোনী
চট্টগ্রাম থেকে
রাবেয়া রহমান।

আইন

দেনমোহর ও যৌতুকের পার্থক্য

দেনমোহর হলো বিবাহের মূল্য, কনের মূল্য নয়। মুসলিম আইনে, দেনমোহর স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক হিসাবে স্বামীর উপর আরোপিত একটি দায়িত্ব যা কনের অবশ্য প্রাপ্য, অন্য কারো নয়। যৌতুক হলো বিবাহের পণ, যা সাধারণতঃ অসামঞ্জস্য বিবাহে সমতা আনার অজুহাত। বিয়ের এক পক্ষ অন্য পক্ষকে টাকা-পয়সা বা অন্য সম্পত্তি পণ হিসেবে দিতে বাধ্য হয়। যৌতুক গ্রহণ, প্রদান ও প্রদানের সহায়তা ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ও ৪ ধারায় দণ্ডনীয়।

নির্ধারিত দেনমোহর ঃ (১) দেনমোহর হিসাবে স্বামী স্ত্রীর উপর যে কোনো পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করতে পারে। যদিও তা তার ক্ষমতার বাইরে এবং যদিও তা পরিশোধের পর তার উত্তরাধিকারীদের কাছে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই স্বামী দশ দিরহাম বা সমপরিমাণের কম দেনমোহর নির্ধারণ করতে পারে না।

(২) দেনমোহরের দাবি চুক্তি অনুযায়ী করা হলে, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অন্যভাবে ব্যবস্থা করা না হলে, আদালত উক্ত চুক্তিতে উল্লিখিত যাবতীয় অর্থ প্রদানের নির্দেশ দান করবেন।

সমস্যা ঃ ১. আমার চুল লম্বা ও একেবারে সোজা। গোছা মোটামুটি। সিল্কী তবে চিকমিক করে না। ভিনেগার বা সিরকা দেয়া যায় কিনা, গেলে কিভাবে?

রওশন আরা সুলতানা (মুক্তা)
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

২. আগে চুল সুন্দর ছিলো। এখন ফেটে দু'আগা হয়ে যাচ্ছে এবং লালও। সমাধান কি?

খালেদা
সুবিদবাজার, সিলেট।

৩. চুল তেমন ঘনও নয় পাতলাও না। লাল ও রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। এর সমাধান কি?

আমার দ্বিতীয় সমস্যা—ওপরের মাড়ি উঁচু। নিচের দাঁতগুলো আঁকাবাঁকা। ঠোঁট মোটা, কালো দাগ ও ভাঁজ। চিবুক ভোঁতা। ঠোঁটের নিচে থেকে ফোলা। মুখ বন্ধ রাখলে হাবা গোবা বিশ্রী দেখায়। এর কি কোনো প্রতিকার আছে?

মুক্তা
নয়ারহাট, ঢাকা।

সমাধান ঃ আপনাদের চুলের সমস্যার প্রেক্ষিতে জানাচ্ছি প্রথমতঃ চুলে কড়া রোদ যেন পারতপক্ষে না লাগে। তাই বলে তো ঘরে বসে থাকা যাবে না, সুতরাং বাইরে বেরুবার সময় মাথাটা বেঁধে নেবেন অথবা ছাতা সঙ্গে রাখবেন। ভালো হেয়ার ক্রীম বা নিয়মিত তেল মাখলে চুল চিকচিক করবে। রোদের হাত থেকে চুলকে রক্ষা করতে পারলে চুলে রুক্ষতা ও লাল ভাব আসবে না। খুব বেশি ঘন ঘন শ্যাম্পু বা সাবান

ব্যবহার না করাই উত্তম। নরম সাবান (গ্লিসারীন যুক্ত হলে ভালো) বা হালকা শ্যাম্পু মাখতে পারেন। ভেজা চুল আঁচড়ালে চুলের আগা ফেটে যায়। তাছাড়া শক্ত চিরুণী বা তারের কিংবা ধাতুর ব্রাস ব্যবহার করবেন না। খুব তাড়াহুড়ো করে চুল আঁচড়ানো উচিত নয়। এ ছাড়া শোবার আগে চুল ভালো করে বেঁধে নেবেন। খোলা চুল বালিশে ঘষা লেগেও ফেটে যেতে পারে। আজকের রূপচর্চায় আপনাদের বাঁকি জিজ্ঞাসার জবাব রয়েছে।

মুক্তার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি—চেহারা এবং গায়ের রঙ মানুষ নিজে তৈরি করতে পারে না। তবে, পরিচর্যা, আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা চেহারার সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। প্রথমেই আপনাকে ভাবতে হবে আপনি কুৎসিত নন। আপনি মোটামুটি সুশ্রী। এরপর আপনাকে আপনার চেহারা অনুযায়ী সাজতে হবে। যেমন আপনি ঠোঁটে যখন লিপস্টিক লাগাবেন তখন ঠোঁটের উপরে এবং নিচের দিকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবেন না। মাঝখানটাই বিশেষ করে লাগাবেন। চিবুকের দুপাশে রুজের প্রলেপ লাগাবেন দেখবেন চিবুকের ভোঁতা ভাব দূর হয়ে গেছে। ঠোঁটে কালো দাগের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। আর দাঁত এলোমেলো থাকলে অনেককে খারাপ লাগে না তবে আপনি দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন। আপনার মনের দৃঢ়তা হাবাগোবা ভাবকে দূরে সরিয়ে আপনাকে স্মার্ট করে তুলবে।

সমস্যা ঃ দেহের মাপ কেমন হলে ভালো হয়? দেহের বিশেষ অংশের জন্য কি ব্যায়াম করা উচিত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

সমাধান ঃ বয়স ও উচ্চতা অনুপাতে দেহের মাপ এক এক জনের এক এক রকম মানায়। তবে, আপনাদের মধ্যে যারা ৫ ফুট ২½´´ বা ৩´´ তাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। এর চেয়ে লম্বা বাঙালী মেয়ের সংখ্যা খুবই কম। তবে, উচ্চতা বাড়ানোর জন্য অনেক আগে থেকেই রিং ঝোলা এবং প্রোটিন জাতীয় খাবারের প্রয়োজন রয়েছে। যাদের হিপ ৩৪´´ তাদের কমানোর প্রয়োজন নেই। পেট কমানোর জন্য উত্তম ব্যায়াম—মেঝের উপর টানটান হয়ে শুয়ে হাত দুটো মাথার উপরে রাখুন। এবারে হাত ও মাথা এক সঙ্গে উঠিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করুন। আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যান। প্রতিদিন এ ব্যায়াম ৫ থেকে বাড়িয়ে ৮/১০ বার করবেন।

বুকের জন্য—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক হাত পিছন দিকে কোমরের উপর স্থাপন করুন। অপর হাত মাথার উপরে উঠিয়ে শরীরকে বাঁকান আবার আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাত নামিয়ে ফেলুন এবং অপরদিকে একই ভাবে অভ্যাস করুন। □